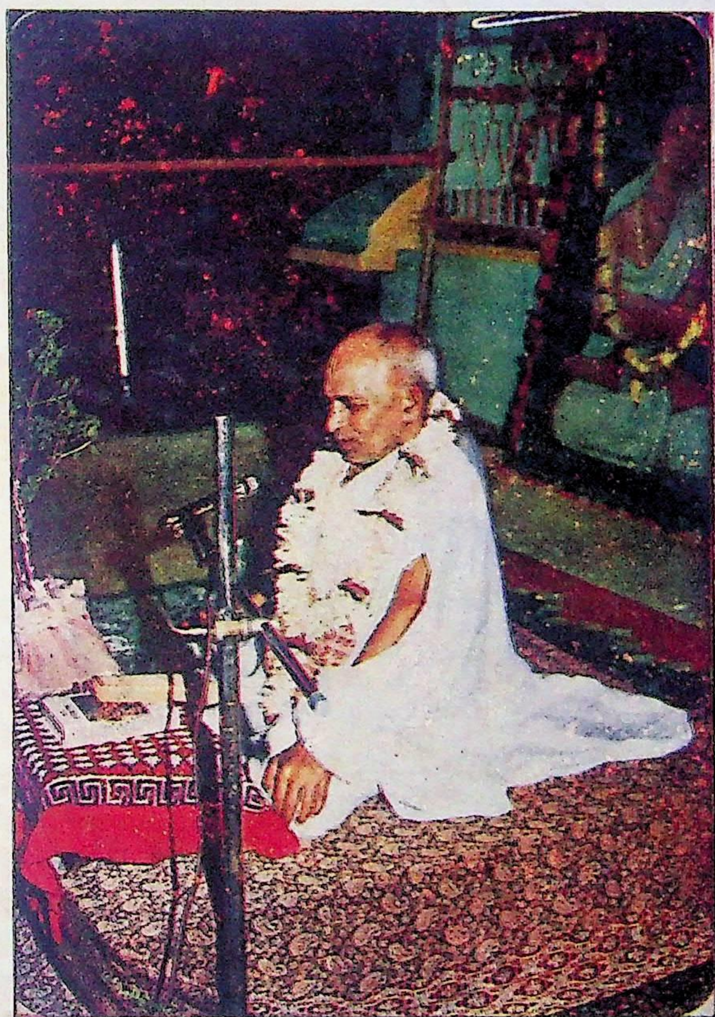
মহানামব্রত ভাষণামৃত



সংকলয়িতা

শ্রী দেবীপ্রসাদ ঘোষ

মহানামব্রত ভাষণামৃত

সংকলয়িতা

শ্রীদেবীপ্রসাদ ঘোষ

প্রকাশক :
শ্রীমহানামব্রত কালচার‍্যাল এ্যাণ্ড
ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, রঘুনাথপুর, ভি. আই. পি. রোড
কলিকাতা-৫৯ (ফোন ৫২৯-০৮৪৫)

প্রথম প্রকাশ : গুরুপূর্ণিমা, ১৩৯৮
২৬শে জুলাই, ১৯৯১
দ্বিতীয় প্রকাশ : গুরুপূর্ণিমা, ১৪০২
১২ই জুলাই, ১৯৯৫
তৃতীয় প্রকাশ : রথযাত্রা, ১৪০৮
২৩শে জুন, ২০০১

: প্রাপ্তিস্থান :

মহা উদ্ধারণ মঠ, ৫৯ মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-৫৪। মহানাম মঠ, পোঃ—নবদ্বীপ, নদীয়া। মহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর, কলি-৫৯। মহানাম অঙ্গন, আগরতলা, ত্রিপুরা। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুধাম, ডাহাপাড়া, মুর্শিদাবাদ। মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। সর্বোদয় বুক ষ্টল, হাওড়া ষ্টেশন। মহানামপ্রচার গাড়ী, শিয়ালদহ ষ্টেশন চত্বর।

মুদ্রাকর :
শ্রীমাণিকলাল ভট্টাচার্য্য
গৌরী প্রেস
২এ, কেদার দত্ত লেন
কলিকাতা-৬

মাধুকরী ৫০.০০ টাকা

সূচীপত্র

মহানামব্রত ভাষণামৃত

প্রকাশকের নিবেদন

আজন্ম তপস্বী. উর্দ্ধ-রেতা, ব্রহ্মচারী আচার্য্য শ্রীল শুকদেব মহারাজ বনের মধ্যে ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন—কখনও অন্তর্দশা, কখনও অর্ধবাহ্য-দশা। এমতাবস্থায় সৌভাগ্যক্রমে তাঁর কানে এল, ভাগবতের একটি শ্লোক—স্তনে কালকূট বিষ মিশিয়ে যাঁকে হত্যা করতে রাক্ষসী এল, তাকে তিনি ধাত্রীগতি দিয়ে বৈকুণ্ঠে পাঠিয়ে দিলেন, এমন দয়াল ঠাকুরকে ছাড়া জীব আর কার শরণ নেবে? শ্লোক-মন্ত্রটি শুনে শ্রীশুকদেবের অন্তরে আকুল আগ্রহ জাগ্‌ল শ্লোকটির উৎস সন্ধানে। ফিরে এলেন পিতার তপোবনে। পেয়ে গেলেন ভাগবত-ধন পিতার নিকট। বেদান্তের বিজ্ঞানঘন পরব্রহ্ম, আনন্দঘন করুণাময় দয়াল ঠাকুর ভগবান্‌-রূপে উদয় হ'লেন ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রীশুকদেবের শুষ্ক হৃদয়-কন্দরে।

হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডতীরে প্রায়োবেশনে ব্রতী মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় সপ্তাহকাল তিনি ভাগবত প্রকাশ করলেন। সেই সভায় শ্রুতিধর শ্রীসূতমুনি আচার্য্য শ্রীশুকদেবমুখাৎ যাহা শ্রবণ করলেন, তাহা তাঁর স্মৃতিপটে অঙ্কিত রয়ে গেল। পরে, নৈমিষ্যারণ্যে আহুত এক বিরাট অধিবেশনে, যেখানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ষাট হাজার ঋষি সমবেত হয়েছিলেন, সেখানে শ্রীসূতমুনি প্রধান বক্তা হিসাবে শ্রীশুক-মুখ থেকে-শ্রুত ভাগবতের বাণী প্রচার করলেন। এইভাবে সর্ব্বত্র কৃষ্ণকথার উদয় হ'ল।

বর্ত্তমান ভারতের শুকদেব, ব্রহ্মজ্ঞানী ও পরম ভাগবত ডঃ শ্রীমন্‌ মহানামব্রত ব্রহ্মচারিজী তাঁর আমেরিকার মিশন শেষ করে স্বদেশে ফিরে এসে, দেশের মধ্যে বিদ্বৎ-সমাজে অনেক সারগর্ভ ভাষণ দিয়েছেন। টেপরেকর্ডে-ধৃত ভাষণগুলির মধ্যে পাঁচটি নির্ব্বাচন করে আগরতলার উষাকান্ত একাডেমীর প্রধান শিক্ষক ভক্তবর শ্রীশিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত মহাশয় একটি মালা রচনা করেছিলেন, উহা 'পাঁচটি ভাষণ' এই

শিরোনামে শ্রীমহানামব্রত কালচার‍্যাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কর্ত্তৃক ইতিপূর্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

পরে, মহানামব্রতজী স্বীয় মা-জননীর নিকট ভাগবত-ধন পেয়ে, তাঁর নির্দেশে সেই থেকে সর্ব্বত্র, গ্রামে গঞ্জে, ভক্ত-সমাজে ভাগবতী কথা পরিবেশন করতে থাকেন। রস-লোলুপ যারা তাঁর ভাষণ-সভায় এসে সমবেত হয়েছিলেন, তারা সেই ভাষণামৃতরস প্রাণভরে আস্বাদন করেছিলেন। তারা ধন্য, তারা মহাভাগ্যবান। আর যারা নিকটে থেকেও সে সময়ে আসতে পারেন নি অথবা তখন অল্পবয়স্ক ছিল বা আদৌ জন্মগ্রহণ করে নাই, তারা সবাই বঞ্চিতের দলে। এই বঞ্চিতদের কল্যাণের জন্য মহানামব্রতজী-প্রদত্ত 'অমৃতদ্রবসংযুতম্' ভাষণের কিছু কিছু অংশ তাঁর সুযোগ্য শিষ্য সূতমুনি-সদৃশ দেবীপ্রসাদজী (শ্রীদেবীপ্রসাদ ঘোষ) কোন কোন ভাষণ-সভায় উপস্থিত থেকে মধুকরের মত নিজের মধুচক্রে ঐ অমৃতরস সঞ্চিত করে রেখেছিলেন। উহাই 'মহানামব্রত ভাষণামৃত' শীর্ষক এই গ্রন্থের মধ্যে প্রকাশিত হ'ল।

আশা করি, আচার্য্যমুখাৎ রস আস্বাদনের আনন্দে যারা বঞ্চিত হয়েছেন, তারা যদি এই গ্রন্থখানি পাঠের পর তাদের 'বঞ্চিত'-এর জ্বালা খানিকটা উপশম হ'ল বলে অনুভব করেন, তবে আমাদের এই গ্রন্থ-প্রকাশনা সার্থক বলে মনে করব। জয় জগদ্বন্ধু হরি।

বিনয়াবনত

নন্দগোপাল সাহা

সেক্রেটারী

শ্রীমহানামব্রত কালচার‍্যাল

এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট।

স্থান ঃ অমৃত সংসদ, বেলুড়

তাং ঃ ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৬১

গীতার ধর্ম

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্।
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতে ॥
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্।
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥

'অম্ব ত্বাম্ অনুসন্দধামি'—হে মাতঃ ভগবদ্গীতে। তোমার অনুশীলন করছি, কারণ করুণাময়ী তুমি, আমাদের দুঃখের কারণ যে 'ভব' অর্থাৎ সংসারের অনিত্যতা, তাকে তুমি সহ্য করো না, তাকে বিদ্বেষ করো, আমাদের জীবন-প্রাঙ্গন হতে দূর কর। প্রাচীন আচার্যেরা 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন গীতাকে। অধুনাকালে দেখা যায়, মহাত্মা গান্ধী গীতাকে 'মা' বলে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করে বলেছেন,—আমার দুইজন মাতা, এক গর্ভধারিণী এবং অপর শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা। উভয়ের স্নেহ-করুণা পেয়েছি অজস্র। গর্ভ-ধারিণীকে সকল সময় কাছে পাইনি। গীতা-মাতা সকল সময়েই আশ্রয় দিয়েছেন তাঁর শান্তিময় ক্রোড়ে। জীবন-সংগ্রামে যখন যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, খুলেছি গীতা গ্রন্থ, তখনই পেয়েছি সর্বাঙ্গসুন্দর সমাধান।

হে মাতঃ গীতে! বিশ্ববাসী আমরা সকলেই তোমার সন্তান। এই ভব সংসারে নিরন্তর দুঃখ কষ্ট ভোগ করি। ভব অর্থাৎ যা আজ আছে, কাল নেই, আগমাপায়ী, মৃত্যুর নশ্বরতা বিভীষিকা আনে জীবনে, দুঃখে জর্জরিত করে। অর্থ-যশ-স্ত্রী-সম্পদ-যৌবন-সুস্বাস্থ্য আজ হয়তো আছে, কাল থাকবে না। আজ জীবন আছে; কাল মৃত্যু গ্রাস করবে। এই ভব-ভয়ে সকলেই আতঙ্কিত, পীড়িত।

তুমি মা 'ভবদ্বেষিণীং', ভবকে বিদ্বেষ করো। কেন? তোমার সন্তান আমরা, আমাদের দুঃখ দেয় কষ্ট দেয় বলে। এতে সন্তানের প্রতি তোমার অপার স্নেহ এবং ভবের প্রতি কোপ বা ক্রোধ একই সময়ে প্রকাশ পাচ্ছে। গাভী যখন বৎসের জন্ম দেয়, তখন অসীম স্নেহ ও ভয়ানক ক্রোধ প্রকাশ পায়। কাউকে বৎসের নিকটবর্তী হতে দেয় না, ক্রোধে তেড়ে যায়, বৎসের প্রতি গভীর স্নেহে সে ভাবে যে, কেউ তার বৎসের অনিষ্ট করতে পারে। গীতা মাতাও তদ্রূপ। তুমি মা, ভবকে বিদ্বেষ করো, কারণ আমাদের যে শাশ্বত স্বরূপ আত্মতত্ত্বের উহা বাধক। তোমার অনুশীলনে এই ভব দূরে যায়। ভব-রোগগ্রস্ত আমরা ভয়ানক দুঃখে পড়ে তোমার শরণ নিচ্ছি।

'মধ্যে মহাভারতে'—তোমার স্থান বা অবস্থান মহাভারতের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে তোমার আবির্ভাব, জীবনের মধ্যস্থলে, প্রান্তে নয়, কর্মকোলাহলের মধ্যে, অন্তে নয়। আমাদের প্রায় সকল শাস্ত্র-গ্রন্থই বাণপ্রস্থে, জীবনের প্রান্তে, শহরের কর্মকোলাহলের অনেক দূরে অরণ্যে বানপ্রস্থাবলম্বী ঋষিদের কৃপায় প্রাপ্ত। উপনিষদের নামই 'আরণ্যক', যেমন বৃহদারণ্যক। গীতা তা নয়। মধ্যে মহাভারতে—বিরাট ভারত ভূখণ্ড, এখন বহু বিভক্ত, সেই অখণ্ড-ভারত (Greater India) যদি ধরা হয়, তবে গীতার আবির্ভাব উহার প্রায় মধ্যস্থলে, প্রান্তে নয়।

ভারতের বিরাট আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিও 'মহাভারত' বলে উল্লেখ করা হয়। এই সংস্কৃতি আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে। কেবল আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নয়; ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সকল ক্ষেত্রেই ব্যাপ্ত এই দান অসামান্য। এই বিরাট সংস্কৃতির মধ্যস্থলে গীতা। মাঝখানে থেকে গীতা সংস্কৃতির এই বহুমুখী ধারা, পরম বৈচিত্র্যময় অবদান-সমূহের সমন্বয় সাধন করেছে। ইহা গীতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য ও গৌরব।

সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় না থাকলে উহা দুর্বল হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্ত্য

জীবন-দর্শন সংস্কৃতির মধ্যে মিলের একান্ত অভাব। বাইবেল বলেছেন, ভগবান ৬ দিনে এই বিচিত্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে তা সত্য নয়, বহু কোটি বৎসর লেগেছে এই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হতে। বাইবেল বলেছেন,—কেহ তোমার এক গালে চড় মারলে, আর এক গাল বাড়িয়ে দাও; কেহ ছাতা চাইলে তাকে জামাটাও দিয়ে দাও। এই আদর্শের বিন্দুমাত্র প্রভাব পাশ্চাত্ত্য জীবন-দর্শনে নেই। সংস্কৃতির বহুমুখী প্রকাশের মধ্যে মিল থাকলে উহা দৃঢ় হয়, সহজে মরে না। গ্রীক, মিশরীয় সভ্যতা আজ মরে গেছে। গীতা আর্য্য-সংস্কৃতির মধ্যদণ্ডস্বরূপ উহার বহুমুখী বিকাশের সমন্বয় সাধন করেছেন।

'নারায়ণেন স্বয়ম্'। নারায়ণ শব্দটি মূল্যবান, ঋষিদের ধ্যানে লব্ধ। অন্তর্যামীরূপে সকল জীবের হৃদয়ে আছেন। যার অর্থ জীবসমষ্টি, তার অয়ন বা আশ্রয়। বিশ্বময় তিনি, তাঁকে দেখি না, বুঝি না, জানি না। একটু চেষ্টা করলে অন্তর্যামীরূপে তাঁকে জানা যায়। বেদান্ত বলেছেন—তিনি অন্তর্যামীরূপে আছেন, বাইরে নয়, আমাদের ভিতরে দেখতে হবে। World Fellowship of Faiths-এর আমেরিকার প্রতিনিধি হিসাবে লণ্ডনে এসেছি। লণ্ডন মিউজিয়াম দেখতে গেছি, সঙ্গে আছেন এক আমেরিকান বন্ধু। গ্রীক আর্ট দেখে খুব মুগ্ধ হন তিনি। বল্লাম, এবার ভারতীয় আর্ট বিভাগটি দেখি। তিনি বল্লেন, ভারতীয় আর্টে দেখবার মত কিছু নেই, সব চোখ বোজা বুদ্ধের মূর্তি। আমি বল্লাম, গ্রীক আর্টে চোখ-কান-নাক-মুখ কি সুন্দর, এরা যেন বলছে দেখ বাইরেটা কেমন সুন্দর। আর ভারতীয় এই সব ধ্যানপরায়ণ মূর্তি বলছে, বাইরে কি দেখছ, দেখার মত বস্তু বাইরে নেই, নিজ অন্তরে দৃষ্টি দাও, পরমসুন্দর পরমমহান শাশ্বত বস্তু দেখতে পাবে, জীবন ধন্য হবে। বন্ধুটি আনন্দে বিস্ময় প্রকাশ করে হাত ধরে বল্লেন, এমন মধুর কথা কখনও ভাবিনি, ধন্যবাদ আপনাকে।

নারায়ণ সকলের মধ্যে থেকে সকল জীবের বুদ্ধিকে চালিত

করেন। সাবিত্রী মন্ত্রে তাঁরই ধ্যান করতে বলেছেন ঋষি। তাতে আমাদের বুদ্ধি শুভ পথে চালিত হবে, জীবন সুন্দর ও আনন্দময় হবে। যার বুদ্ধি শুদ্ধ, সে অন্তর্যামীর নির্দেশে চলে। যে সেই নির্দেশ মত চলে না, সে আঘাত পায়, দুঃখ পায়। মঙ্গলময় অন্তরে থেকে সব সময় আমাদের যে নির্দেশ দেন, উহাই বিবেকের বাণী। অন্যায় করেছে, কেউ জানুক বা না বলুক, বিবেক হৃদয় হতে বলবেন—তুমি অন্যায় করেছ। জগতের সবার চোখে ধূলো দেওয়া যায়, কিন্তু অন্তর্যামীকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। আমার মধ্যে থেকে সে আমার উপর কর্তৃত্ব করছে যেন। তবে বিবেকের বাণী আমরা শুনি না, উপেক্ষা করি। তাই আমাদের ঐ বাণী ক্ষীণ, অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর বাণী শুনতে পেলে, তদনুযায়ী চল্‌লে জীবন সুন্দর ও কল্যাণময় হয়। "অন্তর্যামী পুরুষের এই রীতি হয়। বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়।"—চৈঃ চঃ। যেহেতু আমরা বিবেকের বাণী শ্রবণের ক্ষমতা হারিয়েছি, অন্তর্যামী নারায়ণ সেই বাণী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে উদাত্তকণ্ঠে প্রকাশ করেছেন অর্জুনকে লক্ষ্য করে সর্ব মানবের জন্য। প্রত্যেকের অন্তরের বিবেক বাণী আমরা শুনতে পেলাম কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে।

বলেছেন—'পার্থায় প্রতিবোধিতাং', অর্জুনকে প্রতিবোধিত করার জন্য। বস্তুতঃ বলেছেন সকল জীবের উদ্দেশ্যে। অর্জুনের এক নাম 'নর', আমরাও নর, অর্জুন আমাদের সকলের প্রতিনিধি। আমাদের সকলের হয়েই সে শুনেছে বিবেকের বাণী। অর্জুনের মত আমরাও কুরুক্ষেত্রে। 'কুরু' অর্থাৎ কর। জীবন ভরা কর্তব্যের আহ্বান। পিতা-মাতা পত্নী, পুত্র-কন্যা ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, সমাজ, রাষ্ট্র—সকল ক্ষেত্রেই কর্তব্যের ডাক। কর্তব্য না করলেও উদ্বেগে অশাতি জাগে মনে। পীড়িত পুত্রের জন্য ফল নেওয়া কর্তব্য, না করলেও উদ্বেগ অশান্তি জাগে মনে। পীড়িত পুত্রের জন্য ফল নেওয়া কর্তব্য, না পারলে চিত্তে শান্তি পাই না। চারিদিক থেকে এই কর্তব্যের কঠোর আহ্বান। ইংরাজ কবি Wordsworth

এই কর্তব্যকে (Duty) লক্ষ্য করে বলেছেন, ঈশ্বরের বাণীর কঠোর কন্যা (Stern daughter of the Voice of God)-এর সঙ্গে কোন Compromise বা বোঝাপড়া চলে না।

কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের প্রাক্কালে ভেঙে পড়ল অর্জুন। অর্জুনের বীরত্ব বিষয়ে কারও সংশয় নেই। বীরত্বের অহঙ্কার কিছু আছে। যুদ্ধ পূর্বেই স্থির হয়েছে, সেজন্য প্রস্তুতিও চলেছে অনেক দিন থেকে। অর্জুনের রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুন বল্লেন,—রথখানা উভয় সেনার মধ্যে রাখ, দেখি ধৃতরাষ্ট্রের কোন্ কোন্ পুত্র দুর্বুদ্ধি চালিত হয়ে যুদ্ধ করতে এসেছে। যোদ্ধাদের দেখতে দেখতে হঠাৎ ভেঙ্গে পড়লেন অর্জুন। শরীর তার কাঁপছে, গাণ্ডীব খসে পড়েছে হাত থেকে, মাথা ঘুরছে, মন অশান্ত। যুদ্ধ করব না, একথা বলে নিরাশ হয়ে বসে পড়লেন।

দু'টি পরস্পর বিরোধী কর্তব্যের চাপে ভেঙ্গে পড়েছেন অর্জুন। রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি কর্তব্য বলছে 'যুদ্ধ কর'। পারিবারিক কর্তব্য দাবি করছে, পিতামহ, গুরু, আত্মীয় স্বজনকে মারা উচিত নয়। যাঁরা পূজার পাত্র ভীষ্ম, দ্রোণ তাঁদের বধসাধন কেবল অন্যায় নয়, অত্যন্ত বেদনাদায়কও বটে। সমস্যা এই—কর্তব্যের মধ্যে বিরোধ। একটা কর্তব্য পালন করতে গেলে, অন্যটা সম্ভব হয় না। কোনটা শ্রেয়, করা উচিত তা অর্জুন বুঝে উঠতে পারছেন না। তাই ভেঙ্গে পড়েছেন, বিষাদিত হয়েছে তার চিত্ত।

জীবনে সকলেরই সমস্যা এই, একটা দিক রাখতে গেলে অন্যটি ছাড়তে হয়। অর্থ উপার্জন করতে যে ভয়ানক খাটুনি তাতে শরীর থাকে না, আবার শরীর রাখতে গেলে অর্থাভাবে না খেয়ে মরতে হয়। বিদ্যালাভের যোগ্যতা ছিল, কিন্তু সংসারের প্রয়োজন মেটাতে বিদ্যালাভ হল না। শ্রীরামচন্দ্রের সমস্যা—প্রজারঞ্জন করতে গেলে স্ত্রীর প্রতি অন্যায় করতে হয়, স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য করতে গেলে, প্রজারঞ্জন হয় না। স্বাধীনতা লাভ করতে গেলে ভারত দ্বিখণ্ড করতে হয়, দেশের অখণ্ডতা রাখতে গেলে স্বাধীনতা লাভ হয় না। সর্বত্রই

এই দ্বন্দ্ব। কিসে আমাদের কল্যাণ তা বুঝতে না পেরে জীবন সমস্যা-সঙ্কুল এবং বিষাদময়।

অর্জুনের রথের সারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আমাদের জীবন-রথের সারথিও তিনি। তাঁর বাণী শুনতে পাই না আমরা 'সংসারের কোলাহলে বধির বলে'। সকল মানবের প্রতিনিধি অর্জুন। আমাদের হয়ে শুনেছেন সেই বাণী। অন্তরের বিবেকের বাণী আজ বাইরে শোনা গেল। জীবনের সকল সমস্যায় নারায়ণের বাণী গ্রহণ করে চললেই জীবনে পরম কল্যাণ লাভ ও দুঃখ মুক্তি ঘটবে।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের কৃপায় কুরুক্ষেত্রের কোলাহলে সেই বাণী আজও হারিয়ে যায়নি। তাঁর কৃপায় সঞ্জয় ঘরে বসেই সব দেখেছেন, শুনেছেন এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে শুনিয়েছেন। গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোতাও কৃষ্ণ (পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ) এবং প্রচারকর্তাও কৃষ্ণ (মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ) এই গাম্ভীর্যপূর্ণ তত্ত্ব প্রচারের জন্য একজন ভগবদ্‌তুল্য ব্যক্তিই চাই।

গীতার অধ্যায় আঠারটি যেন গীতা-মায়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। অথবা আঠারটি সিড়ি, বিষাদ হতে মোক্ষে উত্তীর্ণ হবেন, তবেই গীতা-মায়ের শান্তিময় ক্রোড়ে পৌঁছান যাবে। মৃত্যুর পরে মুক্তিলাভ গীতার লক্ষ্য নয়, এই জীবনই মোক্ষের অবস্থা লাভ এঁর আদর্শ। এই জীবনে যিনি মুক্তি পেয়েছেন, পরলোকে তিনি অবশ্যই তা পাবেন। ডাক্তার যেমন রোগীকে জিজ্ঞাসা করে—ওষুধ ঠিক মত খেয়েছ কিনা, রোগ সেরেছে কিনা। গীতার শেষে ভগবান অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি সব মনযোগ সহকারে শুনেছ তো, তোমার অজ্ঞান-জনিত মোহ দূর হয়েছে তো? রোগী কেমন অনুভব করছেন সেটাই বড় কথা। অর্জুন বল্লেন,—আমার মোহ দূর হয়েছে, সংশয় চলে গেছে, কর্তব্য-অকর্তব্য জ্ঞান ফিরে পেয়েছি এখন তোমার উপদেশ মতই কাজ করব,—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ১৮।৭৩

ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র শুনলেই কাজ হবে না, তদনুযায়ী কাজ করতে হবে। শিক্ষালাভ করলেই মানুষ হয় না, আধুনিক বিজ্ঞানের নৃশংস প্রয়োগে জগৎ প্রায় ধ্বংসের দ্বারে এসেছে। সারথির উপদেশে অর্জুনের জীবন গেছে পাল্টে, এখন তাঁর উপদেশ মত কাজ করা কঠিন নয়। বুদ্ধি, জ্ঞানের অনুশীলন করলেই হবে না, ইচ্ছাশক্তিকে কল্যাণমুখী করতে হবে। বুদ্ধির সঙ্গে শুভ ইচ্ছার যোগ হওয়া চাই। বেদে এইরূপ প্রার্থনা আছে—বুদ্ধি, ইচ্ছা মঙ্গল প্রয়াসে যেন পর্যবসিত হয়। গীতার আঠারটি অধ্যায় অনুশীলন করলে মনে হবে, তিনি আমার বুদ্ধি চালনা করছেন, তাঁর ইচ্ছায় চলাই কল্যাণকর।

গীতা-মায়ের যে স্তনধারা আঠার অধ্যায় ধরে বর্ষিত হয়েছে, উহা 'অদ্বৈত অমৃত'। উহা বিশ্বে সকল বিভেদ বিদ্বেষ দূর করে পরাশান্তি দান করতে সমর্থ। 'অদ্বৈত' তত্ত্বের অনুভবই অমৃত, উহা মরণধর্মী জীবকে অমৃতত্ব এবং দুঃখী জীবকে আনন্দের অধিকারী করে। এই তত্ত্বের জ্ঞান না থাকায় আমরা বহু দেখি, লোকজন, হাতি ঘোড়া, পশুপাখী ইত্যাদি। সবার মধ্যে যিনি এক ও 'একমেব অদ্বিতীয়ম্' রূপে বিরাজিত, তাঁকে দেখি না, অনুভব করি না। গীতা আঠার অধ্যায়ে এই তত্ত্বে আমাদের পৌঁছে দেন। অনেক পাণ্ডিত্য যার আছে তাকে গীতা পণ্ডিত বলেন নি। বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গাভী, হাতী, কুকুর প্রভৃতিতে যিনি সমদর্শী, কোন পার্থক্য বোধ করেন না, গীতায় তাঁকেই পণ্ডিত বলা হয়েছে। (বিদ্যাবিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ গীতা-৫/১৮)। অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানী অনুভব করেন এই বিশ্বজগতের সকল কিছুর মধ্যে একত্ব, সর্বভূতে সর্বজীবে এক পরমাত্মাই বিলাস করছেন। তাই তিনি সর্বত্র সমদর্শী হন। তিনি আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে নিজ আত্মায় দর্শন করেন (সর্বভূতস্থ-মাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শিনঃ ॥ গীতা-৬/২৯)। শুধু তাই নয়, তিনি শ্রীভগবানকে সর্বভূতে

অবস্থিত দেখেন এবং শ্রীভগবানের মধ্যে অবস্থিত দেখেন সর্বভূতকে (যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি। গীতা-৬/৩০) তিনি সকল দ্বন্দ্বের পরে চলে যান। সুখ-দুঃখ, শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, লাভ-অলাভ সবই তাঁর নিকট সমান মনে হয় (সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥ গীতা-১২—১৮)। তিনি সদা সর্বদা শ্রীভগবানে অবস্থান করেন। এই অদ্বৈতের অনুভব অমৃতত্ব দান করে।

ঘট আছে পুকুরে জলের মধ্যে, আবার ঘটের মধ্যেও রয়েছে জল। বিরাট চৈতন্যে আমরা আছি, আমাদের মধ্যেও আছেন শ্রীচৈতন্য। কাউকে আঘাত করলে নিজেকেই আঘাত করা হয়। ঘট ভাঙ্গলে ঘটের জল ও পুকুরের জল এক হয়ে যায়। সর্বজীবেই একই চৈতন্যে স্থিতিলাভ হয়। এই অনুভব হলে দেহভাণ্ড ভেঙ্গে গেলে সেই পূর্ণ চৈতন্যে স্থিতিলাভ হয়। এই জ্ঞান না হলে দেহভাণ্ড যতবার ভাঙ্গবে ততবার এই মায়াময় সুখদুঃখপূর্ণ সংসারে ফিরে আসতে হবে। এই অমৃতের সন্ধান পেলে জীবন অমৃতময় হয়ে যায়। গীতায় শ্রীভগবান শরণাগত শিষ্যের প্রতি অত্যন্ত দরদমাখান ভাষায় এই তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করেছেন। হৃদয়ে দরদ থাকলে তবেই উপদেশে কাজ হয়। বেদ-উপনিষদে এই উপদেশ থাকলেও তা তেমন গ্রহণযোগ্য হয় নি। কারণ, সেখানে নেই এই দরদ, ভক্তের জন্য ভগবানের বেদনা বোধ।

সারা বিশ্বে গীতার সমাদর। নিউইয়র্কের অল্প দূরে একটি ইন্স্টিটিউশনে আমার বক্তৃতার কথা। নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পূর্বে উপস্থিত হয়েছি। ওখানকার Librarian আমাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। বল্লেন, এখনও কিছু দেরী আছে, আমাদের এখানে সুন্দর লাইব্রেরী আছে, চলুন দেখবেন। আরও বল্লেন, লাইব্রেরীতে গীতার একটি বিভাগ আছে, আমরা গীতা ভালবাসি, সপ্তাহে একদিন এখানে গীতার ক্লাস হয়। বিশ্বে ধর্মগ্রন্থের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী চল বাইবেলের, তারপরই আপনাদের গীতার স্থান।

বক্তৃতা আরম্ভ করে সাহেবের এই কথা উল্লেখ করে বল্লাম,—এতে আমার সিদ্ধান্ত হল, গীতার স্থান সবচেয়ে উচ্চে, তারপর বাইবেলের। এ-কথায় সব শ্রোতা বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকাল। আমি বল্লাম, বাজারে যে জিনিস চলে, তা দুই প্রকারে চলে—এক, ঐ জিনিষ চালাবার জন্য বিজ্ঞাপন, Canvassing করতে হয়, নিরন্তর 'Push' করতে হয়। আবার দেখা যায়, বিজ্ঞাপন ছাড়াই জিনিষটির যথার্থ মূল্য বোধে লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিচ্ছে, Push করতে হয় না যেন Pull করে নিচ্ছে। বাইবেল প্রচারের জন্য বাইবেল সোসাইটি বছরে কোটি কোটি টাকা খরচ করে, অসংখ্য পাদ্রী এই কাজে নিযুক্ত আছে, বিনামূল্যে বা সামান্য মাত্র মূল্যে কত বাইবেল বিতরণ করা হয়। কিন্তু গীতা প্রচারের জন্য একটি পয়সাও কেউ খরচ করে না। গীতা লোকে কেনে এবং পড়ে তা এর যথার্থ মূল্যবোধের জন্য। যদি আমার কথায় সংশয় থাকে, তবে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। একটা বছর বাইবেল প্রচারের খরচ একেবারে বন্ধ করে দিন ; অথবা আমেরিকার সব গির্জায় প্রার্থনার শেষে প্রচার করুন, গীতা নামে হিন্দুদের একখানা ধর্মগ্রন্থ আছে, খুব ভাল, আপনারা পড়তে পারেন।

গীতায় শ্রীভগবানের বক্তব্যের ভাষা অতি মধুর প্রাণস্পর্শী। ভক্তের জন্য প্রাণ কেঁদেছে ভগবানের, তাই দরদ দিয়ে তার রোগ সারিয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। অপূর্ব মধুর কথা, অর্জুন শুনছে মন-প্রাণ দিয়ে। মুখে কোন কথা নেই, দুই একটি জিজ্ঞাসা ছাড়া। নিমন্ত্রণ বাড়ী খুব হৈ চৈ, খাবার যখন দেওয়া হল আর গোলমাল নেই। অর্ধেক বক্তৃতার পর, রোগীর মনে হয়েছে সে এখন সুস্থ (মোহোঽয়ং বিগতো মম—গীতা-১১/১) বিষাদগ্রস্ত রোগী আঠার অধ্যায়ের শেষে অনুভব করেছেন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ (নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা)। জীবনের বিশাল কর্মক্ষেত্রে আমরা সকলেই পীড়িত, বিষাদিত। আমাদের জন্য ঐ একই ঔষধ।

শাস্ত্র দুঃখমুক্তির জন্য বাসনা-কামনা ত্যাগের কথা বলেছেন। গীতার উপদেশ তা নয়। চিত্তের বহুমুখী বৃত্তি দুঃখ দেবে, উৎপাটন করাও যাবে না। সব কামনার মূলে একটি কামনা আছে, ভিত্তি-ভূমি আছে। সেই লক্ষ্য জেনে, দৃষ্টি সেদিকে স্থির রেখে চলতে হবে। জীবনে অনেক প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়, তাতে যেন লক্ষ্যহারা না হই। আমাদের জীবনধারণের উদ্দেশ্য কি? অর্থ রোজগারের জন্য? যদি প্রশ্ন করা যায়, অর্থ রোজগার করেন কেন? উত্তর হবে, খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য। পুনরায় যদি প্রশ্ন করা যায়—বাঁচার কি প্রয়োজন? এর উত্তর আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার নয়। খাই বাঁচার জন্য ঠিকই, কিন্তু বাঁচি খাবার জন্য, এতে মন সায় দেয় না। গৃহে পায়খানা (Lavatory) অপরিহার্য, কিন্তু সেখানে আমরা বাস করি না। জীবনের লক্ষ্য স্থির হওয়া একান্ত প্রয়োজন, তা'হলে দুঃখ লাঘব হয়ে যাবে। গীতা কৃপা করে প্রকাশ করেছেন সেই লক্ষ্য কি,—

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ৬/২২

যাঁকে পেলে এ জগতের অন্য কিছু লাভ শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয় না, যাঁকে পেলে জীবনে গুরুতর দুঃখ এলেও বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না, সেই শ্রীভগবান-লাভই জীবনের লক্ষ্য। সেই আমাদের সাধ্যবস্তু। তাঁর দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে আমাদের চলতে হবে জীবন পথে। তাঁকে পেলে বাসনা কামনা আর উদ্বেগ দেয় না, সবই তাতে পর্যবসিত হয়ে যায়।

লক্ষ্য স্থির থাকে না। অহঙ্কার প্রবল হয়ে সব গোলমাল করে দেয়। রজ-তমোগুণ বর্দ্ধিত হলে মানুষ অহঙ্কারী, ক্রোধী ও দুর্বিনীত হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অন্যায় কর্ম হতে বিরত ও ভালো হবার চেষ্টা করেও মানুষ পারে না। অর্জুন যে প্রশ্ন করেছেন ভগবানকে, সে প্রশ্ন আমাদের অনেকের মনেও উদয় হয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কে যেন বলপূর্বক আমাদের পাপকার্যে নিয়োজিত করে,—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩/৩৬

শ্রীভগবান বল্লেন, ইহার হেতু কাম ও ক্রোধ। রজোগুণ হতেই এদের উৎপত্তি, ইহা দুষ্পূরণীয় এবং সংসারে শত্রুস্বরূপ; এদের মূলে রয়েছে অহঙ্কার (অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে-/৩২৭)। এই দেহ কেন্দ্র করে যে অহঙ্কার, সেই দেহের উপর কি অধিকার আছে আমাদের? ১৮ বছরের দেহ ৫৮ বছরে নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়ে না। অহঙ্কার সাজে না আমাদের। বর্ণের আদিতে 'অ' এবং অন্তে 'হ', বিশ্বের আদিতে ও অন্তে যিনি আছেন, ও থাকেন, তাঁরই সাজে 'অহং', আর কারও নয়। 'আমি, আমার'—এর থেকেই আমাদের যত গোলমাল দুঃখ অশান্তি। সব আমিত্ব, তাঁকে সমর্পণ করে তাঁর শরণাগত হলেই কল্যাণ। আমি গেলে ঘুচিবে জঞ্জাল। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমংহদেবের একটি উদাহরণ ভারি সুন্দর। গরুর বাছুর হাম্বা হাম্বা (অর্থাৎ আমি, আমি) করে, সেজন্য তার কত দুর্গতি। মরার পর চামড়া দিয়ে জুতা হয়, নাড়ি-ভুড়ি দিয়ে ধুনুরি তুলা ধোনে, তখন তুঁহু তুঁহু (অর্থাৎ তুমি, তুমি) শব্দ বের হয় তবেই তার নিস্তার। সংসারে অহঙ্কার আনে পদে পদে আঘাত দুঃখ। চরম আঘাত খেয়ে মনে হয়—ঠাকুর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

অহঙ্কারশূন্য হয়ে যা কিছু তোমার তা ঈশ্বরে সমর্পণ কর। ("যৎ করোষি যৎ অশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্'—৯/২৭)। অর্পণেও অহঙ্কার যেন প্রবেশ করে, সেজন্য সদা সাবধান হতে হবে। বিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা খরচ করে সুরম্য মন্দিব করেছেন রাজা। সেই মন্দির ত্যাগ করে সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম ভক্তগণ সঙ্গে রাস্তার ধারে সংকীর্তন করছেন। রাজা সুধালেন, কেন মন্দির ছেড়ে রাস্তায় কীর্তন করছেন? নরোত্তম বল্লেন,—'সে মন্দিরে দেব নাই।' তখন রাজা কহে রোষে,—

দেব নাই। হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মত কথা কহ।
রত্নসিংহাসন' পরে দীপিতেছে রতনবিগ্রহ—
শূন্য তাহা ?
'শূন্য নয় রাজ্যদম্ভে পূর্ণ' সাধু কহে,
'আপনারে স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নহে'।

সৎ কাজও মন্দ হয়ে যায়, যদি সেখানে অহঙ্কার জাগে। তাই ভগবান গীতার শেষ অধ্যায়ে শোনালেন চরম কথা,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ১৮/৬৬

সব ধর্ম ছেড়েও যদি কেবল আমার শরণ লও, সেজন্য যদি তোমায় পাপ স্পর্শ করে, আমি তোমাকে সকল পাপ হতে মুক্ত করব। সর্বতোভাবে তাঁর হতে হবে, তখন আর কোন কর্তব্য থাকবে না। তখন সবই ভগবানের কাজ, তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র (নিমিত্ত মাত্র ভব সব্যসাচিন্)। সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগতি, ইহাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। তা সম্ভব না হলে, অন্তত দিনের শেষে একবার সবছেড়ে তাঁর কাছে যেতে হবে। আমার বলে কোন ভাবনা যেন না থাকে। তোমাকে ছেড়ে যেন অন্য কিছু ভাবনায় না আসে। 'ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ' এই উপদেশ যেন অন্তর গ্রহণ করে। নানা বিষয় সদাই চিত্তে এসে ভীড় করে, তাইতো ভগবান এসে ফিরে যান, বসতে পারেন না স্থান খালি না থাকায়। 'ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম'। মন বিষয়-শূন্য হলেই তিনি এসে উপস্থিত হন। তখন আমাদের সব দায় তিনি গ্রহণ করেন। আমাদের ভিতরটা ফাঁপা করতে পারলে তিনি বাঁশীর মত বাজাতে পারেন। পায়ের জুতা সেবা করতে পারে তখনই, যখন সে চরণে স্থান পায়। যতক্ষণ অহঙ্কার আছে, ততক্ষণ এই শরণাগতি, জুতার মত অভিমানশূন্যতা আসে না। এই শরণাগতি এলেই পরম কল্যাণ। তখন আমার কিছু নয়, সবই তাঁর —'তোমারি গরবে গরবিনী হাম, রূপসী তোমার রূপে'। এই বোধে, স্মরণে, উপাসনায়, তাঁর উপর ঐকান্তিক

নির্ভরতায় নেমে আসে তাঁর অপার করুণার ধারা। তখন তিনিই সাধকের, ভক্তের সকল ভার গ্রহণ করেন। 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্', নিজেই সকল ভার বহন করেন এই তাঁর বাক্য। ভক্ত অর্জুন মিশ্র তাঁর জীবন্ত প্রমাণ। মিশ্র ছিলেন পরম পণ্ডিত, ভক্ত ও দরিদ্র। সে যুগে ছাপা পুস্তক ছিল না। হস্ত লিখিত পুথিতে 'বহাম্যহম্' দেখে সংশয় হয়, ভাবেন ভগবান নিজে বহন করেন না, কারও মাধ্যমে দান করেন। তাই 'বহাম্যহম্' কেটে সেখানে 'দদাম্যহম্' লিখে রাখেন।

একদিন গরীব ব্রাহ্মণের ঘরে কিছুই খাদ্য বস্তু নেই। স্ত্রী বল্লেন, ভিক্ষা না করলে গোবিন্দের ভোগ হবে না, আমাদের না খেয়ে কাটাতে হবে। অর্জুন মিশ্র তাই ভিক্ষায় বেরিয়েছেন। কিছু পরে একটি কৃষ্ণবরণ ও অপরটি গৌরবরণ, দু'টি ছেলে অনেক জিনিষ-পত্র মাথায় নিয়ে উপস্থিত। তারা বল্ল, আমরা রাজার বাড়ী থেকে আসছি, অর্জুন মিশ্র এসব পাঠিয়েছেন। আরও অনেক জিনিষ-আছে, আমরা নিয়ে আসছি। জিনিষ পত্রে ঘর ভরে গেল। হঠাৎ মিশ্রের পত্নী লক্ষ্য করলেন, ছেলে দু'টির পিঠ কেটে রক্ত পড়ছে। জিজ্ঞাসা করলেন, কি করে কাটল। তারা বল্লে, আমরা ভার বইতে পারি না, এজন্য অর্জুন মিশ্র মেরেছেন। পত্নী অবাক হলেন, তার স্বামী তো অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির লোক, তবে কি রাজবাড়ীতে এত সব জিনিস পেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল। ছেলে দু'টিকে একটু অপেক্ষা করতে বল্লেন, কিন্তু তাঁরা দাঁড়াল না, অনেক কাজ আছে বলে চলে গেল। স্ত্রী বহু প্রকারের খাবার তৈরী করে প্রাণভরে শ্রীগোবিন্দের ভোগ দিয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছেন। ভাবছেন, এত বেলা হল, এখনও স্বামী কেন আসছেন না, তিনি তো বাইরে কোথাও খান না।

এদিকে অর্জুন মিশ্র ভিক্ষায় বেরিয়ে অনেক ঘুরলেন, কিন্তু কিছুই মিলল না। ক্লান্ত হয়ে এক বৃক্ষতলে বসেছেন, একটু পরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুম ভেঙ্গে দেখলেন দুপুর প্রায় গড়িয়ে গেছে,

ভিক্ষা কিছু না পেয়ে একটু বিষণ্ণ মনে ঘরে ফিরলেন। স্ত্রী অনুযোগ করে বল্লেন, এত দেরী কেন করলে, কখন সব রান্না করে গোবিন্দের ভোগ দিয়ে বসে আছি। অর্জুন মিশ্র জিজ্ঞাসা করলেন, ঘরে কিছু ছিল না, কি দিয়ে ভোগ হল? স্ত্রী বল্লেন, কেন তুমি রাজবাড়ী থেকে কত জিনিষ পাঠিয়েছ, ঘর ভর্তি হয়ে গেছে। দু'টি খুব সুন্দর ছেলে, একটি কালো একটি ফরসা, সব বয়ে এনেছে॥ কত না কষ্ট হয়েছে তাদের। তারপর দেখি তাদের পিঠ কেটে রক্ত পড়ছে, তারা বল্লে—আমরা ভার বইতে পারি না, এজন্য অর্জুন মিশ্র মেরেছে। অর্জুন মিশ্র তখন বল্লেন, আমি রাজবাড়ী যাইনি এবং কিছু ভিক্ষাও আজ পাইনি। এ নিশ্চয় কৃষ্ণ-বলরাম, নিজেরা সব জিনিষ বয়ে এনেছেন, তুমি দেখেও চিনতে পারনি। আর পিঠ কেটে যে রক্ত পড়ছে দেখছ, তার কারণ আমি গীতার 'বহাম্যহম্' কেটে 'দদাম্যহম্' লিখেছি। গীতা তো তাঁর হৃদয় (গীতা মে হৃদয়ং পার্থ), সেখানে আঘাত লেগেছে। কী অসীম করুণা তাঁর, ভেবে স্বামী-স্ত্রী আকুল হলেন কেঁদে। মিশ্র তখুনি গিয়ে গ্রন্থের 'দদাম্যহম্' কেটে তিনবার লিখলেন 'বহাম্যহম্'। নিজে ভক্তের যোগক্ষেম যে বহন করেন তিনি, আমি অর্জুন মিশ্র তার সাক্ষী। অনন্যচিন্ত ভক্তের জন্য তিনি সবই করেন, তার দাসত্বও, 'ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়।'

প্রভু জগদ্বন্ধু চলেছেন, সঙ্গে ভক্ত গোপাল মিত্র। রাত্রিকাল। গ্রামের রাস্তা ঘরের পাশ দিয়ে। পায়ের শব্দ শুনে এক বাড়ির মধ্যে হতে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—কে যায়? মিত্র মহাশয় বল্লেন, আমি গোপাল মিত্র। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন,—সঙ্গে কে? প্রভু অত্যন্ত সঙ্গোপনে চলাফেরা করতেন, কাউকে জানাতে চাইতেন না কোথায় কখন যান। এজন্য একটু ইতস্ততঃ করে গোপাল মিত্র বল্লেন,—সঙ্গে মুটে। পরে প্রভু গোপালকে বল্লেন,—"গোপাল! তুমি ঠিকই বলেছ, আমি ভবের মুটে, জীবের পাপ-তাপ সব বোঝা বইতে আসি।" তিনি যে বোঝা বহন করেন তা কেবল শরণাগত ভক্তের।

ভক্তের অবস্থা 'মার্জার-শিশুবৎ'। দিনের মধ্যে বিড়াল তার বাচ্চাটিকে মুখে করে অনেকবার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায়। বাচ্চাটি কখনই আপত্তি করে না বা বিরক্ত হয়। তার ভাবখানা এইরকম যে তার কিসে মঙ্গল হবে তা সে জানে না, জানে তার মা। তাই মা যখন যেখানে রাখে, মনে করে যেন সেইটাই তার সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। একান্ত ভক্তেরও এই ভাব। যখন যে অবস্থায় থাকে, সুখে বা দুঃখে, মনে করে সেইটাই তার ভগবদ্-দত্ত কল্যাণকর স্থান। সেজন্য কোন কিছুতেই তার উদ্বেগ হয় না।

গীতার সার কথা ইহাই। এই কথা আমরা শুনেও শুনি না, বুঝেও বুঝি না। অহঙ্কার অনেক প্রকারের, তা দূর করার চেষ্টা করি না। শাস্ত্রের কথা, শাস্ত্রের ভাষা আমাদের মর্ম স্পর্শ করে না। আমাদের অবস্থা কেমন—নদীর স্রোতে পড়েছে এক বিরাট হাতি, প্রবল স্রোতে প্রাণ তার ওষ্ঠাগত, কিছুতেই উঠতে পারছে না। সেই নদীর স্রোতে ছোট ছোট মাছ আনন্দে সাঁতার কেটে চলেছে। মাছ হাতিকে বলছে—কেন এত কষ্ট পাচ্ছ, এস না আমাদের মত। মাছের ভাষা হাতি বুঝতে পারে না, তার পথে চলতে পারে না। ভক্তের ভাষা অভক্তেরা বুঝে না, বিষয়ীরা কর্ণপাতও করে না। তাদের কাছে জীবনটা মনে হয় সংগ্রামময়। বাঁচবার জন্য প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ করতে হচ্ছে—Struggle for existence, মনে হচ্ছে জীবনটা দুঃখভরা। এই দুঃখভরা সংসারেই ঋষিরা অনুভব করেছেন আনন্দভরা মধুময়। 'মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধব'—অফুরন্ত মধু, আনন্দ। কারণ, মধুব্রহ্মের সঙ্গে, আনন্দময় ভগবানের সঙ্গে তাঁরা ছিলেন নিত্যযুক্ত।

যিনি পুরুষোত্তমকে ভালবেসেছেন, মঙ্গলকামী সুহৃদ বলে জেনেছেন, তাঁর জীবনে কোন দুঃখ নেই। বিপদ আপদ যাই আসুক তাঁকে উদ্বেগ দিতে পারে না, তাঁর শান্তি নষ্ট করতে পারে না। 'ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে'। সমুদ্রের উপরি চলেছে একটি জাহাজ যাত্রী নিয়ে। হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠল। জাহাজ ডুবে যাবার

উপক্রম। সকলেই নিজ স্ত্রী-পুত্র এদের সামলাচ্ছে, আকুল হয়ে ডাকছে ভগবানকে রক্ষা কর বলে। ঐ জাহাজে সস্ত্রীক এক সৈনিক পুরুষ চলেছে। তার স্ত্রী দেখল এই ঘোর বিপদকালেও তার স্বামী কোন খোঁজ খবরই করছে না। অনেক চেষ্টার পর স্বামীর দেখা পেলেন জাহাজের উপর ডেকে। সেখানে সে আপন মনে নিশ্চিন্ত হয়ে পায়চারি করছে। স্ত্রী অনুযোগ করে বল্লেন,—তোমার কি কোন আক্কেল নেই, এই ভয়ানক বিপদে নিশ্চিন্ত হয়ে আছ, একবারও আমার খোঁজ করছ না, দেখছি আমার প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র ভালবাসা নেই। সৈনিক কিছু না বলে তার কোমরে ঝোলান তরোয়ালখানা হঠাৎ বের করে স্ত্রীর বুকের কাছে ধরল। আর একটু বাড়ালেই অনিবার্য মৃত্যু। স্ত্রী প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও তারপর হেসে ফেল্লেন। সৈনিক বল্ল—তুমি হাসছ, ভয় করছে না তোমার? স্ত্রী বল্ল—না, আমি জানি তুমি আমাকে মারতে পার না, তুমি আমাকে ভালবাস। সৈনিক তখন বল্লে,—তুমি যে কারণে ভয় করছো না, সেই একই কারণে এই ঝড়-বিপদে আমি ভয় করছি না। আমি জানি, এই ঝড় সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর, তিনি আমাকে মারতে পারেন না, আমাকে ভালবাসেন। তাই নিশ্চিন্ত আছি। শ্রীভগবানকে আপন জন, প্রিয় ও সর্বভূতের সুহৃদ বলে যিনি জানেন, তিনিই শান্তিলাভ করেন—গীতায় ইহাই ভগবানের বাণী—

"সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি"

জয় জগদ্বন্ধু!

———

গোপাল চ্যাটার্জী রোড
সিঁথি
২৬শে আগষ্ট, ১৯৬১

চণ্ডীর ধর্ম

ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির মূল ধারা দুইটি। একটি তন্ত্রের ধারা, অপরটি বেদের। ভারতের অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে এই ধারাই খুব প্রাচীন, অনাদিকাল হতে আছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ গবেষণা করে এদের উদ্ভবকালের সুপ্রাচীনত্ব স্বীকার করেন না। এই দুই ধারা ছিলই, কখনও এদের গতিবেগ বর্ষার নদীর মত খুব স্ফীত, আবার কখনও ক্ষীণকায়া, কিন্তু কখনও একেবারে মরে যায় নি।

নিখিল তন্ত্র শাস্ত্রের নির্যাস চণ্ডী গ্রন্থ, যেমন সমগ্র বেদ-উপনিষদের সার গীতা গ্রন্থ। উপনিষদের সংখ্যা ১০৮; তন্ত্র শাস্ত্র গ্রন্থ মোট ১৯২ খানা। তন্ত্রের দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতের তিনটি ভাগ, বিন্ধ্যপর্বতকে মাঝখানে রেখে—অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা ও বিষ্ণুক্রান্তা, প্রতিভাগে ৬৪ খানা করে তন্ত্র গ্রন্থ। উপনিষদ সব পাওয়া গেছে, তন্ত্রের সব গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

এই দুই ধারায় কিছু সাদৃশ্য ও কিছু বৈসাদৃশ্য আছে। মোটামুটি-ভাবে বলা চলে, তন্ত্র বিজ্ঞানের ধারা এবং বেদ দর্শনের ধারা। এক-সময় এই দুই ধারার মধ্যে বেশ মিলন ঘটেছিল এবং তা মধ্যযুগে। সেটাই ছিল জাতীয় জীবনের স্বর্ণযুগ। এখন মিলের থেকে অমিলের প্রাধান্য। দর্শন একটা Absolute বা চরম সত্য এবং সবচেয়ে বড় একটা সত্তায় আস্থাবান। বিজ্ঞান তা মানতে রাজি নয়। জাগতিক ব্যাপারে দর্শন ও বিজ্ঞান দুই মুখে চলেছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে ধর্ম ও বিজ্ঞানে মোটেই মিল নেই। বাইবেলের মত—ঈশ্বর ৬ দিনে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, বিজ্ঞান বলছে—পৃথিবীতে জীবনের সূত্রপাত হওয়ার বহু লক্ষ বছর পরে ঘটেছে মানুষের আবির্ভাব। বাইবেল মতে—

আদম-ইভ প্রথম পুরুষ-নারী ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, তাদের থেকে এই মনুষ্যজাতি এসেছে। আর বিজ্ঞান বলছে,—ক্রমবিবর্তনে বানর হয়ে মানব সৃষ্টি। ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিজ্ঞান ও ধর্মের মিলের অভাবটা খুব তীব্র নয়।

গীতা ও চণ্ডীর মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। গীতার শ্লোক সংখ্যা ৭০০, ইহাদের মন্ত্র বলা হয়েছে (ওঁ অস্য শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতামালা মন্ত্রস্য)। সপ্তশতী চণ্ডীতেও মন্ত্র সংখ্যা ৭০০ ; নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ—এখানে মন্ত্র তিনটি ধরা হয়েছে।

গীতা ও চণ্ডীর মুখ্য শ্রোতারা সমস্যাপ্রপীড়িত, দুঃখভারাক্রান্ত ও বিষাদিত। কুরুক্ষেত্র মহাসমর, উভয় পক্ষের সৈন্যরা প্রস্তুত। পাণ্ডব পক্ষের প্রধান বীর অর্জুন সারথি কৃষ্ণকে বল্লেন, রথখানা উভয় সেনার মধ্যে নিয়ে চল, দেখি ধৃতরাষ্ট্রের কোন্ কোন্ পুত্র দুর্বুদ্ধি চালিত হয়ে যুদ্ধ করতে এসেছে। কথা বীরত্বব্যঞ্জক ও অহঙ্কারপূর্ণ। যোদ্ধাদের দেখে অর্জুন বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন, মনে হয় পিতামহ, গুরু, আত্মীয়স্বজন বধ করে রাজ্য ভোগ করা অনুচিত। যুদ্ধের পরিণাম চিন্তা করে তাঁর শরীর কাঁপতে লাগল, গাণ্ডীব হাত থেকে খসে পড়ল, অত্যন্ত শোকবিহ্বল হয়ে যুদ্ধ করব না বলে বসে পড়লেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিযোগের কথা শুনিয়ে কর্তব্যের পথে চালিত করলেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে অর্জুনের কর্তব্য যুদ্ধ করা। গীতার শ্রোতা কেবলমাত্র অর্জুন।

চণ্ডীর শ্রোতা দুইজন, সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য। রাজা নিজ সৈন্য ও সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকথায় শত্রু হস্তে পরাজিত হয়ে বনে এসেছেন। বনে এসে এখন যে প্রজারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাদের অমঙ্গল চিন্তায় উদ্বিগ্ন ও বিষাদগ্রস্ত তিনি। এখানেই দেখা সমাধি বৈশ্যের সঙ্গে। সমাধি যৌবনকালে বহু অর্থ রোজগার করেছেন, তখন সংসারে তাঁর যথেষ্ট সমাদর ও যত্ন ছিল। এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, সংসারের চোখে বোঝাস্বরূপ। স্ত্রী-পুত্রেরা সব ধনসম্পদ হস্তগত করে গৃহ হতে তাকে বিতাড়িত করেছে। দুঃখিত

অন্তঃকরণে বনে এসেছেন। নিজের জন্য দুঃখ নয়, দুঃখ, তার স্ত্রী-পুত্রদের অমঙ্গলচিন্তায়। সমাধির এই মনের গতি লক্ষ্য করে রাজা বিস্মিত হলেন। তারপর নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বুঝলেন তার চিত্তবৃত্তির একই প্রকার বিভ্রান্তি। তিনিও চিন্তা করেছেন বিশ্বাসঘাতক প্রজাদের জন্য। এই বনেই শান্তরসাস্পদ মেধস ঋষির আশ্রম। ঋষির নিকট জানতে চাইলেন উভয়ের এই অদ্ভুত চিত্তবৃত্তির কারণ। কেন বিষয়ের দোষ দেখা সত্ত্বেও চিত্ত আকৃষ্ট হয় (দৃষ্টে দোষোঽপি বিষয়ে মমতাকৃষ্ট মানসঃ) ? ঋষি বল্লেন,—মহামায়ার মায়াই ইহার কারণ। ঋষি তাদের নিকট তত্ত্ব ব্যক্ত করে বল্লেন,—এই মহাশক্তির আরাধনা কর। তাঁর কৃপায় মায়া অপসারিত হলে স্ব-স্বরূপে স্থিত হবে, সকল দুঃখের চিরতরে হবে অবসান।

গীতায় অর্জুনের মুখেও আমরা শুনি অনুরূপ একটি প্রশ্ন,—অনিচ্ছাসত্ত্বেও কে যেন বলপূর্বক আমাদের পাপে নিয়োজিত করে ?

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩/৩৬

উত্তরে শ্রীভগবান বল্লেন,—রজোগুণজাত কাম ও ক্রোধ ইহার কারণ। ঈশ্বর-তত্ত্বের উপলব্ধি হলেই উহা দূরীভূত হয়। আর্যঋষির দৃষ্টিভঙ্গি এই জীবনে যে সমস্যাই আসুক না কেন, ঈশ্বর-তত্ত্বেই তার সমাধান মিলবে।

গীতা ও চণ্ডী উভয় ক্ষেত্রেই যুদ্ধের পরিবেশ। গীতার যুদ্ধ প্রকৃতই যুদ্ধ, অস্ত্র-শস্ত্র হাতি ঘোড়া নিয়ে দুই বিরুদ্ধ পক্ষের যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। চণ্ডীতেও যুদ্ধের বর্ণনা, তবে ইহা মানস রাজ্যের যুদ্ধ। উভয় ক্ষেত্রেই যুদ্ধের মূল মনে। মনের অমিল, মন নিজের বশীভূত নয়, ইহাই যুদ্ধের কারণ। যুদ্ধে শত্রু জয় করতে হবে, সাধন ক্ষেত্রে মনের কুটিল বৃত্তিগুলিকে জয় করতে হবে।

গীতায় হাতি ঘোড়া, সৈন্য সামন্ত, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি ও কোলাহলের মধ্যে শ্রীভগবানের পরম গম্ভীর অথচ শান্তরসাশ্রিত

আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ। চণ্ডীতে মুনিবরের শান্তরসাশ্রিত তপোবনে যুদ্ধের সংবাদের মধ্যে মহামায়ার তত্ত্ব উদঘাটিত।

বিজ্ঞান বর্তমানে প্রভূত উন্নতি সাধন করলেও, তন্ত্রাচার্যগণের অনেক অবদান, যেমন সূক্ষ্ম দেহে ইড়া-পিঙ্গলা, আজ্ঞাচক্র প্রভৃতির নিকটবর্তী হতে পারেনি। সুশ্রুতের দেহতত্ত্ব, গ্লাণ্ড (gland) প্রভৃতির যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তা বর্তমান বিজ্ঞানেরও বিস্ময়কর। প্রাচীন আয়ুর্বেদাচার্যগণ সোনা, পারা (mercury) প্রভৃতি ঔষধের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতেন (যেমন স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ), এই বিস্ময়কর দান তন্ত্রের। চণ্ডী ঠিক বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের দর্শন (Philosophy of science) বলা যায়। দর্শনের দৃষ্টি, বস্তুকে সামগ্রিক ভাবে (Synthetic) দেখা। বিজ্ঞানের দৃষ্টি, বস্তুকে বিশ্লেষণ করে দেখা (analytic)। বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর ঈশ্বর অনুসন্ধানের চেষ্টা। পাশ্চাত্যেও কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু তেমন ফলবতী হয় নি।

বৈজ্ঞানিকের সত্য universal truth, সবাই তা দেখতে পারে। কিন্তু দর্শনের সত্য ব্যক্তিগত উপলব্ধিপ্রসূত, একান্ত Personal, সেজন্য বিরুদ্ধবাদীর নিকট প্রমাণ করা কঠিন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া এই বস্তুতান্ত্রিক যুগে কেহই কিছু মানতে রাজি নয়। সাধারণে না মানলেও, সত্য বলে গ্রহণ না করলেও, সাধকের জীবনে উহা পরম সত্য। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর জিজ্ঞাসা করেন,—আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন,—তোকে যেমন দেখছি, সেইরকম প্রত্যক্ষ দেখছি, তোর সঙ্গে যেমন কথা বলছি, শ্রীভগবানের সঙ্গে সেইরকম কথা বলি। উচ্চকোটির সাধকের অনুভবে দর্শনের সত্য অতি প্রত্যক্ষ।

তন্ত্রের বড় দান শক্তিবাদ। ইহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। তন্ত্র যা বলেছেন তা কারও না মেনে উপায় নেই। যদি কেউ বলেন 'মানি না', তা বলতেও শক্তির প্রয়োজন। সুতরাং শক্তি

আছেই। তন্ত্র বলছেন,—শক্তিই আছে, বিশ্বজগতে শক্তি ছাড়া আর কিছু নেই। পরমাণবিক অস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায়, পরমাণুর (Atom) কি শক্তি তা সকলে দেখতে পাচ্ছি। প্রতিটি বস্তুই কতকগুলি শক্তির সমষ্টি—ইহা আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। এখন এমন বস্তু নেই যাতে শক্তি নেই। তন্ত্রে পাই ইহার সমর্থন—"যা দেবী সর্বভূতেযু শক্তিরূপেন সংস্থিতা।"

বিজ্ঞান পূর্বে heat, sound, electricity প্রভৃতি কয়েকটি শক্তি স্বীকার করত। এখন বিশ্বে একটাই শক্তি আছে বলে মানে, তা Electromagnetic energy। বহু সহস্র বছর পূর্বে তন্ত্র একটা শক্তির কথাই বলেছে। আদি পিতা শিব ইহার বক্তা, আদি মাতা পার্বতী শ্রোতা। অনাদিকাল হতে এই সত্য আছে। সত্যকে তৈরী করা যায় না, যখন প্রকাশ পায় তখন মেনে নিতে হয়। বিজ্ঞান আজ একটাই শক্তি মানে, কিন্তু উহাকে জড় মনে করে, মর্য্যাদা দেয় না। তন্ত্র মতে শক্তি জড় নয়, চৈতন্যময়ী এবং সকলের পূজার যোগ্য। শক্তির মধ্যে চেতনা আছে। চেতনা মর্য্যাদা দাবি রাখে। হিমালয় পর্বতের উপর হেঁটে যেতে কোন সংকোচ হয় না, কিন্তু একটা পিপীলিকাকে মাড়িয়ে যেতে সংকোচ হয়, কারণ তার মধ্যে চেতনা আছে। চেতনাকে দখল (control) করা বা খেয়াল খুশীমত ব্যবহার (utilise) করা, সে বরদাস্ত করে না। চেতনার মধ্যে স্বাধীনতা আছে। আপনার চেতন-সত্তাকে কেউ control বা অধীন করার চেষ্টা করলে, আপনি তা মেনে নেবেন না, আপনার মন বিদ্রোহী হবে।

বৈজ্ঞানিক James Jeans মনে করেন, বিশ্বের মূলে যে শক্তি, তার মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রের (mathematical) জ্ঞান আছে। অঙ্কে বুদ্ধির প্রয়োজন, চেতনা না থাকলে বুদ্ধি থাকতে পারে না। তিনি মন্তব্য করেছেন, যদি একটা বাঁদরকে টাইপ রাইটার (Type writer) মেশিনে টাইপ করতে দেওয়া হয় অনবরত টাইপ করতে করতে একটা সেক্সপীয়ারের সনেট সে তৈরী করতে পারে, কিন্তু

অঙ্ক শাস্ত্রের জ্ঞান ছাড়া এই বিশ্ব চালান সম্ভব নয়। অঙ্কের জ্ঞান স্বীকার করলে চেতনাও স্বীকার করতে হয়। চণ্ডী বলেছেন,—মহাশক্তি সর্বভূতে চৈতন্যরূপে আছেন (যা দেবী সর্বভুতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে)।

এই শক্তির মধ্যে স্নেহ, ভালবাসা, করুণা আছে কি? বিজ্ঞান তা বলতে পারে না। তন্ত্রশাস্ত্র বলেছেন,—অপার করুণা আছে। ঐ করুণা মাতৃবৎ। 'যা দেবী সর্বভুতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা'। তন্ত্রের ইহা বিরাট দান। এই মাতৃত্ব সর্বভূতে আছে। পরম স্নেহে যেন ধরে রেখেছেন। গাছপালা, লতাগুল্ম সকলকে পৃথিবী মায়ের মত ধরে আঁকড়ে রেখেছে। গ্রহগুলি সূর্য হতে বেরিয়ে, সূর্যের কক্ষপথেই ঘুরছে। দূরে ছিটকে যায় নি, কারণ সূর্যের প্রেমের আকর্ষণে সব বাঁধা। আমাদের এই সূর্যও অপর কোন বৃহত্তর সূর্যের টানে স্বীয় কক্ষপথে ঘুরছে। সর্বত্রই স্নেহ আছে, বাঘ-সিংহের মধ্যে, তা অনুভব করে তাদের বাচ্চারা। বিশ্বময় এই মাতৃত্ব মাতৃরূপে সংস্থিতা। গীতায় 'বাসুদেব সর্বং' এর অনুরূপ। হাজারের মধ্যে (মনুষ্যানাং সহস্রেষু) ক্বচিৎ একজন তা জানতে পারে।

বেদ যাঁকে ব্রহ্ম বলেছেন তিনিই মহাশক্তি। শক্তিই ব্রহ্ম, ব্রহ্মের শক্তি নয়। বেদ বলেন, শক্তিমান যিনি. ব্রহ্ম যিনি, তিনিই আসল, তাঁরই শক্তি। চণ্ডী বলেন, আগে শক্তি তারপর শক্তিমান। মতুপ্ প্রত্যয় করে শক্তিমান, যেমন ধন এলে ধনবান, শক্তি এলেই শক্তিমান, শক্তিই আসল। বস্তুতঃ উভয়ে কোন ভেদ নেই। ব্রহ্মের উপস্থিতি আমরা বুঝতে বা অনুভব করতে পারি না, শক্তি সকলেরই অনুভবের বস্তু। শক্তির ক্রিয়ায় জগৎ আজ ধ্বংসের মুখে।

পাশ্চাত্যে শক্তিকে জড় মনে করে। এজন্য বশ করে কাজে লাগাতে চায়। চণ্ডী বলেন, শক্তিকে পূজা করে তাঁর করুণা লাভ করতে হবে। তাঁকে বশ করতে গেলে, ভোগ করতে গেলে সর্বনাশ হবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। শুম্ভ-নিশুম্ভ মা মহাশক্তিকে বশ করে, ভোগ করতে চেয়েছিল, ধ্বংস হল। রাবণ সব দেবতাদের বশ করে

কাজে লাগিয়েছিল, পরিণামে সবংশে ধ্বংস হল। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (Plato) মনে করেন, আত্‌লান্তিক দেশ মহাসাগরে পরিণত হয়েছে, বৈজ্ঞানিক শক্তির প্রয়োগের দোষে। শক্তিকে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে পূজা করে তাঁর করুণায় সকল সম্পদই লাভ হয়—ইহাই তন্ত্রের দৃষ্টি।

বেদ ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বলেছেন,—'পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং' এবং 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন যাতানি জীবন্তি' ইত্যাদি অর্থাৎ যাহা হতে এই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে, যাতে স্থিত আছে এবং চরমে যাতে লয়প্রাপ্ত হবে, সেই পুরুষই পরব্রহ্ম। বেদান্ত সূত্রে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' মন্ত্রে একই কথা বলা হয়েছে। সৃষ্ট জীব ও জগৎকে দিয়ে সৃষ্টিকর্তার পরিচয় দেওয়া, পুত্রকে দিয়ে পিতার পরিচয় দেওয়ার মত। আমাদের পরিচয়ের বাইরে তাঁর স্বরূপে লক্ষণ বলা কঠিন। চণ্ডীতে মায়ের সম্বন্ধেও একই কথা বলা হয়েছে। তাঁর থেকে সবই উদ্ভূত হয়েছে, তাতেই স্থিত আছে এবং অন্তিমে তাঁতেই লয়প্রাপ্ত হবে।

চণ্ডীর প্রথম চরিতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'মহাকালিকা'। মায়ের এই স্বরূপ হতেই সব সৃষ্টি, এর দ্রষ্টা ঋষি ব্রহ্মা। মধ্যচরিতের দেবী মহালক্ষ্মীতে সব কিছু তাঁহাতে স্থিত আছে এবং উত্তর চরিতের দেবী হচ্ছেন মহাসরস্বতী, অন্তিমে সবই লয়প্রাপ্ত হবে। যেমন, বরফ, জল, বাষ্প জলের তিনটি অবস্থা, সৃষ্টির সেইরূপ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ অবস্থা। কারণ-এ সবই বীজরূপে অবস্থান করে। আরম্ভ, স্থিতি, লয়—একটা বৃত্তের আকারে সৃষ্টিটা ঘুরছে। কোথায় এর আরম্ভ বলা যায় না, যেমন বৃত্তের আরম্ভ বোঝা যায় না। প্রলয়ে সমস্ত সৃষ্টিটা বীজাকারে থাকে। নাশদীয় সূক্তে প্রশ্ন করা হয়েছে, —আদিতে কে ছিল? কিছুই ছিল না। পুনরায় প্রশ্ন,—তখন কি ছিল? বেদ উত্তর দিয়েছেন,—পুরুষ ছিলেন। পূর্ণ চৈতন্যময় পুরুষের কখনও অভাব হয় না, তিনি সর্বকালে বিদ্যমান আছেন। তন্ত্র প্রশ্ন করেছেন,—পুরুষ যখন ছিলেন না, অর্থাৎ থেকেও নেই,

তখন কে ছিলেন? থেকেও নেই—এটা কেমন কথা? যেমন, কর্তা বাড়িতে আছেন, আপনি ডেকে তাঁকে পেলেন না, কারণ তিনি ঘুমিয়ে আছেন, তখন অবস্থা এই যে তিনি থেকেও নেই। পুরুষ ঘুমিয়ে আছেন, বিষ্ণু কারণসমুদ্রে শায়িত, সমস্ত সৃষ্টিটাই ঘুমিয়ে, তখন কে আছেন? কে জেগে আছেন? চণ্ডী বলেছেন,—তখন নিদ্রাদেবী জেগে আছেন এবং ক্রিয়াপরায়ণা। কালরাত্রি, মোহরাত্রি আছেন, আছেন মহাকালিকা। নিদ্রাকালে সুষুপ্তিতে আমরা সকলেই এই মা-এর নিকটে যাই, তাঁর স্পর্শে সঞ্জীবিত হই, অথচ তাঁকে জানতে পারি না। সারাদিন খুব খেটেছেন, ভয়ানক পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত শরীর আর চলছে না। শুয়ে নিদ্রা গেলেন, উঠে দেখলেন সব অবসাদ চলে গেছে। কি করে গেল? নিদ্রায় মা-এর অমৃত স্পর্শ পাই, তাই দূর হয়েছে সব অবসাদ। পুত্রহারা মা গভীরভাবে শোকাচ্ছন্ন, বেদনায় আহার-নিদ্রা ভুলেছেন, শোকের জ্বালার কোন উপশম নেই। যদি কোন উপায়ে ঐ মা ঘুমাতে পারেন, তবে সুষুপ্তিতে মহাকালিকার স্পর্শে জুড়িয়ে যায় সব জ্বালা। রোজ গাঢ় নিদ্রায় তাঁর স্পর্শ পাই, কিন্তু জানতে পারি না। যোগীরা তাঁকে ধরার চেষ্টা করেন। তাঁরা বাইরে ঘুমান, কিন্তু ভেতরে জাগ্রত থাকেন, এই সমাধির অবস্থায় তাঁকে ধরা যায়। খোকা রোজ খেলতে খেলতে বারান্দায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। যখন ঘুম ভাঙ্গে, তখন দেখে সে বিছানায় খাটের উপর। সে বুঝতে পারেনা কে তাকে রোজ বিছানায় নিয়ে আসে। সে স্থির করল, আজ দেখতে হবে, ঘুমের ভাণ করে সে জেগে রইল এবং দেখতে পেল, সব কাজ সেরে মা তাকে কোলে করে পরমাদরে বিছানায় শুইয়ে দিচ্ছেন। গীতায় ভগবান বলেছেন,—'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী'—সকল জীব যেখানে জেগে থাকে সেখানে সাধক নিদ্রিত অর্থাৎ বিষয় ব্যাপারে তারা নিদ্রিতের মত। এটাই সমাধি—বাইরে ঘুম, ভিতরে জাগ্রত। এই অবস্থায় প্রত্যহ নিদ্রায় আমাদের যে প্রলয় অবস্থা, তখন মহাকালিকার নিকট যাই, তাঁর

অমৃত স্পর্শে সঞ্জীবিত হই। ঋষি ব্রহ্মা এর দ্রষ্টা, তাই আমরা জানতে পেরেছি। নারায়ণের নাভি-কমলে ব্রহ্মা, সৃষ্টি হবে। সৃষ্টির স্পন্দন নাভিতে। সব সৃষ্টিই নাভির সঙ্গে যোগে, একটা ছোলা যে অঙ্কুরিত হচ্ছে তার যোগ নাভিতে।

কোথায় আছেন বিশ্বসৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মা, আছেন নারায়ণের নাভিপদ্মে। কেন তিনি, এ ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছেন না। এমন সময় শব্দ হল — তপঃ তপঃ তপঃ। ব্রহ্মা বুঝলেন তাঁকে তপস্যা করতে বলা হল। তপস্যায় উপলব্ধি করলেন সৃষ্টির রহস্য। বিষ্ণুর কর্ণমল হতে দুই অসুর বেরিয়ে ব্রহ্মাকে মারতে উদ্যত হল। শুদ্ধ সত্ত্বে সৃষ্টি হবে না, রজ-তম চাই, রজের বাধা ও তমের আবরণ সৃষ্টি-কার্যে অপরিহার্য। আমরা কথা বলতে পারি বাধার জন্য, শব্দ আসছে নাভি হতে, জিহ্বায় বাধা পেয়ে শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে, না হলে কেবল অ আ, শোনা যেত। সৃষ্টিতে বৈচিত্র্যের জন্য চাই রজ-তম। উহারা ভাল কাজে লাগলে অর্থাৎ সত্ত্বের অধীনে রজ-তম থাকলে তবে সৃষ্টি সুন্দর হবে। সত্ত্বকে খর্ব করলে, সৃষ্টিতে ব্রহ্মা যদি দুর্বল হন তবে উহা অসুন্দর হবে, হেয় হবে। ব্রহ্মা দেখলেন তাঁর প্রাণ সংশয়, এদিকে বিষ্ণু আছেন ঘুমিয়ে। মা মহাশক্তি ঘুমিয়ে রেখেছেন। ব্রহ্মা স্তব করলেন যাতে নিদ্রারূপিনী দেবী সরে যান, বিষ্ণু জাগ্রত হন। ব্রহ্মা দেখলেন মাকে, একটা কাপড়ের মত আবরণ আস্তে আস্তে সরে গেল। বিষ্ণু জাগ্রত হলেন। মধু ও কৈটভ অসুর দুজনের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে তাদের বধ করলেন। বিষ্ণু দেখলেন চারিদিকে জল, তখন উরুর উপর রেখে অসুরদের বধ করেন। তাই তাহাদের মেদে মেদিনী হল।

দ্বিতীয় বা মধ্যম চরিতের দেবী মহালক্ষ্মী। বিশ্বের সকল কিছুই তাঁর মধ্যে স্থিত। যদিও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা নেই, তাত্ত্বিক ধারাবাহিকতা আছে। দেবাসুর সংগ্রাম। এক শত বছর ব্যাপী যুদ্ধ। শত বর্ষ পূর্ণ জীবনের প্রতীক। সারা জীবন ধরেই যুদ্ধ, দেব ও অসুরের, ভাল ও মন্দের, জড় ও চৈতন্যের। কখনও দেবতাদের

জয়, কখনও অসুরের। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা ইন্দ্র। অসুর যদি ইন্দ্র হয়, আসুরিক ভাবনা, আসুরিক কাজকর্ম বৃদ্ধি পাবে, সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, জীবন হবে অশান্তিময়। অসুরেরা এখন বিজয়ী। দেবতারা মরণশীলের ন্যায় দিশেহারা ও দুঃখক্লিষ্ট। দেবতাগণ এলেন ব্রহ্মার নিকট। ব্রহ্মা দেবতাদের ও শিবকে নিয়ে বিষ্ণুর নিকটে গেলেন। দেবতাদের দুঃখের কথা শুনে বিষ্ণু ভয়ঙ্কর ক্রোধান্বিত হলেন। ক্রোধে তাঁর বৈষ্ণবী শক্তি নির্গত হল, বিষ্ণুর সহিত একপ্রাণতায় ব্রহ্মা ও শিব (রুদ্র) মহা কুপিত হলেন, ফলে তাঁদের ব্রাহ্মণী ও রুদ্রাণী শক্তি তাঁদের মধ্যে হতে বেরিয়ে এল। শক্ ধাতু হতে শক্তি। ইন্দ্রের কোপ হওয়ায় তাঁর শক্তি জাগ্রত হল, ইন্দ্রাণী শক্তি বেরিয়ে এল। শক্তি অমূর্ত ছিল, এখন মূর্ত হল। গায়ক যখন গান করে তখন শক্তি মূর্ত হয়, অন্য সময় অমূর্ত থাকে। সব দেবতা-গণের সকল শক্তি বেরিয়ে এসে এক দেহে মিলিত হল। নিখিল দেবতাগণের শক্তিসমূহের মূর্তিই হলেন মা মহালক্ষ্মী। ব্রহ্মা হতে সৃষ্টি, গতি সৃষ্টির প্রতীক। ব্রহ্মার শক্তি মা-এর পা। বিষ্ণুপালন করেন বাহুতে, তাঁর শক্তি মায়ের হস্তে, দশ দিক পালন করেন দশ হস্তে। চন্দ্র হতে ওষধি বাঁচে, তাঁর শক্তি মায়ের স্তনে। নিখিল দেবতাগণকে একস্থানে দেখুন মা মহালক্ষ্মীর মধ্যে। বিশ্বরূপ মায়েকে, আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেখি, এক দেহে দেখি না, তাই আমাদের দর্শন ঠিক হয় না। 'এক'-এর মধ্যে সকলকে দেখাই যথার্থ দর্শন। নিখিল জগতের অভিব্যক্তি (manifestation) মায়ের মধ্যে। দেবতারা দেখলেন (দর্শনে তস্থৌ) আমরাও আছি তাঁর মধ্যে। তিনি কৃপা করে দেখা দিলে তবেই দেখা যায়।

শারদীয়া পূজাকালে আমরা এই মহালক্ষ্মীর পূজা করি। যা কিছু বীজাকারে কারণ-সমুদ্রে ছিল, তা সবই এখন ব্যক্ত মহালক্ষ্মীর মধ্যে। মহাকালিকায় ঘুমিয়ে ছিল, এখন ব্যক্ত হয়েছে, বৈচিত্র্যময় হয়েছে। মায়ের করুণায় এই একত্বের জ্ঞান হলে সাধক মায়ের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। মার তত্ত্ব জানলে, তাঁর শক্তিতেই যে সকলে

শক্তিমান এটা জানলে আর দুঃখ থাকে না। বিশ্বের সকল মানবকেই আপন ভ্রাতা বলে বোধ হয়। দেবতারা ভুলে গিয়েছিল। আজ যখন জানল, মায়ের তত্ত্বের উপলব্ধি হল, তখনই অসুর শক্তির বিনাশ সাধিত হল।

উপনিষদে আছে, এক দিব্যজ্যোতি দর্শন করে ইন্দ্র বায়ুকে পাঠালেন, কে তিনি জানতে বায়ু। এলে ঐ জ্যোতি বল্লেন,—কে আপনি ? আপনার কি কাজ ? বায়ু নিজের পরিচয় দিয়ে বল্লেন, আমি সব উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি। তখন তিনি একটি তৃণ দেখিয়ে বল্লেন, এই তৃণকে উড়িয়ে নিয়ে যান। বায়ু সর্ব শক্তি প্রয়োগ করেও উহা নড়াতে সক্ষম হলেন না। বায়ু ফিরল না দেখে ইন্দ্র অগ্নিকে পাঠালেন। ঐ জ্যোতি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি কে, আপনার কি কাজ ? অগ্নি তাঁর পরিচয় দিয়ে বল্লেন,—আমি সব কিছু পোড়াতে পারি। তখন তিনি একটি তৃণ দেখিয়ে বল্লেন, ইহাকে পোড়ান। অগ্নি সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেও অসমর্থ হলেন। তিনি লজ্জায় আর ফিরে গেলেন না। এইরূপে সব দেবগণ যখন ফিরলেন না, তখন ইন্দ্র নিজে এলেন। যুদ্ধ জয়ে দেবগণের মনে অহঙ্কার জেগেছিল যে তাঁদের শক্তিতেই জয় হয়েছে। সেই জ্যোতিরূপী পরব্রহ্ম ইন্দ্রকে জানালেন,—যুদ্ধে জয় হয়েছে তোমাদের শক্তিতে নয়, মহাশক্তি মা হৈমবতীর কৃপায়। এই জ্ঞানের তাত্ত্বিক উপলব্ধি হলে আসুরিকতা আর থাকে না। সাধন সময়ে সাধকের অন্তরের আসুরিকভাবের উপর জয়লাভ হয়, মায়ের কৃপায় তাঁর তত্ত্বের উপলব্ধি হলে।

অন্তিমে বিশ্বের যা কিছু সব মায়ের যে স্বরূপে গিয়ে লয়প্রাপ্ত হয়, তিনিই মহাসরস্বতী। অসুররাজ শুম্ভ অসুরদের মুখে জানতে পারলেন হিমালয়ের উপরে পরমাসুন্দরী এক রমণী বিরাজ করছেন। তাঁকে ধরে আনতে যে সব অসুর সৈন্য গেল সব ধ্বংস হল। তখন অসুররাজ পাঠালেন রক্তবীজকে। এই অসুরের প্রতি ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়লে তা থেকে তারই মত শক্তিসম্পন্ন অসুর জন্মাবে। মা

ইন্দ্রাণী, বারাহী, নারসিংহী প্রভৃতি অসংখ্য মূর্তি ধরে রক্তবীজকে বধ করলেন। তখন খুব আস্ফালন করে এল নিশুম্ভ, সেও মার হাতে বিনাশপ্রাপ্ত হল। তখন ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে অসুররাজ শুম্ভ এল। অহংকারের প্রতিমূর্তি সে। দেখল, মা বহু মূর্তি নিয়ে যুদ্ধ করছেন। রেগে বল্ল, তোমার শর্ত একা যুদ্ধ করার, তবে এত সব মূর্তি সংগ্রহ করে এনেছ কেন? মা বল্লেন,—রে দুষ্ট। বহু কোথায় দেখছিস, এ সব আমারই বিভূতি। এই সংসারে আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কে আছে, কেউ নেই (একৈবাহং জগতত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা)। এই দেখ্, আমি একাই আছি। অসুরের দৃষ্টির সামনেই সব মূর্তিগুলি মাতৃ অঙ্গে বিলীন হয়ে গেল।

বহু দেখাই আসুরিকতা। মাতৃস্বরূপে এই একত্ব দর্শনে আসুরিকতা ঘুচে যায়। বাইরে যে অসুরবধ তা আনুষঙ্গিক ক্রিয়া মাত্র। মায়ের কৃপায় অসুর দর্শন করল তাঁর স্বরূপ। তার আসুরিকতা ঘুচে গেল চিরতরে। একই মায়ের তিনটি স্বরূপ—মহাকালিকা হতে সব সৃষ্টি, মহালক্ষ্মীতে সকলের স্থিতি এবং মহাসরস্বতীতে সকলের বিলয়প্রাপ্তি। যেমন আমরা দেখি হিমালয়ে বরফ, গলে জল হয়ে বহু নদনদীর বৈচিত্র্যময় গতি এবং শেষে মহাসাগরে গিয়ে সকলের বিলয়প্রাপ্তি।

বেদে যিনি ব্রহ্ম, তন্ত্রে তিনিই মা মহাশক্তি। বেদ ও তন্ত্রের ধারায় কোন বিরোধ নেই। বেদের মধ্যে দেবী সূক্ত, আবার চণ্ডী-পাঠের আগে বেদের মন্ত্র পাঠের বিধি। চণ্ডীতে আছে,—"নন্দগোপ-গৃহং জাতা যশোদা গর্ভসম্ভবা," পরমপুরুষ নন্দগোপের গৃহে যশোদার গর্ভে জন্মাবেন। গোপীগণ কাত্যায়নী ব্রত করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাবার জন্য। যিনি দুর্গা, তিনি কাত্যায়নী, তিনিই যোগমায়া। একই স্বরূপ বহু নামে বহুরূপে প্রকটিত হয়ে ভক্তগণকে কৃপা করছেন।

গীতার সঙ্গে একটা তফাৎ দেখা যায়,—গীতার মুখ্য শ্রোতা একজন, চণ্ডীর দুইজন (সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য)। দুইজন

শ্রোতা কেন, তা গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে এলেই বোঝা যায়। ঋষির উপদেশে উভয়ে একই সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। উভয়ের প্রতি কৃপা করে মা দেখা দিলেন, তাদের সাধনায় তুষ্ট দেবী বর দিতে চাইলেন। দুজনে চাইলেন দু রকমের বর, রাজা চাইলেন নিষ্কণ্টক রাজ্য। আর সমাধি বৈশ্য চাইল,—অহং-মমত্বের নাশ ও মোক্ষ। উভয়ের প্রার্থনা মা পূর্ণ করলেন। মা আমাদের—'সুখদা মোক্ষদা দেবী বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনী', ভক্তকে তিনি ভোগসুখ সমৃদ্ধ রাজ্যও দেন, আবার মোক্ষকামীকে মুক্তি দেন এবং যিনি শ্রীবিষ্ণুপদে ভক্তি কামনা করেন, তাঁকে তাই দেন। তিনি মহামায়া রূপে জীবকে সংসারে বন্ধন করেন। যোগমায়া রূপে ভগবানকে আবরণ করে ঐশ্বর্য সব ঢাকেন এবং মাধুর্য প্রকট করে নির্মল প্রেমের পথিক যেসব ভক্ত তাঁদের সঙ্গে ভগবানের প্রেমের লীলা করান। ব্রজে বাৎসল্য রসের ভক্ত মায়েদের সঙ্গে বাৎসল্য রস, সখাদের সঙ্গে সখ্যরস এবং গোপিকাগণের সঙ্গে মধুর রসের লীলা করেন।

সকলে মায়ের নিকট প্রার্থনা করেন—'রূপং দেহি জয়ং দেহি' ইত্যাদি। সাধারণ মানুষ চায় সুন্দর রূপ; কিন্তু সাধক-ভক্ত 'রূপ' বলতে আপন স্বরূপ, কৃষ্ণদাসত্ব প্রার্থনা করেন। সাধারণ মানুষ সংসার যাত্রার বাধা-বিপত্তির ক্ষেত্রে জয়যুক্ত হতে চায়, সাধক প্রার্থনা করেন সাধনার ক্ষেত্রে যেন জয়যুক্ত হন। একই প্রার্থনার মধ্যে ভক্তের অন্তরের ঈপ্সিত বস্তু মা দান করেন।

সকল জীবকে চণ্ডী বলছেন,—জীব! তুমি কেন দুর্বল, দুঃখী হয়ে আছ? মহাশক্তির পূজা কর, তোমার সকল অভাব দূরে যাবে।

পূজার শাস্ত্রসম্মত ক্রম কিরূপ তাহা বলিতেছি। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের নাম মহালয়। তার শেষ অমাবস্যার নাম মহালয়া। পূর্ব্বপক্ষঃ দেবানাম্ অপরপক্ষ পিতৃনাম্। মহালয়া অমাবস্যাতে যে কৃষ্ণপক্ষঃ শেষ হয় তাহার নাম অপর পক্ষ বা পিতৃপক্ষ। পরদিন হইতে আরম্ভ হয় পূর্বপক্ষ বা দেবীপক্ষ। পিতৃপক্ষে পরলোকস্থ পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে বিশেষ তর্পণ কর, অমাবস্যায় পার্বণ শ্রাদ্ধ

কর। পিতৃগণকে স্মরণ করিতে আব্রহ্মভুবনাল্লোকতুল্য বিশ্বের সকলের তৃপ্তি কামনা করিয়া প্রাণটা উদার কর। শ্রাদ্ধান্তে উপনিষদের একটি মহামন্ত্র স্মরণ কর।

"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীনঃ সন্তোষধীঃ
মধু নক্ত মুতোষসো মধুমৎপার্থিবংরজঃ মধু দ্যৌ বস্তু নঃ পিতা
মধুমান্নো বনস্পতি মধুমানস্তু সূর্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ"

এই মন্ত্রের উচ্চারণে ভাবনায় তোমরা বিশ্বের প্রতি ধূলিকণা মধুময় দর্শন কর। পিতৃপক্ষের পর দেবী পূজার জন্য প্রস্তুত হও। পিতৃপূজায় মধুময় হইয়া দেবীপদাশ্রয় গ্রহণে অগ্রসর হও।

প্রতিপদে মাতৃপূজার জন্য জাগ্রত হও। ষষ্ঠীর বোধনে উদ্বুদ্ধ হও। সপ্তমী অষ্টমী নবমী মহাকালিকা মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতীকে দর্শন কর।

প্রসঙ্গতঃ গত শতাব্দীর বাঙ্গালীর সাধনমনীষার দৃষ্টিকোণ হইতে একটু বলি—দেশমাতৃকার সঙ্গে মাকে একাকার করিয়া দেখ। মহামনা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মন্ত্র—মাতরং নমামি ভগবতীং সতীদেহরূপাং। মাতরং নমামি বসুধাতল পুণ্যতীর্থাং মাতরং নমামি পদযুগ্ম ধৃতসমুদ্রাং। মাতরং নমামি হিমগিরিকিরীট ভূষাম্॥

বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি—সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মন দিয়া দেখি—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম্য—
ত্বং হি প্রাণাং শরীরে। বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি তোমার প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের বিশাল চক্ষু দ্বারা দেখি—

ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে
তোমায় দুয়ার আজি খুলে সোনার মন্দিরে॥
কে কাঁদে ক্ষুধায় জননী সুধায় আয় তোরা সবে ছুটিয়া
ভাণ্ডার দ্বার খুলেছে জননী, অন্ন যেতেছে লুটিয়া॥

তিন দিন ধরিয়া দিবারাত্র মাকে দেখ। মাকে শক্তিরূপে বিশ্বমাতারূপে, ভারতমাতারূপে, বঙ্গমাতারূপে, আমার গর্ভধারিণী মাতার সঙ্গে বিশ্বের সকল মাতাকে পশুপক্ষীর মাতাকেও একাকার করিয়া দেখ। মন্ত্র বল—যা দেবী সর্ব ভূতেষু মাতৃ রূপেন সংস্থিতা।

তিন দিন পর মায়ের বিদায়। ঘরের কন্যা যেন শ্বশুরালয় যায়, তেমনি ভাবে ঘরের জননীরা কাঁদে অশ্রুজলে ভাসিয়া। মায়ের বিদায় হইল। বিসর্জ্জন হইল কোথায়? নদীর জলে নয়—আমার তোমার সকলের হৃদয় দর্পণে। চিত্তপটে, গভীর ভাবে অঙ্কন করিয়া লইলাম মায়ের বিশ্বজনীন জননীস্বরূপকে বিশ্বের জাগ্রত মাতৃত্বকে। এই চিত্ত দর্পণে মায়ের মাতৃত্বের প্রতিমা অঙ্কনে কতখানি কৃতকার্য হইলাম—তাহার পরীক্ষা পরদিন সকাল হতে, যাকে সম্মুখে দেখি তাকেই এস ভাই বলিয়া বুকে টানিয়া আলিঙ্গন করি। বিজয়ার এই কপটতাশূন্য ব্যাপক আলিঙ্গনকে যদি সারা জীবন ধরিয়া স্থায়ী করিয়া লইতে পার—তবেই সার্থক। সকল মঙ্গলের বিধানকারিণীকে যিনি হৃদয়ে পাইয়াছেন—তার কি আর সম্ভব বিশ্বের কাহারো অমঙ্গল ভাবনা করিতে? কেহ যদি কাহারও অমঙ্গল চিন্তা হৃদয়ে স্থান না দেয় - তবে কি হয়?

বিশ্বং পূর্ণ সুখায়তে ॥

——

গ্রে ষ্ট্রীট

ভাগবত সমাজ

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৬১

ভাগবত ধর্ম

ভাগবত ধর্ম বিশেষ এক ধর্মভাবের প্রবাহ। এই ধারা অতি প্রাচীন, অনাদিকাল হতেই আছে। দ্বাপর যুগের শেষে কলির শুরুতে এই ধারা এক চরমরূপ পরিগ্রহ করে। তখন প্রকাশিত হন শ্রীমদ্ভাগবতম্ গ্রন্থ। এই ধারার যাঁরা ধারক-বাহক তাঁরা ভাগবত বলে উক্ত হন। আমরা কথায় বলি তিনি পরম 'ভাগবত' অর্থাৎ পরম ভক্ত। এই ভাবধারার প্রাচীন নাম 'সাত্বত'। মাতার পুত্রের প্রতি যে গভীর স্নেহ, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যে অকৃত্রিম ভাব-ভালবাসা, স্ত্রীর স্বামীর প্রতি বা যুবতীর যুবকের প্রতি যে আকর্ষণ শ্রীভগবানে উহা অর্পিত হ'লে, শ্রীভগবান যদি ঐ স্নেহ-ভালবাসা—প্রেমের বিষয় হন, তবে উহা ভাগবত ধর্ম। এর যতটুকু যে ধর্মের মধ্যে দেখতে পাই, বুঝতে হবে তাহা ভাগবত ধর্ম হতে প্রাপ্ত।

শ্রীগৌরাঙ্গ—নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের আবির্ভাবে এই ঘোরকলি-যুগে ভাগবত ধর্ম খুব উজ্জ্বল হয়েছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী উভয়ের প্রসঙ্গে বলেছেন,—

দুইভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥

গ্রন্থ ভাগবতে যে প্রেমরস মাধুর্য বর্ণিত আছে, উহা আপনার লীলাময় জীবনে মূর্ত ক'রে সকলকে আস্বাদন করিয়েছেন মহাপ্রভু। ভাগবত ধর্মের সত্যতা প্রত্যক্ষ করেছে সকলে মহাপ্রভুর মধ্যে। অহৈতুকী শুদ্ধাভক্তি মার্গের পথিক সব মহাপ্রভুর পরিকর, জীবনের প্রতিটি ক্ষণই যাঁরা ভজনে ডুবেছিলেন, সেই পরমভাগবতদেরও দর্শন করিয়েছেন জগৎবাসীকে।

আমাদের সনাতন ধর্মের যা কিছু সবই প্রায় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের দান। তিনি বেদবিভাগ করেছেন, পুরাণ সকল, বেদান্ত দর্শন বা ব্রহ্মসূত্র করেছেন। মহাভারতের অন্তর্গত গীতার পর তাঁর মনে হয়েছিল, ধর্মশাস্ত্র সবই করা হয়েছে, আর কোন কাজ তাঁর বাকি নেই। কিন্তু সকল কাজ সুসম্পন্ন হলে চিত্তে যে শান্তি বা প্রসন্নতার উদয় হয়, মহর্ষির হৃদয়ে তা তো হচ্ছে না; চিত্তের অপ্রসন্নতার কারণও তিনি বুঝতে পারছেন না। তখন হঠাৎ একদিন নারদ ঠাকুর হিমালয়ের পাদদেশে বদরিকাশ্রমে মহর্ষির আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। গুরু করুণার মূর্তবিগ্রহ দেবর্ষির নিকট জানালেন তাঁর চিত্তের অপ্রসন্নতার কারণ। নারদ ঠাকুর বল্লেন,—শ্রীকৃষ্ণের অমল পরম পবিত্র লীলাকথা কীর্ত্তন করা হয়নি। মহাভারত-গীতার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে তাঁর কথা বলা হয়েছে, এখন দিব্য অপ্রাকৃত মাধুর্যময় লীলাকথা, বিশেষ করে ব্রজলীলার কথা বর্ণনা করতে হবে, তবেই দূর হবে সকল অস্বস্তি। ব্যাসদেব বল্লেন,—তাঁর কথা তো কিছুই জানি না, কি করে বর্ণনা করব। তখন কৃপা করে নারদ ঠাকুর চতুঃশ্লোকী ভাগবত ও বাসুদেব মন্ত্র প্রদান করে বল্লেন,—এই মন্ত্র জপ কর ও ভাগবত ধ্যান কর, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁর সকল লীলা স্ফুরিত হবে। সাধনান্তে শ্রীভগবৎ করুণায় ব্যাসদেব লাভ করলেন ভাগবত। উহা প্রচারের জন্য সাধন করে পেলেন জীবনমুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুত্র শ্রীশুকদেবকে। শুকদেব ভাগবত পেয়ে ভাগবতময় হলেন।

ব্রহ্মশাপগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিৎ। সাত দিন অন্তে তক্ষকের দংশনে মৃত্যু। সময় কিছু অতিবাহিত হয়েছে, সাত দিনও নেই। রাজ্য ত্যাগ করে গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশন করছেন। পরমভক্ত রাজার প্রতি সহানুভূতিতে বহু মুনি, ঋষি সেখানে সমবেত হয়েছেন। উৎকণ্ঠিত রাজা, এই অল্প সময়ে কি উপায়ে, কে দেবে তাঁকে যথার্থ পথের নির্দেশ, যাতে মহতের অবমাননা জনিত ব্যর্থ তাঁর জীবন শ্রীকৃষ্ণ চরণপদ্ম লাভে সার্থক হবে।

জ্যোতিষীর গণনায় শ্রীকৃষ্ণের লীলা চলা কালেই কলি এসেছে। কিন্তু ধরার ধূলায় শ্রীকৃষ্ণ পাদস্পর্শ থাকায় নামতে পারছে না, শূন্য দেশে বিদ্যমান রয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এসেছে, চারিদিকে কলুষ প্রভাব বিস্তার করেছে, সেই প্রভাবেই রাজা পরম-ধার্মিক হয়েও মহতের অবমাননা করে ফেলেছেন। মাতৃগর্ভে থাকা কালে শ্রীকৃষ্ণ গর্ভে প্রবেশ করে তাঁকে রক্ষা করেছেন। তিনি ভাবছেন নিজেকে বংশের কুলাঙ্গার। মহতের অবমাননা অপরাধ হতে কে আজ তাঁকে রক্ষা করবে। শ্রীকৃষ্ণচরণলাভে কে তাঁকে দেবে পথের নির্দেশ।

এমন সময় সূর্য্যসম জ্যোতির্ম্ময়-কলেবর শ্রীশুকদেব সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি বল্লেন, রাজন্! কলিতে ভাগবত ধর্মই শ্রেষ্ঠতম উপায়। আপনি ভাগবত শ্রবণ করুন। অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ চরণ লাভ করে আপনি সাতদিন অন্তে দিব্যধামে গমন করবেন। সেই সভায় রোমহর্ষণ পুত্র সুতমুনি ছিলেন। শ্রীশুকদেবের শিষ্য তিনি। তিনিও সাত দিন সাত রাত্র শ্রবণ করেছেন এবং গুরুকৃপায় সবই, প্রতিটি শ্লোক যখন যেভাবে গুরুদেব বলেছেন, সবই স্মরণ রাখতে সমর্থ হয়েছেন।

কিছুকাল পর। ঋষিরা দেখলেন কলির কলুষ অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে যাচ্ছেঃ চরম দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে মানুষের জীবনে। নৈমিষারণ্যে সমবেত হয়ে এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। প্রধান প্রশ্ন, কিসে মানুষের কল্যাণ হবে? এতদিন শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। এখন কলির অন্ধকারে কে আলো দেবে? ধর্ম কি করে রক্ষিত হবে? ঋষি শৌনক এই যজ্ঞের প্রধান ব্যবস্থাপক। সুতমুনিকে আসতে দেখে পরম আনন্দে তিনি তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। ঋষিদের প্রশ্নে সুতমুনি বল্লেন,—শ্রীকৃষ্ণতুল্য পুরাণ-সূর্য ভাগবত উদিত হয়েছেন। এই ঘোর কলিতে ভাগবতই পথ দেখাবে। মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় শ্রীগুরুমুখে যা শুনেছি সবই স্মরণ আছে। আপনাদের সব সমস্যার সমাধান সেই ভাগবত কথাই

বলব। উহাই শ্রীমদ্ভাগবতম্ শাস্ত্রগ্রন্থ। যেখানে নিজের কথা সেখানে 'সূতোবাচ' বলে উল্লেখ আছে। ভারতীয় ধর্ম—সংস্কৃতিতে অসীম মর্যাদার স্থান পেয়েছে। শাস্ত্র পাঠ বল্লে শ্রীভাগবত পাঠ বুঝায়। লক্ষ লক্ষ লোককে এতকাল আকর্ষণ করেছে। গ্রন্থে কি আছে জানলেই মানুষের কল্যাণ।

মহাপ্রভুর পরিকর সনাতন গোস্বামী ভাগবতকে 'শ্রীকৃষ্ণ পরিবর্তিত', বলে উল্লেখ করেছেন। লীলাপুরুষোত্তমই এখন শব্দ-ব্রহ্ম রূপে আছেন। শ্রীভাগবতকে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ দেহ রূপে ভাবা হয় এবং একই মন্ত্রে পূজিত হন। ভাগবতে ১৮০০০ শ্লোক আছে। দ্বাদশটি স্কন্ধে বিভক্ত—প্রথম দুই স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের দুই চরণ, তৃতীয় ও চতুর্থ দুই উরুদেশ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দুই পার্শ্বদেশ, সপ্তম-অষ্টম দুই বাহু, নবম হৃদয়, দশমে শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মের মধুর হাসি, একাদশ কপাল ও দ্বাদশ মস্তক।

শ্রীভাগবত ধর্মের সার কথা—হৃদয়ের নির্মল বিশুদ্ধ ভালবাসা, যে ভালবাসার মধ্যে কোন আকাঙ্ক্ষা, অভিপ্রায় বা আত্মসুখানুসন্ধান নেই, তাহাই শ্রীভগবান লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। এই সংবাদ এতই মূল্যবান এবং ভুলে গেলে জীবের যে চরম সর্বনাশ, তাতে ভগবান নিজেই চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং উহা জানাবার জন্য নিজেই আবার আসেন, যেমন এসেছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, প্রভু জগদ্বন্ধু। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলেছেন—"ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত সার কর অবিরত।"

শ্রীভাগবতের পরিচয় প্রদান জীবের পক্ষে সম্ভব নয়, এজন্য নিজেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম শ্লোকে, প্রণাম করেছেন—পরম সত্যকে, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাঁহা হতে, সেই সত্যস্বরূপ ভগবানকে ধ্যান করি (সত্যং পরং ধীমহি)। দ্বিতীয় শ্লোকে বস্তু নির্দেশ করেছেন, কি বস্তুর বর্ণনা করবেন—'বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়—উন্মুলনম্'—যাহা পরমমঙ্গলকর, ত্রিতাপ জ্বালা বিনাশক, যাঁহা শ্রবণ ইচ্ছামাত্র ভগবান তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন, সেই বাস্তব বস্তুর কথা বলা হবে। এই বিশ্বের কিছুই বাস্তব নয়, স্থায়ী

নয়। যিনি অনাদিকাল হতে আছেন এবং অনন্তকাল থাকবেন, তিনিই একমাত্র বাস্তব বস্তু, তাঁর কথাই শ্রীভাগবতের প্রতিপাদ্য।

তৃতীয় শ্লোকে ভাগবত নিজের পরিচয় দিয়েছেন,—'নিগমকল্প-তরোর্গলিতং ফলম্' অর্থাৎ বেদ কল্প-বৃক্ষের গলে-পড়া ফল। গাছের ফল আমরা দুই প্রকারে পেতে পারি,—এক, গাছে উঠে বা আকর্ষি দিয়ে পাড়া অর্থাৎ চেষ্টা করে পাওয়া। আর, গাছ থেকে ফল পেকে পড়ে গেল, গাছের দান। প্রথমটি চেষ্টালব্ধ, দ্বিতীয়টি করুণালব্ধ। গাছ থেকে যে ফলটি পেকে পড়েছে, সেই সুপক্ক ফলটিই বৃক্ষের ঠিক পরিচয় দেয়। চেষ্টা করে যা পাওয়া ফল, একটু কাঁচা থাকে, তাই ঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না ঐ ফলে। সত্য বস্তুকে, পরমতত্ত্বকে চেষ্টার দ্বারা পাওয়া যায় না, তাঁর কৃপাতেই পাওয়া সম্ভব (যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ)। আমাদের সকল শাস্ত্রই মুনিঋষিদের সাধন লব্ধ, চেষ্টা লব্ধ। ভাগবত কেবল করুণালব্ধ। সেই ভাগবত ভক্ত শ্রীশুকদেবের মুখ হতে যখন তাঁর অনুভূতি-মণ্ডিত হয়ে এল, তখন তা অমৃতময় হল। অন্য শাস্ত্র অপেক্ষা তাই তাঁর উৎকর্ষ বেশী। এই পরম সম্পদ কৃপা ছাড়া চেষ্টায় লভ্য নয় (নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন)। করুণা ছাড়া পাবার কোন উপায়ই নাই।

ভাগবতের মূল বক্তব্য বা বার্তা কি? অন্যান্য সকল শাস্ত্রের বিষয়বস্তু ভাগবতে আছে, তাছাড়া ইঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে। জাতি হিসাবে আমাদের বাঁচতে হলে ঐ পুরাণ ঐতিহ্য, শাস্ত্রের সংবাদ জানতে হবে। অতীতের মূল্যবান সম্পদ হারালে জাতি বাঁচবে না। উন্নত গ্রীক ও মিশরীয় সভ্যতা ছিল প্রাচীন, আজ মরে গেছে। জাতির পুরাণ ঐতিহ্য সবই খারাপ নয়, আধুনিক যা চিন্তা ভাবনা তা সবই ভাল; তাও নয়। আজ আপনার বয়স হয়েছে ষাট বছর, বিগত ষাট বছরের কোন জ্ঞান, অভিজ্ঞতা যদি আপনার স্মৃতিতে না থাকে, তবে বুঝতে হবে ঐ ষাট বছর আপনার জীবনে মৃত। অতীতকে ভিত্তি করেই ভবিষ্যৎ তার রূপ নেয়, বাল্যের উপর

ভিত্তি করে আসে কৈশোর এবং কৈশোরের উপর ভিত্তি করে আসে যৌবন। কোন বৃক্ষের সব পাতা শীতে ঝরে যায়, আবার বসন্তে সব নতুন পাতায় গাছ ভরে যায়। সবুজ পাতারা যদি ভাবে, আমরা সবাই নতুন, পুরাতনের সঙ্গে রাখব না কোন সম্পর্ক ; আমাদের জীবনে সবচেয়ে পুরান হচ্ছে শিকড়, তাকে বাদ দাও। তা'হলে গাছ বাঁচবে না সবুজ পাতারও অস্তিত্বও থাকবে না। সেইরূপ জাতির জীবনে কিছু প্রাচীন ঐতিহ্য আছে শিকড় স্থানীয়। তাদের যত্নে রক্ষা না করলে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে।

আমাদের সুপ্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থ বেদ। আধুনিক যুগের মানবের প্রয়োজনীয় সংবাদ আছে বেদে। বেদ সকল মানবের জন্য। বিশ্বের সকল মানবকে ডেকে বেদ বলেছেন,—হে অমৃতের পুত্রগণ, শোন (শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ)। বেদ এমন কি বলবেন যা সবার শোনার মত, মান্য করার মত। যদি বলেন, ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছেন, পরকাল আছে। অনেকেই এসব কথায় আপত্তি তুলতে পারেন, ঐ সকল যে আছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিন, নাহলে আমরা মানি না। এ সকল অপরোক্ষ অনুভূতির বিষয়, তাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ যা সকলেই দেখতে বা বুঝতে পারে তা দেওয়া সম্ভব নয়! সাধনার বিশেষ স্তরে উঠলে তখন আপনি ঐ সব প্রত্যক্ষ করবেন, অন্যথা নয়। কিন্তু সকলকে ডেকে বেদ এমন কথা বলেছেন যা সকলেই মানবে, কারও আপত্তি হবে না।

এমন কি কথা থাকতে পারে, যা সকলেই মানবে? শুনুন, বেদ বলছেন,—মানুষের জীবনে দুঃখ আছে। ব্রহ্মানুভূতি বা আত্মানুভূতি না থাক, দুঃখানুভূতি সকলের আছে। আর এই দুঃখ কেউ চায় না, ইহার বিপরীত সুখের সকলেই পিয়াসী। দুঃখ আমাদের জীবনে চেপে বসে আছে, শত চেষ্টাতেও হটান যাচ্ছে না। আমরা সকলে সব সময় চাইছি, আমার যেন দুঃখ না হয়, সুখ হয়। ইহাই সকল বিশ্বমানবের কথা। বেদ এই কথাই বলেছেন,—যেন আমার দুঃখ না হয়, যেন সুখ হয় (দুঃখং মে মা ভূৎ সুখং মে ভূয়াৎ)। এ কথায়

আপত্তি করবার কেউ আছে বলে মনে হয় না। বিশ্বের সকল মানব দিবারাত্র চাইছে এবং প্রাণান্তকর পরিশ্রম করছে একটাই উদ্দেশ্যে, যাতে দুঃখ না হয়, জীবনে সুখ হয়। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সকলেই এই চেষ্টায় রত। শাস্ত্রকারগণ বলছেন,—আমাদেরও ঐ একই উদ্দেশ্য, মানব জীবনের দুঃখ দূর করা এবং সুখ-শান্তি বিধান করা। তবে অপরের চেষ্টা লৌকিক, আমাদের চেষ্টা পারমার্থিক। অপরের চেষ্টার ফল সাময়িক, আমাদের চেষ্টার ফল স্থায়ী। ক্ষুধায় কেউ পীড়িত, খাবার দিলেন, ক্ষুধার দুঃখ গেল, কিন্তু আবার ক্ষুধা পাবে। রোগের যন্ত্রণা, ডাক্তার ওষুধ দিয়ে ভাল করলেন, দুঃখ গেল কিন্তু আবার রোগ হবে। এমন ওষুধ ডাক্তারের নেই যে আর রোগ হবে না। কিন্তু শাস্ত্রকার বলছেন,—আমাদের চেষ্টায় আপনার দুঃখ চিরতরে যাবে, "আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি" হবে। আমরা সাধুরা শাস্ত্রীয় আচার্যগণের ভৃত্যমাত্র, তাঁদের কথার ধারক ও বাহক। লোকে আমাদের কথা গ্রহণ না করলেও আমরা হাল ছেড়ে দিই না। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, যে যে-পথে চলুক শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে আসতে হবে, নাহলে দুঃখের হাত থেকে রেহাই নেই। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

সমাজ-নীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ সকলেই নিজ নিজ চিন্তা-ভাবনা অনুসারে দুঃখের কারণ নির্ণয় ও উহা দূর করার চেষ্টা করছেন। বর্তমান বিজ্ঞানও সুখবিধানে ব্যাপৃত। নিত্য নব নব অসংখ্য সামগ্রীতে বাজার ছেয়ে যাচ্ছে, সবই মানুষের সুখের জন্য। কিন্তু দুঃখ মানুষের জীবনে বেড়েছে বই কমে নি। দু'টি মানুষ, দু'টি সমাজ, দুই জাতি আজ একত্র থাকতে পারছে না। বিভেদ, বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব সংঘাত লেগেই রয়েছে। কেন এত দুঃখ, এত অশান্তি। কারণ যথার্থ নির্ণয় হলেই ওষুধে কাজ হবে।

বেদ আপনার দুঃখের কারণ ও উহা দূর করার উপায় নির্দেশ করেছেন। আপনি দুঃখী ভুক্তভোগী, আপনার শোনা কর্তব্য, প্রত্যহ শুনুন বেদের কথা, শুনলেই কল্যাণ হবে। বেদ বলেছেন,—আপনি

আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে ক্ষুদ্র পরিচয়ে বদ্ধ হয়ে আছেন, আপনার যে বড় পরিচয় তা জানুন, সবচেয়ে বড় যিনি, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হন, তাঁর পরিচয়ে পরিচিত হন (নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্ যদ্বৈ ভূমা তৎ সুখং)। আপনি বাঙ্গালী, আপনি আসামি, আমি বিহারী এই ছোট পরিচয়ে বদ্ধ থেকে পরস্পর বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে ঝগড়া করছেন। আপনার যে আসল পরিচয়, আপনি ভারতীয় (Indian), সেই পরিচয়ে স্থিত হন, বিশ্বাস করুন, সবাই ভারতীয় ভাবলে আর দ্বন্দ্ব থাকবে না। আপনি আমেরিকান, আপনি রাশিয়ান এই ক্ষুদ্র পরিচয়ের জন্য পরস্পর বিদ্বেষী ও দ্বন্দ্বপরায়ণ। আজ থেকে ভাবুন, আপনি আমেরিকান নন, রাশিয়ান নন, আপনারা বিশ্বের জন, বিশ্বেশ্বরের সন্তান, সকলে ভাই ভাই। এই পরিচয়ে বিশ্বাস করুন, স্থিত হন তা'হলে আর দ্বন্দ্ব থাকবে না, দুঃখ থাকবে না, চিরশান্তি লাভ হবে। যদ্বৈ ভূমা তৎ সুখং—ভূমা যিনি, সকলের বড় যিনি, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই ভগবান। তাঁর পরিচয়ে পরিচিত, তাঁর সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'দুই পাখী' কবিতায় এই জীব ও ব্রহ্মের তত্ত্বই ইঙ্গিত করেছেন। বনের পাখী (যে মুক্ত) বলছে খাঁচার পাখীকে, তুই ছোট খাঁচায় সংকীর্ণ হয়ে আছিস, এতে সুখ নাই। খাঁচার পাখী (যে বদ্ধ) ভাবছে, এখানে নিরাপদে আছি, খাবার আছে নিরাপত্তা আছে, বাইরে গিয়ে কি হবে ? বনের পাখী বলে, বাইরে ওড়ার যে কি আনন্দ তা জানিস্ না বলে একথা মনে হচ্ছে। বনের পাখীর কথা খাঁচার পাখী বুঝতে পারে না। নিজের সংকীর্ণ স্বার্থের গণ্ডির মধ্যে বস্তুতঃ কোন সুখ নেই। বড় যিনি, পূর্ণ আনন্দ শান্তিময় যিনি, সেই ভূমার সঙ্গে যুক্ততায় আপনার প্রকৃত আনন্দ ও শান্তি। ভূমা যে কেবল বড় তা নয়, তাঁকে যে জানে সেও বড় হয়ে যায় (বৃহত্বাৎ বৃংহনত্বাৎ)। হিমালয় খুব বড় জেনে আমার লাভ নেই, বিড়লার বহু টাকা জেনে আমার অভাব দূর হয় না। কিন্তু ব্রহ্মকে জানলেই লাভ, কারণ ব্রহ্মকে যিনি জেনেছেন, তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান

(ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি)। যিনি জেনেছেন, তিনিই বড় হয়ে গেছেন।

বেদান্ত দর্শন বলেছেন,—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা', এখন ব্রহ্মের কথা বলি। সংসারের কথা সারা জীবনে তো অনেক হল, কি পেলেন তাতে। যতটুকু ব্রহ্মের কথা বলবেন, তাঁর উপাসনা করবেন, ততটুকু জীবন সার্থক, ততটুকুই কল্যাণ। ব্রহ্ম কি বস্তু, তাঁর স্বরূপ কি, আমি কে, উপাসনার পথটা কি—ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ, কেমন করে তাঁর কাছে যাওয়া যাবে, তাঁকে পাওয়া যাবে—ইহাই শাস্ত্রের কথা। সব শাস্ত্রের যে কথা ভাগবতের সেই কথা, তা'ছাড়া ভাগতের কিছু বিশেষ কথা আছে। তা' না শুনলে বা না জানলে আমাদের সমূহ ক্ষতি। অনেক গায়ক একসঙ্গে গান করেছেন, তাদের মধ্যে একজনার কণ্ঠ অতীব মধুর, তার গান যদি পৃথক করে না শোনা যায়, তবে যেমন লোকসান, ভাগবতের সম্বন্ধেও তাই। ভাগবতের নিজস্ব বার্ত্তাটা শুনতে হবে।

ভাগবতের কি বার্তা, তা সংক্ষেপে বলা যায়, আবার বিস্তার করেও বলা যায়, সারা জীবন শুনলেও ফুরাবে না। বন্ধু এসেছে কলকাতায়, তাকে ১০ মিনিটেও কলকাতা দেখান যায়, মনুমেণ্টে উঠে দেখালেন—কোথায় গঙ্গা, কোথায় মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি। আবার অনেক দিন ধরে খুঁটিয়ে ভাল করে দেখান যায়। শাস্ত্রকেও ছ'ভাবে দেখতে হবে—সামগ্রিকভাবে, সবটা একবারে এবং খুঁটিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্লোক, অধ্যয় ধরে। Analytic আর Synthetic দুইভাবে। ভাগবতে উল্লেখ আছে, উহা বিশেষ করে কলির জীবের জন্য এবং সংসারী মানুষের জন্য। সংসারী কে? অত্যন্ত বৈরাগ্যবান বা অত্যন্ত ভোগাসক্ত নয় যে সেই সংসারী। স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়ে সংসার যাত্রা নির্বাহ করছে, অথচ ভাল লাগে না, আবার ছেড়েও যেতে পারে না। কিছুটা ভাল লাগা আছে, আবার বিরক্তি দুঃখ জ্বালা বোধও আছে যার, সেই সংসারী।

সকল শাস্ত্র বলছেন,—ব্রহ্মকে জান, ব্রহ্মের উপাসনা কর, ব্রহ্মের

সঙ্গে যোগযুক্ত হও, তবেই তোমার কল্যাণ, তবেই দুঃখমুক্তি। শ্রীভাগবত বলেছেন,—হে কলিহত জীব। ব্রহ্মের উপাসনার ক্ষমতা তোমার নেই ; অত্যন্ত চঞ্চল তোমার মন, ব্রহ্মের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়া তোমার সাধ্যাতীত। ব্রহ্মের নিকট তোমাকে যেতে হবে না, তিনি নেমে এসেছেন মানব দুয়ারে। তাঁকে ডাকবার সামর্থ্য কোথায় তোমার, তোমার ডাক তাঁর কাছে পৌঁছাবে না। প্রয়োজন নেই তাঁর, তিনি তোমায় ডাকছেন, সর্বভূতমনোহারী মুরলী ধ্বনি করে ডাকছেন, শোন কান পেতে, সংসারের কর্ম কোলাহল থেকে একটু সরে এস, তবে শুনতে পাবে। ছোট ছেলে মেলায় গেছে বাবার সঙ্গে। নানান মনোমুগ্ধকর জিনিস দেখতে দেখতে কখন বাবার হাত ছেড়ে গেছে জানতে পারেনি। অসংখ্য লোকের ভিড়ে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না বাবাকে। একাকী বাড়ী ফিরতে পারবে না। ভয়ে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে 'বাবা বাবা' বলে। একজন হিতাকাঙ্ক্ষী তাকে বল্লেন,—খোকা ! 'বাবা বাবা' বলে কেঁদ না, কত অসংখ্য বাবা রয়েছে এই মেলায়। বাবাকে হারিয়ে তুমি যে কেবল বিপদগ্রস্ত, তা নয়। তোমায় হারিয়ে তোমার বাবাও বিপদগ্রস্ত, তোমায় না নিয়ে তিনি ঘরে ফিরতে পারবেন না। তিনি আকুল হয়ে ডাকছেন তোমায়, তোমার নাম ধরে, তুমি কান পেতে শোন। তাকে হারিয়ে তার বাবা আকুল হয়ে খুঁজছেন, নাম ধরে ডাকছেন—এই সংবাদ তার কাছে অভিনব ; এক কল্যাণ পথের দরজা খুলে গেল তার সামনে। জীব আমরা ভগবানকে ভুলে দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা ভোগ করি। শ্রীভগবানও আমাদের জন্য দুঃখী, কাতর, আমাদের দুয়ারে এসে ডাকেন, কাঁদেন—'উচ্চৈঃস্বরে কান্দে প্রভু (মহাপ্রভু) জীবের লাগিয়া'—এই সংবাদ সত্যই অভিনব। এই প্রাণ জুড়ান আশার সংবাদ ভাগবত এনেছেন জীবের দুয়ারে। যে শুনল, যার এ-কথায় বিশ্বাস জন্মাল, তার জীবনধারা পাল্টে গেল।

শাস্ত্র বলেছেন,—ব্রহ্মকে জানলে আপনি ব্রহ্ম হয়ে যাবেন (ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি)। তপস্যার এতখানি সামর্থ্য। অদ্বৈত

বেদান্ত মতে জীব ব্রহ্মই হয়ে যায়। এই সংবাদ বিরাট, শুনে চক্ষু বিস্ফারিত হয়। ভগবান শঙ্কর ব্রহ্মই হয়ে গেছেন। শ্রীভাগবত বলেন, —এত বড় বিস্ময়কর খবর আমার নেই, তবে এর থেকে সুন্দর প্রাণ জুড়ানো মধুর সংবাদ আছে। মানুষ তপস্যা করে ব্রহ্ম হয়, ভগবান তপস্যা করে মানুষ হয়ে আসেন। ভগবানের তপস্যাই করুণা। ব্রহ্ম যখন করুণাঘন মূর্তি ধরে আসেন, তখন তাঁর মত সুন্দর, মধুর আর কিছু হতে পারে না। বিরাট যে ভগবান তিনি নন, মধুর যে ভগবান তিনিই আসল, ভগবত্তার পরাকাষ্ঠা (মাধুর্য ভগবত্তা সার)। মানুষ হয়ে যখন তিনি আসেন, তখন সর্বাতিশায়ী মাধুর্য।

শাস্ত্র তপস্যার ক্ষেত্রে অধিকারী অনধিকারীর প্রসঙ্গ তুলেছেন। তপস্যার জন্য যোগ্যতা লাভ করা চাই, অধিকারী হতে হবে। সবাই অধিকারী নয়, স্ত্রীলোক ও শূদ্র অনধিকারী। ব্রাহ্মণ জন্ম মাত্র শূদ্র (জন্মনা জায়তে শূদ্র), সাবিত্রী মন্ত্র পেয়ে নিত্য গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলে হবেন দ্বিজ, নিত্য বেদ পাঠ করে হবেন বিপ্র, ব্রহ্মতত্ত্বের অনুশীলন করে ব্রহ্মকে জানলে হবেন ব্রাহ্মণ। অধিকারী ভেদ তো অসঙ্গত নয়। যে স্কুল ফাইনাল পাশ করেনি, সে কি করে B. A. ক্লাসে ভর্তি হবে। অধিকারী না হলে তপস্যার পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে না।

শ্রীভাগবত বলেন, আমার নিকট অধিকারী-অনধিকারী কিছু ভেদ নেই। সকলেই অধিকারী। কারণ, ভগবান পাবার জন্য যা দরকার তা সকলের আছে। কি সেই বস্তু যা সকলের আছে এবং যার দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়? তা হচ্ছে হৃদয়ের শুদ্ধ ভালবাসা। সকল জীবের হৃদয়েই ভালবাসা আছে, এমন কি বাঘ-সিংহের মধ্যেও। আত্মার ধর্মই ভালবাসা, যেখানে আত্মা আছেন, সেখানে ভালবাসা থাকবে। জীবের ভালবাসা তো শুদ্ধ নয়। বিষয় বাসনা, ইন্দ্রিয়সুখ প্রভৃতি মালিন্যে ভরা। ঐ মলিন ভালবাসার মধ্যেই শুদ্ধ ভালবাসা আছে। ময়লা জলের ময়লা যদি ফিলটার করে বাদ দেওয়া যায় তবে পরিশুদ্ধ জল যেমন পাওয়া যায়, সেইরূপ

মালিন্যযুক্ত ভালবাসার মধ্য হতে যদি মালিন্য দূর করে দেওয়া যায়, তবে শুদ্ধ ভালবাসাই দেখা যাবে সেখানে রয়েছে। প্রেম সকলের মধ্যে আছে, মালিন্যটুকু কেবল সরাতে হবে। এই প্রেম চেষ্টায় লভ্য নয়। তাই বৈষ্ণবাচার্য বলেছেন,—

নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥

পশু-পাখী জীব-জন্তুর মধ্যেও যে প্রেম আছে তার প্রমাণ পাবেন শ্রীবৃন্দাবন লীলায়, মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাত্রাকালে ঝারিখণ্ডের পথে। সিংহ, হাতি প্রভৃতি জন্তু মহাপ্রভুর সঙ্গে কৃষ্ণনাম গান করছে। এমন কি বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্বত, তারাও পেয়েছে ভগবানকে ব্রজলীলা কালে।

ভালবাসার কি সামর্থ্য দেখুন। বাক্য মনের অতীত যিনি, মহাযোগীরাও যাঁকে সাধননিষ্ঠ মন দিয়ে ধরতে পারেন কিনা সন্দেহ, তাঁকে হাত দিয়ে ধরবার জন্য ছুটছেন গোপমাতা এবং নিশ্চয় ধরেছেন। কোন্ অধিকারে ধরতে চান, হৃদয়ের শুদ্ধ ভালবাসার জোরে। জ্ঞান নেই, বিদ্যা নেই, শাস্ত্রপাঠ নেই, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নেই, যম-নিয়ম-প্রাণায়াম নেই, তবে আছে কেবল শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভালবাসা। ভালবাসা আমাদের আছে, আমরাও অধিকারী—এই বোধটাই অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেল মানবগোষ্ঠিকে।

অতি সাধারণ মানুষ যারা, প্রায় সর্বহারা, গোপপল্লীর সেই অশিক্ষিত মানুষের ভালবাসা নিয়ে ভাগবানকে বশীভূত করার মত সম্পদ মানুষের আছে, এমন খবর ভাগবত ছাড়া আর কেউ দেয়নি। মানুষের ভালবাসার জন্য ভগবান লালায়িত। সেই ভালবাসা আস্বাদনের জন্য ভগবান মানুষ হয়ে আসেন। তিনি মানুষের দুয়ারে আসেন, মানুষকে ডাকেন এবং কেঁদে যান। এই কথার রেশ যদি অন্তরে লেগে গেল তো জীবন পাল্টে যাবে। এই অভিনব সংবাদ ভাগবতের দান।

কাব্য ও উপন্যাসের বিষয়বস্তু—মানুষ ও তার ভালবাসা।

ভাগবতে ভগবান মানুষ হয়ে এসেছেন এবং প্রেমের লীলা করেছেন। এজন্য শ্রেষ্ঠ দর্শনের গ্রন্থ হয়েও ভাগবত একখানি অপূর্ব কাব্যগ্রন্থ। দার্শনিকের দৃষ্টিতে কাব্য বা উপন্যাস পাঠের অযোগ্য। সাহিত্য-রসিকের নিকট দর্শনের গ্রন্থ রসহীন অপাঠ্য। সেক্সপীয়রের কাব্য যার ভাল লাগে কাণ্টের দর্শন তার কাছে নীরস, অর্থহীন মনে হবে। ভাগবতে দর্শন ও কাব্য মাখামাখি। এমন গ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যে আর দ্বিতীয় নেই। গৌড়ীয় দর্শন ও কাব্য মাখামাখি। গৌড়ীয় দর্শন, ভাগবত-ভিত্তিক। এজন্য ভাগবত কত যে কাব্য, পদ-পদাবলীর সৃষ্টি করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কথায় বলে—'কানু বিনে গীত নাই।'

ভাগবত ব্রহ্মের রস-স্বরূপের কথা বলেছেন। প্রচলিত ধারণা এই, কান্তা প্রেম বা যুবক-যুবতীর ভালবাসা ছাড়া রস হয় না। ভালবাসায় যদি সমস্ত সত্তাটা প্রেমের পাত্রে ন্যস্ত (involved) না হয় অর্থাৎ যদি Romance না হয় তবে ভালবাসার পরাকাষ্ঠা বা রতি হল না। ভাগবতে দেখুন বাৎসল্যে, সখ্যেও রতি হয়েছে। বিশ্বের কোন সাহিত্যে এই সম্পদ নেই।

আবার দেখুন পরকীয়া প্রেম। উপপতিতে রমণীর যে ভালবাসা তা সমাজে ঘৃণিত। ভাগবতে দেখুন, পরকীয়া রসের কি মাধুর্য। এখানে নিন্দনীয় নয়, যেমন নর্দমার জল এসে গঙ্গায় পড়ে গঙ্গাই হয়ে যায়, সেইরূপ যত কিছু মলিন, নিন্দনীয় তা ভগবৎ সম্পর্কান্বিত হলে আর মালিন্য থাকে না। ব্যাপকতা ও গভীরতায় ভাগবতের চমৎকারিত্ব সর্বাতিশায়ী।

শ্রবণমঙ্গলম্—শুনলেই মঙ্গল হবে এই দাবি ভাগবত ছাড়া আর কোন শাস্ত্র গ্রন্থের নেই। শাস্ত্রে আছে—বিধি-নিষেধ। এগুলি কেবলমাত্র জেনে কোন লাভ নেই, যদি না জীবনে তার প্রয়োগ করা যায়। ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র (Prescription) মুখস্থ করে কোন কাজ হবে না, তদনুসারে ঔষধ খেতে হবে, তবে কাজ হবে। ভাগবত বলছেন—আমি কোন উপদেশ বা বিধি-নিষেধ দিতে আসিনি।

আমি একটা সংবাদ দিতে এসেছি যা শুনলেই আপনার কল্যাণ হবে। আপনি দুঃখে আছেন দেখে একজন সুহৃদ বল্লেন,—আপনি অমুক ব্যক্তির কাছে যান, তিনি আপনার বাল্যবন্ধু, অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই তাই ভুলে গেছেন। তিনি বহুদিন বিলাতে ছিলেন, এখন একজন বিরাট ধনী মানী ব্যক্তি। বহুলোক তাঁর কাছে উপকার পেয়েছে। আপনি বাল্যবন্ধু, যান একবার, আপনার সকল দুঃখ অভাব দূর হয়ে যাবে। কিছুতেই স্মরণ হয় না বাল্যবন্ধুর কথা। সুহৃদ কিন্তু রোজই এসে তাঁর কথা বলেন। শুনতে শুনতে একদিনের এক বিশেষ ঘটনার বিবরণে বাল্যবন্ধুর স্মৃতি জেগে উঠল। সেইরূপ ভাগবত বলছেন,—আপনি কেন দুঃখ কষ্টে রয়েছেন, অত্যন্ত দয়ালু আপনার পরম বান্ধব একজন আছেন, তাঁর খবর করুন, সব অভাব-দুঃখ কষ্ট চলে যাবে। তাঁর মেঘের মত বরণ, পরিধানে পীতবসন, তিনি কালির হ্রদের জল বিষমুক্ত করেছিলেন, কালিয়ের মাথায় নৃত্য করেছিলেন, সাত দিন গোবর্ধন গিরি হস্তের আঙ্গুলে ধারণ করেছিলেন ইত্যাদি। রোজ শুনুন, নিরন্তর শুনুন তাঁর কথা। আপনার দেহ-মন-প্রাণ ভুলে গেছে তাঁকে, কিন্তু আত্মা তাঁকে ভোলেনি। মধুর তাঁর সংবাদ, কেবল শুনুন, আর কিছু পালন করতে হবে না। তিনি সর্বভূতের মনোহারী বাঁশীর সুরে ডাকছেন। সংসারের কর্ম-কোলাহলে কান বধির, তাই শুনতে পাই না। কানের বধিরতা যাবে, যাঁরা তাঁর ডাক শুনেছিলেন, তাঁদের কথা শুনুন, ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথা, ব্রজের মায়েদের, সখাদের, ব্রজগোপীদের কথা শুনুন, তাঁর রূপের কথা, বেণুমাধুর্যের কথা শুনুন। শুনতে শুনতে স্মৃতি ফিরে আসবে, শুনলেই কল্যাণ হবে।

যদি বা না বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীত, জানিবে রসের রীত,
শুনিলেই বড় হবে হিত॥

দুঃখ, শোক, ভালবাসা এগুলি চিত্তের ভাববিশেষ। দুঃখী বা

শোকার্তের সঙ্গে চিত্ত শোকাভিভূত হবে। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভালবাসা যাঁদের আছে, তাঁদের সঙ্গ করুন। সঙ্গ যদি না পান, প্রসঙ্গ করুন, তাঁদের কথা নিরন্তর শুনুন, প্রসঙ্গেও সঙ্গ হবে। তাঁদের হৃদয়ের প্রেমভাব আপনার চিত্তেও লেগে যাবে (শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়)।

জাতীয় জীবনের এক মহা সংকটকালে মহাপ্রভু এসেছিলেন। ভাগবতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিয়ে জাতিকে, আর্য ধর্ম-সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছিলেন। সেই ভাগবতের মহাদান আমরা ভুলতে বসেছি। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর পুনরায় এসে ঐ মহাদানের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন,—'ভক্তি শাস্ত্র ভাগবত সার কর অবিরত।' তবেই জীবনে আমাদের পরম কল্যাণ সাধিত হবে।

শ্রীভাগবতের কথা ইচ্ছা করলেই বলা যায় না, শুনলেই শোনা হয় না। কয়লা যেমন আগুনে পুড়ে আগুনে রূপান্তরিত হয়, তিনি কৃপা করে জিহ্বা, কর্ণ অপ্রাকৃত করলে, তবেই ভাগবতের কথা বলা যায়, শোনা যায়।

জয় জগদ্বন্ধু! জয় মহাপ্রভু!

ভক্ত-ভগবান-ভাগবত

(শ্রীগুরুদেব ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী
মহারাজের বেলুড় নপট্টিতে ১৯শে ডিসেম্বর
১৯৬১ সালের বক্তৃতা অবলম্বনে)

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥

এক অভিনব সংবাদ পরিবেশন করেছেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। এক অভিনব চন্দ্র-সূর্য গৌড়দেশ উদয়গিরিতে একই কালে উদিত হয়েছেন এবং জীবের চিত্তগুহার অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ করেছেন।

এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত চিত্তগুহার তম করে নাশ॥

ব্রজ হতে এসেছেন এঁরা, নাম-রূপ বদলে এসেছেন—

ব্রজে যে বিহরে পূর্বে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটি চন্দ্র-সূর্য জিনি দোঁহার নিজ ধাম॥
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড়দেশে পূর্বশৈলে করিলা উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
দোঁহার প্রকাশে সর্ব জগত আনন্দ॥

এই দুই চন্দ্র-সূর্য আবির্ভূত হয়ে কি করেছেন? জীবের চিত্তগুহার অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ করেছেন। অন্ধকার বিনাশ অভাববাচী শব্দ, অন্ধকার দূর করে কোন্ বস্তুর প্রকাশ করেছেন, উহাই আসল কথা। তাই বলেছেন,—

দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥

দেখা ও সাক্ষাৎকার মনে হয় সমান অর্থ কিন্তু তা নয়।

সাহেবেরা বলে—I saw him but did not meet তার সঙ্গে দেখা হয়েছে কিন্তু সাক্ষাৎকার হয় নাই। রাস্তায় যেতে বহু লোক চোখে পড়ে, দেখি আমরা, কেমন আছেন তাও বলি কিন্তু সাক্ষাৎকার হয় না। যদি সেখানে কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়, পাঁচ-দশ মিনিট সুখ দুঃখের কিছু কথা হয় যা হৃদয়কে স্পর্শ করে, তবেই তা সাক্ষাৎকার। অন্তরঙ্গ পরিচয়, তাই করিয়েছেন দুই ভাগবতের সঙ্গে। কলিহত জীবের, ইহাই সাক্ষাৎকার।

ভাগবত কি ? ভগবতম্ ইদম্ ভাগবতম্, যা ভগবানের বস্তু তাই ভাগবত। জগতের সবই ভগবানের বস্তু, তবে সবই কি ভাগবত ? না, তা নয়। যোগারূঢ় শব্দ, নির্দিষ্ট অর্থেই এর প্রয়োগ। যেমন পঙ্কজ, পঙ্কে যা জন্মে তাই পঙ্কজ নয়, পঙ্কে পদ্মফুল জন্মায় তা পঙ্কজ। সেইরূপ, ভাগবত হচ্ছে শ্রীভগবানের কথা। তাঁর তত্ত্ব-রূপ-গুণ-লীলার, সৌন্দর্য মাধুর্য-ভক্তবাৎসল্যের কথা।

এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥

ভাগবতের এক ভাগবত—ভাগবত শাস্ত্র গ্রন্থ। আর ভাগবত তাঁরা, যাঁরা ভগবানের কথা ভালবাসেন, ঐ কথা যাঁদের জীবাতু, তাঁরাই পরম ভাগবত বা ভক্ত। ভগবান গৌরহরি লীলায় এসে দুই ভাগবত দান করেছেন। ভগবান, ভাগবত ও ভক্ত—এই তিন বস্তু আমরা পেলাম। এই তিন-এ কোন ভেদ নেই। এই তিন-ই আমাদের অপরিহার্য। এই তিনের সমাবেশ আমরা দেখি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মধ্যে। ভগবান তিনি, ভক্তভাব অঙ্গীকার করে এসেছেন, তাই ভক্ত। আবার নিজ লীলাময় জীবনে শ্রীভাগবত গ্রন্থের রসমাধুর্য মূর্ত করে, জীবন্ত করে দেখিয়েছেন, তাই ভাগবতময় তিনি, জীবন্ত ভাগবত তিনি। একাধারে তিন—ভগবান, ভাগবত, ভক্ত।

ভজ্ ধাতু হতে ভক্ত অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের ভজনা করেন। যার যে বস্তুতে প্রবল অনুরাগ, তিনি তাঁর ভজনা করেন। অর্থের প্রতি যার তীব্র লালসা, সে অর্থের ভজনা করে, শ্রীভগবানে যাঁর অনুরাগ

তীব্র তিনি তাঁর ভজনা করবেন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, হনুমানের ভজনের কথা, ভক্তির কথা আমরা শুনেছি। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে দেখি ভক্তের লক্ষণ। শ্রীমহাপ্রভুর আগমনে আমরা দেখলাম যথার্থ ভক্ত, জীবনের প্রতিটি ক্ষণই তাঁদের ভজনময়। এমন কি আহার নিদ্রার সময়ও বৃথা যায় না। আহারকালে ভগবৎ স্মরণে আবিষ্ট হয়ে প্রসাদ গ্রহণ করেন, আর নিদ্রা কালে স্বপ্নে রাধা-কৃষ্ণলীলা দর্শন করেন। 'কৃষ্ণ স্মরণ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।' এমন ভক্ত ত্রিকালে দুর্লভ, মহাপ্রভুর কৃপায় আমাদের সাক্ষাৎকারের দর্শনের, সৌভাগ্য হয়েছে।

ভক্ত-ভগবান-ভাগবত তিন-ই ত্রিগুণাতীত চিন্ময় বস্তু। এদের কোন একটা বাদ দেওয়া যায় না। ভগবান বল্লেই ভক্ত এসে পড়ে; যেমন পিতা বল্লেই বুঝা যায় সন্তানের জনক, পুত্র এসে পড়ে। সন্তান ছাড়া কেহ পিতা হতে পারে না, সেইরূপ ভক্ত ছাড়া ভগবান হতে পারেন না। ব্রহ্ম স্বনির্ভর, কারও অপেক্ষা নেই তাঁর, কিন্তু ভগবান ভক্ত-নির্ভর। ব্রহ্মের বিষয় বেদ-উপনিষদে আছে, ভক্তির কথা সেখানে খুঁজে পাওয়া কঠিন। গীতার বক্তা ভগবান, তাই সেখানে রয়েছে শরণাগত ভক্ত অর্জুন। ব্রহ্ম যখন ভক্তের সঙ্গে যুক্ত হন তিনি ভগবান হয়ে যান। ভক্তের অপেক্ষা আছে ভগবানের। ভগবানের কথা বলতে গেলে ভক্তের কথা অপরিহার্যভাবে এসে পড়ে। ভগবান ও ভক্তের বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীচৈতন্যভাগবতে ভক্ত ও ভগবানের কথা। রামায়ণ ভগবান রামচন্দ্র ও বহু ভক্তের প্রসঙ্গে ভরা।

জ্ঞানেতে ভগবানের আংশিক জানা যায়। প্রেমের দ্বারা, ভালবাসার দ্বারা ভগবানকে জানা যায় সম্যকভাবে। ভক্তই জানেন ভগবানকে, ভক্তই আস্বাদন করেন ভগবানের রূপ-গুণ মাধুর্য। তিনিই বলতে পারেন ভগবানের কথা। ভগবান নিজে জানলেও তাঁর নিজ মুখে রূপ-গুণ-মাধুর্যের কথা শুনতে শোভন হয় না এবং রসশাস্ত্রমতে রস-পুষ্ট হয় না, সেজন্য ভগবানের কথার শ্রেষ্ঠতম বক্তাই হলেন ভক্ত।

ভাগবতের বক্তা পরমভাগবত শ্রীশুকদেব, তাই এত অমৃতময় হয়েছে (শুকমুখাৎ অমৃত দ্রব সংযুতম্)।

ভাগবত শ্রবণে ভগবানের স্বরূপের স্মৃতি জাগ্রত হবে, বিষয়-ইন্দ্রিয় সুখলালসাময় চিত্ত কৃষ্ণোন্মুখ হবে (যা শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ), শ্রীভগবান লাভ হবে। যদি বলেন ভক্তের কি প্রয়োজন? শ্রীরূপ-গোস্বামী বলেছেন ভক্তের প্রয়োজনীয়তার কথা—ভক্তি পদ্মমধুবৎ। আপনার দরকার পদ্মমধু। পদ্ম বনে গিয়ে পদ্ম তুলে এনে পিষে মধু বের করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু এক ফোটা মধু পেলেন না। পদ্মের ভাষা থাকলে আপনাকে বলতো—আপনি কেন আমাদের ছিঁড়ে নষ্ট করছেন? মধু আহরণের যোগ্যতা আপনার নেই, যার আছে সেই মৌমাছিরা সব মধু নিয়ে গেছে। তবে তারা সব মধু ভোগ করে নাই, মধুচক্রে সঞ্চয় করেছে। এখন খোঁজ করে দেখুন কোথায় আছে মৌচাক। সেখানেই পাবেন মধু। ভগবানকে পাবার ও ধরে রাখবার উপায় হচ্ছে ভক্তি। এই ভক্তি ভক্তের সম্পদ। ভগবানও দিতে পারেন না। তিনি বলবেন,—ভক্তি আমার কাছে নেই, সব নিয়ে গেছে ভক্ত মধুকরেরা। তাঁরা নিজেরাই কেবল তা ভোগ করেন না, হৃদয় মধুচক্রে সঞ্চয় করে রাখেন। যদি ভক্তি পেতে চাও, ভক্তের সঙ্গ কর। যদি বলেন ভাগবত থেকে সে কল্যাণ লাভ করবেন, তা হবে না—ভাগবত শুনতে হবে। কিন্তু শোনাবে কে? ভক্ত ছাড়া তা শোনাবার কেউ নেই। ভক্তের মহিমা সর্বাতিশায়ী আমাদের শাস্ত্রে। ভগবান হরি, দুর্বাসা মুনিকে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছেন, আমার নিজের কিছু স্বাতন্ত্র্য নেই, আমি ভক্তের অধীন। ভক্তিলাভ করতে হলে ভক্ত, সাধুসঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন। 'লব মাত্র সঙ্গে সর্ব সিদ্ধি হয়।' ভক্তকে ছেড়ে তিনি কোথাও থাকেন না—ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ভক্তের পরিচয় দিতে বলেছেন,—'ভক্ত ভক্তিরসপাত্র।' অতি সাধারণ বস্তু, যেখানে সেখানে রাখুন, তাতে কোন উদ্বেগ হয় না। কিন্তু অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু, যেমন হীরের গহনা টিনের বাক্সে রাখা যায় না, হয়

লোহার সিন্ধুকে, নয় ব্যাঙ্কের লকারে (Locker) রাখলে তবে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ত্রিজগতে ভক্তি সম্পদ হতে মূল্যবান বস্তু কিছু নেই। উহা ভগবান সাধারণ স্থানে রাখতে পারেন না, যেখানে রাখেন, সেই আধারটি অতি মূল্যবান—তিনিই ভক্ত, ভক্তি-রসপাত্র। 'কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত'—বলেছেন মহাপ্রভু। ভক্তের পরিচয় দিতে এত সংক্ষেপে এত মধুর বর্ণনা কোথাও দেখা যায় না। এখন ভক্তের সঙ্গ করতে হবে, ভক্ত যদি না পান, তবে ভক্তের প্রসঙ্গ করুন, ভক্তের কথা শুনুন। প্রসঙ্গেও সঙ্গ হবে।

শ্রীভগবান ও শ্রীভগবানের কথা ভিন্ন নয়। শ্রীভগবান অমৃতময় অর্থাৎ মরণধর্মী নন এবং সুধাময়। শ্রীভগবানের কথাও তাই। শ্রীরাসলীলায় গোপীগণ কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে বলেছেন,—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলম্ শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভুরিদা জনাঃ॥

তোমার কথা অমৃত। তোমাতে যে গুণ তোমার কথায় তোমার নামে সেই একই গুণ। কথা-নাম শব্দ মাত্র। শব্দ ও বস্তু এই সংসারে কোথাও এক গুণসম্পন্ন নয়। 'জল' বস্তুতে আপনার পিপাসা দূর হয়, কিন্তু 'জল' শব্দ সারাদিন ধরে উচ্চারণ করলে তৃষ্ণা বাড়বে বই কমবে না। বস্তু লক্ষ্মীরূপা, শব্দ সব সরস্বতীরূপা। জগতে উহাদের মধ্যে কোথাও মিল নেই। শব্দ বস্তুটিকে স্মরণের সহায়তা করে মাত্র। দুই যেন সমান্তরাল রেখার মত পার্থক্য বজায় রেখে চলেছে। বস্তুর কোন গুণ বা ক্রিয়া শব্দের মধ্যে নেই। বস্তু না থাকলে আমরা বাঁচি না, শব্দ না থাকলে আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতি বাঁচে না। শব্দ না থাকলে মানুষ বোবা পশুর অধম হয়ে যেত। অঙ্কশাস্ত্র বলে, সমান্তরাল রেখা যারা কোথাও মিলে না, এক অসীমে গেলে মিলে যায়। শ্রীভগবান অসীম, অনন্ত। এজন্য ভগবানের কথা, নাম ভগবানের গুণ বহন করে। যদি আপনি হরির নাম গ্রহণ করেন, হরি নিশ্চয় এসে উপস্থিত হবেন। "হরি শব্দ

উচ্চারণ হরিপুরুষ উদয়” বলেছেন প্রভু জগদ্বন্ধু। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলেছেন,—

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥

জীব ও জগতের কথা মরণধর্মী। আজ যে কথা খুব মূল্যবান, সবাই আগ্রহ সহকারে শুনতে ব্যগ্র, দুদিন বাদে তার কোন মূল্য থাকে না। ভাগবত পাঁচ হাজার বছর ধরে লোকে পড়ছে ও শুনছে, পরমানন্দ লাভ করছে। কখনই উহা পুরান হয় না। গান বলতেই তাঁর লীলা গান—‘কানু বিনা গীত নেই’। অমৃতময় তাঁর কথা কখনও বাসি হয় না। আমরা সকল জীব অমৃত চাই, মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে ইচ্ছা করি। ভাগবতের অমৃতময় কথা আমাদের অমৃতময় করিবে। ভাগবত একখানি পুরাণ। পুরাণ শব্দে অর্থ পুরা অপি। নব। অতি পুরাতন কিন্তু যখনই শুনিবেন মনে হবে নব—অতি নূতন

ঋষি যাজ্ঞবল্ক চলেছেন সংসার ছেড়ে। দুজন স্ত্রী ঋষির। একজন (মৈত্রেয়ী) প্রশ্ন করলেন,—কি জন্য সংসার ছেড়ে যাচ্ছেন? ঋষি বল্লেন,—অমৃতলাভের জন্য। স্ত্রী বল্লেন,—আমাদের জন্য কি রেখে যাচ্ছেন? ঋষি বল্লেন,—বিষয় আশয় যা থাকল, তাতে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না। স্ত্রী আবার প্রশ্ন করলেন,—এ সকলে কি অমৃত লাভ হবে? ঋষি উত্তর করলেন,—না, তা হবে না। স্ত্রী তখন বল্লেন,—যদি এতে অমৃতত্ব লাভ না হয়, তবে এসব দিয়ে কি করব (যেনাহং নামৃতস্যাম্ তেনাহং কিমকুর্যাম্—)? এক মহীয়সী মহিলার কণ্ঠের এই বাণী নিখিল শাস্ত্রে classical হয়ে রয়েছে।

অমৃতের জন্য আমরা, সবাই পিয়াসী, তাই তো মরণ ভীতির সঞ্চার করে। কাল নিয়তই দেহকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে চলেছে (কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছতি আয়ুঃ)। দেহধর্মে, দেহের পরিচর্যায় কোন লাভ নেই। দেহের যত গৌরব সব শেষ হয়ে যাবে। সময় থাকতে অমৃতময়কে স্মরণ করুণ, তাঁর নাম লীলাকথা জীবনের সার করুন।

তবেই মৃত্যু অতিক্রম করিয়া "অতিমৃত্যুঃ'' হবেন। তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যু মেতি। নান্যপন্থা—শ্রুতি বলেছেন।

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ লীলান্তে নামরূপে আছেন। ভাগবতে কথারূপে আছেন (শ্রীকৃষ্ণ পরিবর্তিতঃ)। শ্রীরামচন্দ্রকে পেতে হলে রামায়ণ শুনুন। শ্রীরামচন্দ্রের কাজ এখন তাঁর নাম-ই করবেন। রামচন্দ্র সাগর-বন্ধন করেছিলেন। রামচন্দ্র এখন নেই, আমাদের, সাগর বন্ধন করে কে দেবেন? দুস্তর ভবসাগর আমাদের সামনে। ভাবনা কি, রাম নাম আছেন, তাঁর নাম আশ্রয় করলে অনায়াসে ভব সাগর পার হবেন। রামচন্দ্রের সাগর বন্ধন করতে হয়েছিল গাছ পাথর ও বানরদের সাহায্যে কিন্তু নামের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন হবে না। রামচন্দ্র রাবণ বধ করে সীতা উদ্ধার করেছিলেন। আমাদের ভক্তি সীতাকে উদ্ধার করে দেবেন, দুর্দৈব-রূপ রাবণ তাকে হরণ করেছে। রাম নাম আশ্রয় করুন. আপনার জীবনের সকল দুর্দৈব বিনাশ করে ভক্তি সীতাকে উদ্ধার করে দেবেন। রামচন্দ্র পাষাণী অহল্যাকে উদ্ধার করেন। হল্যা অর্থ চাষের যোগ্য, অহল্যা অর্থ চাষের অযোগ্য। আমাদের হৃদয় সাধন-ভজন রূপ চাষের অযোগ্য হয়ে আছে। রামনাম আশ্রয়ে, তাঁর কথা শ্রবণে পাষাণ সম হৃদয় কোমল ও ভজনোপযোগ্য হবে। যা রাম করেছিলেন, সব তাঁর নাম করবে।

শ্রীকৃষ্ণ শতেক ফণাযুক্ত ভয়ঙ্কর কালীয় সর্পকে দমন করে যমুনা বিষমুক্ত করেছিলেন। আমাদের হৃদ্-যমুনা অসংখ্য কামনা-বাসনায় বিষময় হয়ে আছে। এখন উপায়? কৃষ্ণনাম আশ্রয় করুন। সব দুর্বাসনা দূর হয়ে যাবে এবং কৃষ্ণসেবা বাসনা জাগ্রত হবে। বেদ-বেদান্ত সব একটি অক্ষর প্রণবের মধ্যে বিধৃত। আমের একটা আঁটিতে আমগাছ একটি হয় কিন্তু সেই গাছে অসংখ্য আমের সম্ভাবনা রয়েছে। নামের মধ্যেও ভগবান আছেন (যেই নাম সেই কৃষ্ণ)। পুনঃ পুনঃ জপে মন্ত্র চৈতন্য হবে। শ্রীহরিদাস ঠাকুর তিন লক্ষ

নাম জপ করতেন। নামাশ্রয়ে আপনিও নিশ্চয় ভগবানের কৃপা লাভ করবেন।

কৃষ্ণ আছেন গোলোকে, তাঁর কথা তার নাম রয়েছে আমাদের ঘরে ঘরে। তাঁর নাম, তাঁর কথা ভারী বেশী। তাই পড়ে আছেন এখানে, কৃষ্ণ হাল্কা উপরে চলে গেছেন। কৃষ্ণমহিষী সত্যভামা তুলাব্রত করেছেন স্বামী সোহাগিনী হবার জন্য। দাড়িপাল্লার একদিকে কৃষ্ণ, অন্যদিকে সোনা-পান্না-হীরা জহরৎ সব চাপাচ্ছেন। সব উজাড় করে দিয়েও কৃষ্ণের সমান হচ্ছে না। সত্যভামা ভয়ানক বিপদাপন্না। নারদ ঠাকুর আছেন দাঁড়িয়ে। তুলাব্রত সফল না হলে কৃষ্ণকে নিয়ে চলে যাবেন। এই ব্রতে কৃষ্ণের সমান ওজনের জিনিষ দান করতে হবে। কিন্তু কিছুতেই হচ্ছে না কৃষ্ণের সমান। অনন্ত বিশ্বে কিছু নেই, যা তাঁর সমান হতে পারে। বিপদ দেখে রুক্মিণীদেবী পরামর্শ দিলেন। সব ফেলে দিয়ে তুলসী পাতায় কৃষ্ণনাম লিখে পাল্লায় দাও। তাই করা হল, দেখা গেল নামের দিকের পাল্লা ভারী হয়ে নীচে নেমে গেছে। সত্যভামা বেঁচে গেলেন। কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ কথা ভারী বেশী। ঐ কথার বাহক ভক্ত, তিনি উহা বিতরণ করে বেড়ান।

কৃষ্ণকথা অমৃতময়। শুধু তাই নয়, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় জীবন যাদের সন্তপ্ত, দুঃখক্লিষ্ট তাদের জীবন স্বরূপ তোমার (কৃষ্ণের) কথা (তপ্তজীবনং)। তোমার কথা কবিগণ কীর্তন করেন। কবি হচ্ছেন মুনি-ঋষিরা, যাঁরা ক্রান্তদর্শী, যাঁরা জীবনের চরম পরম ভূমি দেখতে পান। জগৎ ও জগৎজীবের অতীত-ভবিষ্যত যারা জানেন তাঁরাই ক্রান্তদর্শী কবি। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে আদিকবি বলা হয়েছে। জগতের মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যে একটা "ছন্দ" আছে, বেদের নামই ছন্দা, ঋতম্ (Rhythm)। জগতে একটা তাল আছে, সেই তালে চলতে হবে। উল্টা চললে, বেতালে চললে তার জীবন ব্যর্থ হবে, সে বিনষ্ট হবে (অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি)। বিশ্বের মূলে যে ছন্দ, আর তোমার হৃদয়ের যে স্পন্দন তা একই তালে চলছে। কবি হচ্ছেন এর দ্রষ্টা। সেজন্য সেই কবি ও তাঁর কাব্য

মরবে না। ব্যাস-বাল্মিকী মরবেন না। কালিদাসের রঘুবংশ মরবে না। প্রাচীনদের মধ্যে চারজন কবির উল্লেখ আছে—ব্রহ্মা, বাল্মিকী, ব্যাস ও কালিদাস। ব্রহ্মার এই সৃষ্টি, এও একটা কারুকৃতি। Mechanic এর কৃতি নয়।

কৃষ্ণকথা সকল পাপ বিনাশ করে (কল্মষাপহম্)। পাপ হেতু সংসারে মানুষ দুঃখকষ্ট ভোগ করে। কর্মের তিনভাগ—সঞ্চিত, যে কর্মের ভোগ জমা আছে ; প্রারব্ধ যা বর্তমানে ভোগ হচ্ছে এবং ক্রিয়মান যা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত হচ্ছে। ভাল কর্মের জন্য সুখ, মন্দ কর্মের জন্য দুঃখভোগ না করে উপায় নেই। তবে তীব্র ভগবদ্-ভজনে প্রারব্ধও কেটে যায়। ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত সার কর অবিরত'—প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের এই উপদেশ ব্যর্থ হবে না। আপনার সত্তায় জড় ও চৈতন্যের মিলন, দেহ ও আত্মা এক আধারে। দেহ-সুখের উপকরণ নিরন্তর বাড়ছে, এদিকে আত্মা রয়েছে উপবাসী। আত্মা উপবাসী থাকলে আপনার জীবনে শান্তি আনন্দ আসতে পারে না। আত্মা চিন্ময়, তাঁর খাদ্যও চিন্ময়, চিন্ময় ভগবতী কথা নিরন্তর শুনুন। জীবন কল্যাণময় হবে, শান্তি পাবেন।

কৃষ্ণ কথা সকল সম্পদের আকর (শ্রীমৎ)। জীবনের সকল অভাব দূরে যাবে, জীবন আনন্দে পূর্ণ হবে। এই কথা যাঁরা বিস্তৃত-রূপে কীর্ত্তন করেন, তাঁরাই এই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা (ভূরিদাঃ)। ভক্তেরা তাঁর কথা বলেন, তাঁরা ভূরিদা। জয়দেব, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি তাঁর কথা বলে অমর হয়ে গেছেন। ভগবান যখন ভক্ত হয়ে আসেন, গৌর-নিত্যানন্দ হয়ে এসে জীবের দ্বারে দ্বারে নাম-প্রেম বিতরণ করেন, তখন তিনিই দাতা শিরোমণি। অন্ন-বস্ত্র-ঔষধ-পথ্য দানে দুঃখ সাময়িক দূর হয়। কিন্তু ভগবানের কথা দানে জীবের দুঃখ চিরকালের জন্য চলে যায়, জীবন কল্যাণ সম্পদে ভরে ওঠে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-মাধুর্য অসমোর্দ্ধ, তাঁর থেকে বেশী বা তাঁর সমান কারও হতে পারে না। সেই মাধুর্য ভোগ করেন ভক্ত, ভক্তের আনন্দ দেখে ভগবান বুঝতে পারেন, ঐরূপ আনন্দের

অধিকারী তিনি নন। তাঁর মাধুর্যের খবর তিনি জানেন না। স্নান করে ফিরছেন শ্রীকৃষ্ণ, দেওয়ালের মণিভিত্তিতে তাঁর প্রতিবিম্ব পড়েছে। দেখে এতই বিস্ময়াভূত হয়েছেন যে বুঝতে পারেন নি তাঁর নিজের প্রতিবিম্ব, সেই রূপের মাধুর্য সবলে জড়িয়ে ধরে ভোগ করায় ইচ্ছা হল তাঁর! ঐ মাধুর্য ভোগ করতে গেলে ভক্তের ভূমিতে এসে দাঁড়াতে হয়. ভক্তের চোখ দিয়ে অন্তর দিয়ে ভোগ করতে হয়। কোন্ ভক্তের ভূমিতে এসে দাঁড়ালে কৃষ্ণ মাধুর্যের সর্বাতিশায়ী ভোগ হতে পারে। সকল ভক্তের ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমি, মূল উৎস হচ্ছেন মহাভাব-স্বরূপিনী শ্রীরাধা। তাঁর ভক্তি পেলে কৃষ্ণ মাধুর্য সর্বতোভাবে পূর্ণরূপে ভোগ করা যায়। যেমন, সুর্যোদয়ের সভা সবচেয়ে সুন্দর দেখা যায় দার্জিলিং-এর Tiger hill পাহাড় থেকে। Tiger hill এর দর্শকের আনন্দ দেখে যদি সুযে'র ইচ্ছা হয়, দর্শক হয়ে ঐ স্থান হতে নিজ মাধুর্য ভোগ করবেন, কৃষ্ণের ইচ্ছাও তদ্রূপ, রাধা হয়ে নিজ মাধুর্য ভোগ করবেন। তাই রাধার অন্তরে প্রবেশ করলেন। রাধাভাব এতই বড় যে ভগবানকে ঢেকে ফেল্লেন। ভগবান অপেক্ষা ভক্ত বড়। মহৎ কৃপা বলতে ভক্ত কৃপাই বুঝায়। ভ্রমর পদ্মের মধু পান করতে করতে যদি পদ্মের পাপড়ি বুজে যায়, ভ্রমর সেখানে বদ্ধ হয়, বেরুতে পারে না, যদিও ভ্রমর শক্ত কাঠ ফুটা করতে পার। যিনি সর্বশক্তিমান বিশ্বের সকলের বন্ধন মোচন করেন, তিনি মায়ের চুলের দড়ির বন্ধন খুলতে পারেন না। ভক্তের অধীনতা তিনি স্বেচ্ছায় অঙ্গীকার করেন। রাধাভাব অঙ্গীকার করে কৃষ্ণ যখন নদীয়ায় গৌর হয়ে এলেন, তখন সকলে দেখলেন প্রেমভক্তি কি বস্তু, কি অপার করুণাময় তিনি, ভক্তের জন্য কি অসীম দরদ তাঁর।

তিনি যে করুণাময়, তা ভক্তের প্রতি। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের ঠিক আগে শ্রীকৃষ্ণ দূত হয়ে গিয়েছিলেন কাছে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে। শ্রীকৃষ্ণে বন্দী করার মতলব করেছিল সে। সামান্য কিছু ঐশ্বর্য প্রকাশ করে শ্রীভগবান যখন চলে যাচ্ছেন, তখন আতিথ্য গ্রহণের প্রস্তাব করে দুর্যোধন। শ্রীকৃষ্ণ সে অনুরোধ রক্ষা করেন নি।

অন্যের বাড়ীতে লোকে খায়, দায়ে ঠেকলে অথবা প্রীতি থাকলে। দুর্যোধনের এখানে এই দুয়ের কোনটাই কৃষ্ণের নেই। দুর্যোধনের প্রতি প্রীতি নেই। নিকটে ভক্ত বিদুরের গৃহ, সেখানে গেলেন। বিদুর নেই, তার স্ত্রীকে বল্লেন,—খুব খিদে পেয়েছে। বিদুরের স্ত্রী আনন্দে আত্মহারা, ঘরে পাকা কলা ছিল, তাই ছাড়িয়ে কৃষ্ণের মুখে দেবেন, কিন্তু আনন্দে এতই বিহ্বল যে কলাগুলি ফেলে খোসাগুলি তুলে দিচ্ছেন কৃষ্ণের মুখে। কৃষ্ণ তাই পরমানন্দে খাচ্ছেন। হঠাৎ বিদুর এসে দেখে হতবাক ও পরম দুঃখিত। স্ত্রীকে কিছু বলতে শ্রীকৃষ্ণ ইশারায় নিষেধ করলেন বিদুরকে। বিদুরের স্ত্রী বুঝতে পারলে বেদনায় মৃতপ্রায় হবেন। ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্যের কোন তুলনা মেলে না।

কৃষ্ণভক্ত রাজা জয়মল্ল। প্রতিদিন সকালে কৃষ্ণের অর্চনা না করে কোন কাজ করেন না। রাজার হুকুম, তিনি যতক্ষণ ঠাকুর ঘরে থাকবেন, ততক্ষণ কেউ তাকে কোন ব্যাপারেই ডাকবেন না। কোশলরাজ তার শত্রু। এই সংবাদ জানতে পেরে একদিন খুব ভোরে জয়মল্লের রাজ্য আক্রমণ করল। রাজা জয়মল্লের আদেশ ছাড়া মন্ত্রী-সেনাপতি কেউই যুদ্ধ শুরু করতে পারছেন না। সবাই আকুল হয়ে মন্দিরের দুয়ারে এসে অপেক্ষা করছেন। বেলা ১০টায় রাজা জয়মল্ল মন্দির হতে বেরিয়ে দেখেন, মন্ত্রী-সেনাপতি সবাই তার জন্য অপেক্ষা করছেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন,—ব্যাপার কি? মন্ত্রী জানালেন, কোশলরাজ রাজ্য আক্রমণ করেছেন। ভয়ানক বিপদ, এতক্ষণ হয়তো তার সৈন্যরা রাজবাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়েছে। এমন সময় একজন এসে খবর দিল, কোশলরাজ বন্দী, তার সৈন্যর সব বিধ্বস্ত ও পরাজিত। রাজা জয়মল্ল মন্ত্রী-সেনাপতি সহ এসে দেখলেন, খবর সবই সত্য, কি করে এই অঘটন ঘটল, রাজা বুঝতে পারছেন না। কোশলরাজ বল্লেন জয়মল্লকে,—রাজা! আপনার সেই সেনাপতি কোথায়, যিনি একাই যুদ্ধ করে আমার সব সৈন্যদের পরাজিত করেছেন। জয়মল্ল শুনছেন বিস্ময়ে। কোশলরাজ ঘোড়া ও

সেনাপতির যে বর্ণনা দিলেন, তাতে রাজা জয়মল্ল বুঝলেন, তার সবচেয়ে ভাল ঘোড়াটি এবং সেনাপতি আর কেউ নয় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি পূজায় ব্যস্ত ছিলেন, রাজ্য বিপন্ন দেখে ঠাকুর স্বয়ং এসে যুদ্ধ করেছেন। কোশলরাজকে বল্লেন,—আপনি যাকে যুদ্ধ করতে দেখেছেন, তিনি আমার আরাধ্য দেবতা, আপনি ধন্য। ঘোড়াশালায় গিয়ে দেখেন, কোশলরাজের বর্ণনানুরূপ ঘোড়াটি ঘর্মাক্ত ও হাপাচ্ছে। ভগবানের অপার করুণার কথা স্মরণ করে রাজার দুইচক্ষু জলের ধারায় ভেসে গেল। শরণাগত ভক্তের তিনি যোগক্ষেম বহন করেন। ভক্তের জন্য তিনি কি না করেন, 'ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়।'

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের ভক্ত মহিমদাস। মহিম বিবাহে অনিচ্ছুক। মহিমের পিতা প্রভুকে ধরেছেন, মহিম বিবাহ না করলে বংশ রক্ষা হয় না। প্রভু আদেশ দিয়েছেন বিবাহে। প্রভুকে প্রণাম করে বিবাহ করতে রওনা হবেন। প্রভু বল্লেন,—ষ্টিমারে যাতায়াত কোর। যাবার সময় ষ্টিমারে গিয়েছে। ফেরার সময় মহিমের বাবা দেখলেন, প্রচুর যৌতুক পাওয়া গেছে, ষ্টিমারে গেলে অনেক খরচা পড়বে। মহিমকে বল্লেন, ফেরার সময় একখানা বড় নৌকা ভাড়া করে যাওয়া যাবে। প্রভুর কথা বলে মহিম আপত্তি করল। পিতা বল্লেন,—প্রভু বলেছিলেন বিপদের সম্ভাবনায়। এখন আকাশ খুব পরিষ্কার, ঝড় জলের সম্ভাবনা নেই; নদীও খুব শান্ত। পিতার অত্যধিক আগ্রহে নৌকায় ফেরায় মহিম সায় দিল। ভালোয় ভালোয় ছেলে-বৌ জিনিষপত্র সব নিয়ে বড় নৌকায় রওনা হয়েছেন। কিছু পরে আকাশের এক কোণে এক খণ্ড মেঘ দেখা গেল। ৫।১০ মিনিটের মধ্যে দেখতে দেখতে আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল, শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়। মাঝ নদীতে নৌকা। চারিদিকে নৌকা আরোহীদের হাহাকার, আর্তনাদ। আশে-পাশের বহু নৌকা ডুবে গেল। মাঝিরা বল্ল,—এই ভয়ানক তুফানে নৌকা রক্ষা করা বুঝি যাবে না। সকলে আর্তস্বরে ভগবানকে ডাকছে। মহিম আকুল হয়ে "জয় জগবন্ধু" বলে প্রভুকে স্মরণ করছে এবং ডাকছে। হঠাৎ নৌকা গেল প্রায় তলিয়ে

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল কে যেন নৌকাটিকে ঠেলে একটা চড়ায় তুলে দিল। রক্ষা পেল সবাই। ঝড়-জল থামলে নৌকা নিয়ে বাড়ীর ঘাটে এসে পৌঁছল। মহিম বাবাকে বল্ল,—প্রভুর কৃপায় রক্ষা পেয়েছি এ যাত্রা, প্রভুকে প্রণাম না করে ঘরে যাব না। প্রভুর মন্দিরে এসে মহিম দেখে দরজা বন্ধ। প্রভু আছেন ভিতরে। বার বার ডাকার পর প্রভু দরজা একটু ফাঁক করেছেন। মহিম দেখতে পেল প্রভুর হাতের অনেকখানি ছাল উঠে গেছে, রক্তাক্ত। মহিম আকুল হয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করছে কি করে অমন হল? প্রভু তখন জানালেন,—তোদের যা বলি তাতো শুনবি না, বিপদে পড়ে তখন খুব চিৎকার করবি, প্রভু রক্ষা কর, বাঁচাও। নৌকা তোদের তলিয়ে গিছল, ঠেলে তুলতে গিয়ে হাতের এই দশা হয়েছে। তাদের জন্যই প্রভুর এই কষ্ট দর্শন করে মহিম কেঁদে আকুল হল। ভক্তের জন্য ভগবান কি করেন, কি না করেন।

ভক্ত না ডাকলে ভগবান আসেন না। ব্রহ্মার বরে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু প্রায় অমর ও অমিততেজা। ব্রহ্মার সৃষ্ট কোন প্রাণী, দিনে বা রাতে, আকাশে বা মাটিতে, বা যে কোন অস্ত্র হতে, সে অবধ্য। ত্রিলোক জয় করে ইন্দ্রভবন সে অধিকার করেছে, লোকপাল ও দেবগণ তার স্তব করছেন। ভগবান আবির্ভূত হয়ে তাকে বধ করুন, এই দেবগণের প্রার্থনা। ভগবান তাদের অপেক্ষা করতে বল্লেন। দেবগণ তখন চাইলেন, প্রহ্লাদের উপর আরও ভীষণ অত্যাচার হোক, তাহলে ভগবান আর থাকতে পারবেন না। প্রহলাদের উপর অত্যাচারের জন্য ভগবান নরসিংহ শীঘ্র আবির্ভূত হয়ে বধ করলেন হিরণ্যকশিপুকে। ভক্ত তাঁর এতই প্রিয়।

বাদশা আকবর মুসলমান হয়েও হিন্দুধর্মের অনেক কিছু বিশ্বাস করতেন। তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন না—এই জগতে ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হন। যুক্তিতেও বুঝতে পারতেন না কেন নিজে আসবেন, তার কাজ করার জন্য আজ্ঞাবাহী কত দাস উন্মুখ হয়ে রয়েছে। মুসলমান ধর্মে আছে আল্লা নিজে আসেন না, দূত পাঠান।

হজরত মহম্মদ আল্লার দূত। পদস্থ হিন্দু রাজ কর্ম্মচারীরা 'ভগবান স্বয়ং আসেন' একথা বাদশা যাতে বিশ্বাস করেন, সেজন্য এক উপায় উদ্ভাবন করলেন। বাদশা মাঝে মাঝে বিকালে নৌকা করে যমুনায় বেড়াতেন পুত্র সেলিমকে নিয়ে। পুত্র সেলিম তখন ৩/৪ বছরের হবে। সেলিমের মত একটি মূর্তি তৈরী করালেন। একদিন সেলিমকে নিয়ে যমুনায় বেড়াবার কালে, বাদশার অসাক্ষাতে, সেলিমকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হল এবং তার স্থানে মূর্তিটি রাখা হল। এমন সময় আর একটি নৌকা এসে বাদশার নৌকায় এমনভাবে ধাক্কা মারল যে সেলিমের মূর্তি যমুনায় পড়ে গেল। বাদশা দেখলেন, সেলিম জলে তলিয়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঝাপ দিয়ে যমুনায় পড়ে মূর্তিটি তুললেন। সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলেন এটা মতলব করে করা হয়েছে এবং খুব বিরক্ত হলেন। সভাসদগণ বল্লেন, আগে আমাদের কটা প্রশ্নের উত্তর দিন, তারপর যা হয় শাস্তি দেবেন। এখানে আমরা এত লোক রয়েছি, মাঝিরা আছে, তা সত্ত্বেও কেন আপনি জলে নামলেন। আদেশ করলেই হোত, সেলিম জলে পড়েছে তাকে তোল। আকবর বল্লেন,—ছেলে ডুবে যাচ্ছে দেখে স্থির থাকা যায়, আদেশ করতে গেলেও কিছু সময় নষ্ট হোত। তাই নিজেই ঝাপিয়ে পড়েছি। তখন তারা বল্লেন,-এজন্যই আমাদের ভগবান নিজে এসে হাজির হন, ভক্তের বেদনায় এতই কাতর যে তাঁর হুকুম করার অবসর থাকে না। প্রহ্লাদকে মারবার জন্য অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছে, ভগবান তৎক্ষণাৎ এসে তার দেহ নিজে রক্ষা করেন। অগ্নিদেবকে 'পুড়িও না' এই আদেশ করার মত সময় পান না। আকবর বুঝলেন, আর কিছু বল্লেন না।

ভগবান বলেন,—আমি ভক্তের পশ্চাতে চলি, ভক্তের চরণ উত্থিত ধুলি গায়ে লাগাবার জন্য। আমার দেহে সর্ব জীবের স্থিতি। ভক্তের চরণধূলি যে আমার গায়ে লাগে, তাতে দেহস্থ অনেক পাপীতাপী উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। মায়ামুগ্ধ জীবের জীবনে ভক্ত কৃপা না হলে কিছুই হবার নয়।

ভগবান যখন লীলায় আসেন তখন অযাচিত করুণা করেন; যোগ্যাযোগ্য বিচার না করে ভক্তিদান করেন। বাংলাদেশের ফরিদপুর শহরের নিকটে এক বুনা পল্লী ছিল। এরা বড়লোকের, ভদ্রলোকদের ফরমাস খাটত। জমিদারদের ভাড়াটিয়া লাঠিয়াল হয়ে কাজ করতো, নানা তুক্‌তাক্‌ জানত ও লোকের রোগ সারাত। হিন্দু সমাজে এদের কোন স্থান ছিল না। সমাজের যারা নীচু স্তরের, তারাও এদের ঘৃণা করতো অস্পৃশ্য বলে। সভ্যতার আলো এদের জীবনে স্পর্শ করেনি। কাঁচা মাংস পুড়িয়ে খেত। এদের সর্দার রজনী ছিল ভয়ানক দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল। এদের পুরা গোষ্ঠীকে খৃষ্টান করার জন্য পাদ্রীরা অনেকদিন থেকে চেষ্টা করছে, খৃষ্টান হলে অনেক সুবিধাও তারা পাবে। শেষে তারা খৃষ্টান হতে রাজি হয় কারা হিন্দু সমাজে ঘৃণা তাচ্ছিল্য ছাড়া কিছুই পায় না। দিন স্থির হয়ে গেছে খ্রীষ্টান হবার। প্রভু জগদ্বন্ধু আছেন ফরিদপুরে। একজন ভক্ত প্রভুকে জানালেন, বুনারা খৃষ্টান হচ্ছে। প্রভু ডেকে পাঠালেন রজনীকে এবং বল্লেন,—কেন খৃষ্টান হবে, তোমরা তো কেউ হীন নও। তোমরা মানবজাতি, তোমরা আমার অতি প্রিয়, শ্রীহরির দাস তোমরা, হরিনাম কর, সগোষ্ঠী ধন্য হও। তোমরা আর বুনা নও, তোমরা সব মোহান্ত। প্রভুর কৃপায় সেই বুনারা মহাজাতিতে রূপান্তরিত হল। প্রভু এদের যাদের হাতে করতাল দিয়েছিলেন, যাদের হাতে শ্রীখোল দিয়েছিলেন, তারা বংশপরম্পরায় উত্তম খোলবাদক হয়। আজও তাদের 'প্রাণমাতান কীর্তনে ভক্তির উন্মাদনা সৃষ্টি হয়।

আমরা গ্রন্থে পড়েছি,—

যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নেই জাতি কুলাদি বিচার॥

প্রভু জগদ্বন্ধুর লীলায় তা অতি জীবন্ত দেখা যায়। কলকাতা বিডন স্কোয়ারের নিকট ডোম পল্লী। শিক্ষা-সভ্যতার কোন স্পর্শ লাগেনি এদের জীবনে। মদ খেত, মারধোর করত, মাতলামি করত,

কুৎসিত ছিল জীবন তাদের। প্রভু জগদ্বন্ধু এসে তাদের মধ্যে বাস করেন, হরিনাম কীর্তনের মাধ্যমে তাদের জীবনে আনেন উন্নত ভক্তি-ভাবময় জীবনের স্পর্শ। রজনীকে এনেছিলেন এখানে কীর্তন শিক্ষা দেবার জন্য। এই মহা অস্পৃশ্যকে দিয়েছিলেন গঙ্গা থেকে তার পান করবার জল আনার ভার। রজনীর নাম রেখেছিলেন—হরিদাস মোহান্ত। এদের গোষ্ঠীর সকলেই মোহান্ত, প্রভুর দেওয়া নাম।

হরিদাস প্রতিদিন কলসী নিয়ে নাম করতে করতে গঙ্গায় যেত, অত্যন্ত পরিষ্কার করে কলসী মেজে পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে জল নিয়ে আসত, সেই জল গ্রহণ করতেন প্রভু। একদিন জল আনতে যাবার পথে হরিদাস ভাবল, অনেকদিন এসেছি দেশ ছেড়ে, স্ত্রী-পুত্র সব কেমন আছে, কি ভাবে চলছে তাদের জানি না। সেদিন যথারীতিই জল নিয়ে এসেছে। এসে পৌছতেই প্রভু বল্লেন,—হরিদাস! ঐ জল সেবায় লাগবে না, পোকা পড়েছে। হরিদাস বল্ল,—রোজ যেভাবে আনি, আজও সেইভাবে এনেছি; কি করে পোকা পড়বে? প্রভু বল্লেন,—জলের পোকা নয়, মনের পোকা। তুমি দেশে যাও, ঘরের পিছনে দেখ টাকা আছে পাতায় চাপা। তা থেকে গাড়ীভাড়া নেও, আর ২০ টাকা বেশী নাও যা ইচ্ছা হয় বাড়ীর জন্য কিনে নিয়ে যেও। কয়েকদিন আগে এক মাড়োয়ারী কোন কাজের সফলতা ইচ্ছা করে মানত করে গিছল। সে মানত অনুযায়ী টাকা নিয়ে এসে অনেক ডাকাডাকি করে, প্রভু কোন সাড়া দেন না বা দরজা খোলেন না। অগত্যা প্রভুর ঘরের পিছনে টাকা পাতা চাপা দিয়ে রেখে গেছে। প্রভু যে টাকা পয়সা স্পর্শ করতেন না, সম্ভবতঃ তা সে জানত না।

রজনী দেশে এসে দেখল সবাই ভাল আছে। সারাদিন কথা-বার্তায় একরকম কাটল। রাত্রে মনে হতে লাগল কেন এলাম প্রভুর সেবা ছেড়ে; এসে তো এদের ঘাড়ে বোঝাস্বরূপ হব, না এলেই ভাল হোত, কে এনে দেবে প্রভুর সেবার জল ইত্যাদি। এসব ভাবনায় সারারাত্র ঘুম হল না। রাত থাকতে একটি মাটির কলসী নিয়ে

ছুটল, বাড়ী থেকে ৮ মাইল দূরে পদ্মা নদী। অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে জল তুলল পদ্মা থেকে। নির্জন চড়ায় বসে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল, কে তোমায় প্রভু জল এনে দেবে, তোমার জল সেবা ঠিক মত হচ্ছে কিনা, কি দুর্মতি হল তোমার সেবা ছেড়ে এলাম ইত্যাদি বলে কাঁদছে অঝোরে। হঠাৎ শুনল প্রভুর গলার স্বর, 'হরিদাস হরিদাস' বলে ডেকেছেন। রজনী ফিরে দেখে সত্যই প্রভু দাঁড়িয়ে আছেন। প্রভু বল্লেন,—হরিদাস! খুব তেষ্টা পেয়েছে জল দাও। রজনী আনন্দে বিস্ময়ে আকুল হয়ে গেল। কি করে জল দেবে গ্লাস নেই সঙ্গে। প্রভু এগিয়ে এসে হাত পেতে বল্লেন,—দাও। এক-দুই-তিনবার জল পান করলেন। তারপর হরিদাসের অশ্রুসিক্ত চোখ দুটিতে ঐ পদ্মহস্ত বুলিয়ে দিলেন। রজনী চোখ খুলে দেখল, প্রভু নেই, শূন্য চড়ায় সে একা। প্রভুর স্পর্শে দেহে তার আনন্দের শিহরণ প্রবাহিত হচ্ছে। ভক্তের জন্য তাঁর করুণা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

ভক্ত নিষ্কাম, নিজের জন্য সে কিছুই চায় না। ভগবান স্বয়ং ভক্তের মহিমা প্রকাশ করেন। গুরুদেব (ঋষি মাতঙ্গ) বলে গেছেন এই আশ্রমে শ্রীরামচন্দ্র আসবেন। শবরী প্রতিদিন রামচন্দ্রের আগমন প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করে থাকে। গুরুবাক্যে তার অটল বিশ্বাস। রামচন্দ্রের জন্য প্রতিদিন অত্যন্ত সুন্দর করে গৃহ মার্জনা করে, ফুল তুলে মালা গাঁথে, বনের সুমিষ্ট ফল নিয়ে আসে, বসবার জন্য সুন্দর আসন বিছিয়ে রাখে। এইভাবে রামচন্দ্রের স্মরণে বিভোর হয়ে প্রতিটি দিন তার কেটে যায়। এই একই ভাবে বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব চলে গেছে। এসেছে বার্ধক্য। তবু বিশ্বাসে অটল ও সেবার কার্যে নিষ্ঠাপরায়ণা সে। রামচন্দ্র এলেন সেই বনে। প্রথমে ঋষিদের সঙ্গে দেখা করে তাদের কুশল প্রশ্ন করলেন। ঋষিরা জানালেন. সবই কুশল তাদেব, কেবল পম্পা সরোবরের জল নষ্ট হয়ে অসুবিধা হয়েছে জলের। চণ্ডাল কন্যা শবরী জল স্পর্শ করায় জল নষ্ট হয়েছে। শেষে রামচন্দ্র এলেন শবরীর কুটিরে। তার পূজা ও

সেবার দ্রব্য গ্রহণ কোরলেন। বল্লেন,—পদ্মা সরোবরের জলে আর একবার তোমায় নামতে হবে। শবরী বল্ল,....আমার স্পর্শে জল নষ্ট হয়েছে, জলে নামলে আবার যদি কিছু ক্ষতি হয়। রামচন্দ্র বল্লেন,—শবরী। তা নয়, তুমি যখন জলে নেমেছিলে, ঋষিরা তখন তোমায় বারণ করায় জল নষ্ট হয়ে গেছে। এখন তুমি পুনরায় জলে নামলে জল নির্মল হবে, নাহলে এই জল পচাই থাকবে। রামচন্দ্রের কথায় শবরীর স্পর্শে জল পুনরায় স্বচ্ছ হয়ে উঠল। ভক্ত তার কত প্রিয়, ভক্তের মহিমা নিজেই ব্যাখ্যা করতে ব্যগ্র।

ভক্ত কর্তৃক ভগবানের ভজনে জগতের সবচেয়ে কল্যাণ। ভক্তের জন্ম হেতু দেবগণ, চতুর্দ্দশ ভুবন ও পৃথিবী ধন্য হন। ভক্ত হরিদাসের নির্যান কালে মহাপ্রভু বল্লেন,—

হরিদাস ছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রত্নশূন্যা হৈলা মেদিনী॥

ভগবান কাউকে পক্ষপাতিত্ব করতে চান না, সবাই তাঁর সৃষ্ট জীব, সবাই তাঁর কাছে সমান। গীতায় বলেছেন,—আমি সর্বভূতে সমান, আমার দ্বেষের পাত্র কেউ নেই, প্রিয়ও কেউ নেই (সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়—গীতা-৯/২৯), আবার বলেছেন, —যে আমার ভজনা করে আমার ভক্ত, সে আমার প্রিয় (যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ)। ভগবান-অন্ত প্রাণ ভক্তের, ভক্তকে ভগবান ভাল না বেসে থাকতে পারেন না। বাতাস সর্বভূতে সমান, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষেত্রে একথা ঠিক, কিন্তু প্রচণ্ড গরমে যখন খুব কষ্ট হতে থাকে, তখন যে পাখার নীচে বসে, তারই কষ্টের লাঘব হয়। ভক্ত ভগবানকে ভালবাসে, তাঁর দ্বারা বিশ্বের প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব। অহঙ্কারে যে জন স্ফীত, তার কল্যাণচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়; ভক্তের কাজ ভগবানের ইচ্ছার অনুকুলে। ভগবান প্রকৃত মঙ্গলময়, তাই ভক্তের নিষ্কাম কর্মই জগতের সবচেয়ে কল্যাণকর।

আপনার ভালবাসা ভগবানে অর্পণ করুন। বিষয়-আশয়,

স্ত্রী-পুত্রে যে ভালবাসা উহাই ভগবানে দিন, ভক্ত হয়ে যাবেন। ভক্তের কথা, ভগবানের ভক্ত-বাৎসল্যের কথা নিরন্তর শ্রবণ করুন। ভগবানে প্রেম জাগবে, ভক্তিলাভ হবে।

নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥

সংসারে শান্তিলাভের, জীবনে আনন্দালাভের এছাড়া পথ নেই— নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

জয় জগদ্বন্ধু! জয় মহাপ্রভু!

———

স্থান : ২৫৬, আপার সার্কুলার রোড

তাং : ১২.৮.১৯৬০

পূতনা বধ ও চৌর্য্যলীলা

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌতমোনুদৌ ॥

কোন বস্তুর বিষয়ে জ্ঞান সম্ভব হয় না, অন্ধকার থাকলে। আলো না হলে, কোথায় কি আছে জানা যায় না। জীবের চিত্তগুহায় অজ্ঞানরূপ অন্ধকার আছে। এহেতু নিত্য ও সত্য বস্তুর জ্ঞান তার জন্মে না; অনিত্যকে নিত্য ও অসত্যকে সত্য বলে বোধ হয়। ব্রহ্ম নিত্য ও সত্য, অথচ এই সংসারে আমরা এমনভাবে চলি যেন ব্রহ্ম ছাড়া আর সকলই নিত্য ও সত্য। ফলে যে বিভ্রান্তি দেখা দেয়, জীবনে তার পরিণাম ভয়াবহ ও অশেষ দুঃখকর।

দ্বাপর ও কলির সন্ধিক্ষণ। গোলোকের ঠাকুর শ্রীধাম বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হয়ে লীলা-বিহার করেছিলেন কৃষ্ণ-বলরাম-রূপে। কলিযুগে তাঁরাই এসেছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও প্রভু নিত্যানন্দ রূপে। করুণা করে এসেছেন জীবের দুঃখ বিনাশ করতে ও আনন্দ দান করতে। এই হেতু জীবের চিত্তগুহার অজ্ঞানজনিত অন্ধকার বিনাশ করছেন।

ব্রজের যিনি কেন্দ্রস্থ পুরুষ, তাঁর লীলা স্মরণ-মননই জীবের রক্ষার উপায়। 'সাধন স্মরণ লীলা'—ইহা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের উক্তি। জীব মায়ান্ধ, মায়া-মোহে মুগ্ধ হয়ে সংসারে ভ্রমণ করে ও দুঃখ ভোগ করে। ব্রজের ভগবানের উপরও আছে যোগমায়ার আবরণ, তাঁর সকল লীলাই যোগমায়ার আশ্রয়ে! ব্রজের লীলাকুঞ্জের পথ আঁধার, শ্রীকৃষ্ণও আঁধার বরণ। এত আঁধার ভেদ করে জীবের পক্ষে ব্রজের লীলারস মাধুর্য আস্বাদন সম্ভব নয়। তাই করুণা করে এসেছেন একটি আলো, গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ গৌরচন্দ্রের করুণার জ্যোৎস্না। এই করুণার আলোয় হৃদয়ের অজ্ঞান অন্ধকার দূর

হলেই ব্রজের আনন্দ-চিন্ময় রসমাধুর্য আস্বাদিত হবে। সপার্ষদ, সপরিকর গৌরসুন্দরের শ্রীচরণ বন্দনা ও কৃপা ভিক্ষা করে আমরা শ্রীভাগবতে প্রবেশের প্রয়াসী হব।

পুঞ্জীভূত কামনা হেতু মানুষের চিত্ত সদাই অশান্ত। কামনায় ঠোকাঠুকি, তাই শান্তি নেই কারও, জীবন ভরাই যেন দুঃখ। শাস্ত্রকার বলছেন,—অশান্তের সুখ কোথায় (অশান্তস্য কুতঃ সুখং)। চিত্ত যার শান্ত, তার দ্বারাই উপাসনা হতে পারে শান্তম্ উপাসীত)। শাস্ত্রের নির্দেশ—বাসনা-কামনা ত্যাগ কর, তবেই জীবনের শান্তি পাবে। কলিহত জীব আমরা, ইচ্ছা করলেও বাসনা-কামনা ত্যাগ করতে পারি না। মহাপ্রভু জানালেন,—জীব! বাসনা তোমার বহু নয়। একটাই মূল বাসনা, আনন্দলাভের ইচ্ছা। নদীর স্রোত যেমন বাধা পেয়ে বহুমুখী হয়ে বয়ে চলে, জীবের এই রস-বাসনা চরিতার্থ না হয়ে বহুমুখী হয়েছে, মনে হচ্ছে যেন বহু বাসনা—ধন, মান, যশ, সুস্বাস্থ্য দেহশ্রী, ইন্দ্রিয়সুখ ইত্যাদি। শ্রীভাগবতের প্রাণপুরুষ এক রসময়, রসিকশেখর দেবতা। জীবের চিত্তের বাসনার স্রোত যদি সেই চরণপদ্মে মিলিত হয়, তবেই সার্থকতা, তবেই শান্তি ও চির আনন্দ। কথাটা ছিল, কিন্তু মানুষ তাঁর রূপ দেখেনি। আজ মহাপ্রভুর মধ্যে তা প্রত্যক্ষ করল। সেই রূপ-স্বরূপকে দেখেছেন সকলে মহাপ্রভুর মধ্যে, তাঁর জীবনদৃষ্টে অনুভব করেছেন ভাগবতের লীলারস মাধুর্য।

গ্রন্থ ভাগবত ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতম শাস্ত্রগ্রন্থ, আঠার হাজার শ্লোক ও দ্বাদশ স্কন্ধ সমন্বিত। প্রতিটি স্কন্ধ কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত এবং তৎপুত্র জীবন্মুক্ত শ্রীশুকদেব উহা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত প্রায়োপবেশনরত মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট সাত দিন সাত রাত নিরন্তর কীর্তন করেন। প্রথম নয়টি স্কন্ধে অবতারগণের কথা ও ভক্তগণের চরিতসুধা। দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও প্রকট লীলা, একাদশে তাঁর অন্তিম উপদেশ এবং দ্বাদশে গ্রন্থের কথাভাগের পরিসমাপ্তি।

দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যলীলা সাঙ্গ করে স্বধামে ফিরে গিয়েছেন। জীবের কথা স্মরণ হতে মনে হল, এদের জীবনের দুঃখ তো দূর করা হয় নি। কেন? ভক্তিদান করা হয় নি এজন্য।

অন্তর্ধান করি কৃষ্ণ করে অনুমান॥
চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতে নাহি অবস্থান॥ চৈঃ চঃ

জগতের কোথাও সুখ নেই, শান্তি নেই। জগৎটাই যে অশান্ত। তবে এই অশান্ত জগতেই সুখ-শান্তি লাভ হতে পারে, যদি কেউ ভক্তিধনের অধিকারী হয়। তাই ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি সর্বসাধারণে বিতরণের ইচ্ছা করলেন। যাঁতায় যখন ডাল ভাঙ্গা হয়, তখন দেখা যায় দু-চারটি ডাল ভাঙ্গেনি। কি করে রক্ষা পেল তারা? যাঁতার মাঝখানের দণ্ডটিকে কেন্দ্র করে যাঁতা ঘুরছে, সেই দণ্ডের গায়ে লেগেছিল যে ক'টি ডাল, তারাই ভাঙ্গেনি। এই অশান্ত জগতও কেন্দ্রস্থ এক পুরুষকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর চরণপদ্মে যাঁর ভক্তি আছে, তিনিই কেবল এই জগতের সকল অশান্তি দুঃখ হতে রক্ষা পান। কোন নিষ্পেষণ তাঁর গাত্র ছুঁতে পারে না।

শ্রীভগবান ভক্তি দান করবেন, কিন্তু ভক্তি পাবেন কোথায়? উহা তো ভক্তের সম্পদ, সুতরাং ভক্তের দ্বারস্থ হতে হবে। কোন্ ভক্তের কাছ থেকে নেবেন, যা সকল জীবের প্রয়োজন মেটাতে পারবে। নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, হনুমান যাঁর দিকেই তাকান, মনে হয়, এঁদের ভক্তি তো কৃপালব্ধ, নিজস্ব নয়। প্রেমভক্তির উৎস, অসীম অনন্ত-অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে এক শ্রীরাধারাণীর। ঐ ভক্তি শ্রীকৃষ্ণের চাই। কিন্তু এই ভক্তি শ্রীরাধা ও গোপীগণের প্রাণের সম্পদ, তাঁরা প্রাণ থাকতে দেবেন না। যদি না দেন, তবে চুরি করেই নেবেন স্থির করলেন ভগবান।

বিরাট ভাণ্ডার, ব্রজগোপীদের প্রেমভাণ্ডার চুরি করতে গেলে চুরি বিদ্যায় পাকা হওয়া চাই। ছোট ছোট চুরি থেকেই বড় চুরির দক্ষতা লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাই জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই চুরি শুরু করেছেন।

অনেক অপেক্ষার পর পুত্র হয়েছে, আনন্দ কেবল নন্দ-যশোদার নয়, গোকুলের সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, সবাই ছুটেছে নন্দ মহারাজার পুত্র দেখার জন্য। গোকুলের সকলেই সজ্জন, তাইতো ভগবান এসেছেন তাদের মধ্যে। যিনি একবার মাত্র ঐ পুত্রটিকে দেখলেন, তার নয়ন চুরি হয়ে গেল, যিনি একটু মনঃসংযোগ করে দেখেছেন তার মন চুরি হয়ে গেল (নয়ন-মানসচৌরঃ পশ্যতাং সজ্জনানাং)। নয়ন-মন চুরি গেল কেমন কথা? সকলে যে নয়ন ও মন নিয়ে সংসার করেছিলেন এতদিন, এখন ঐ ছেলেকে দেখার পর সে নয়ন-মন আর নেই, কৃষ্ণময় হয়ে গেছে। পরে কৈশোর বয়সে ব্রজগোপীগণের বলয়-বসন চুরি করে তাঁদের আত্মসাৎ করেন (বলয়-বসনচৌরঃ ব্রজগোপীজনানাং)।

'পূতনা-দুরতি চৌরঃ।' রাক্ষস কুলে জন্ম পূতনার। ভয়ঙ্কর মায়াবিনী রাক্ষসী সে। কংস পাঠিয়েছে, গোকুলের সব সদ্যোজাত শিশুদের মারবার জন্য। পূতনা প্রথমেই নন্দালয়ে এসে উপস্থিত। দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার পরিহিতা পরমাসুন্দরী এক রমণীর বেশ ধারণ করে ঢুকেছে। তার বেশভূষা অঙ্গকান্তিতে চারিদিক উজ্জ্বল হয়েছে, মা যশোদা ও আর সকলেই মনে করেছেন বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী বা আর কোন দেবী হবেন। গোপাল রয়েছে মা যশোদার কোলে। পূতনা এসে মা যশোদাকে বল্ল,—কি অপরূপ সুন্দর তোর ছেলেটি! হাত বাড়িয়ে গোপালকে কোলে তুলে নিল। কারও মনে কোন সন্দেহ জাগল না। খুব আদর ও প্রশংসা করে পূতনা নিজের বিষ-মাখান একটি স্তন গোপালের মুখে দিল। শিশু-স্বভাবে গোপাল কচি দুই হাতে স্তনটি ধরে মুখে দিয়ে পান করতে লাগল। স্তন-দুধের সঙ্গে পূতনার প্রায় আকর্ষণ করল। যন্ত্রণায় পূতনা ছট্‌ফট্ করছে, প্রাণ তার বেরিয়ে যাচ্ছে। বুক হতে সজোরে গোপালকে সরাবার চেষ্টা করে পারল না। গোপালকে বুকে নিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তার ভয়ানক রাক্ষুসী মূর্তি প্রকাশ হয়ে পড়ল। মুহূর্তে বিগত-প্রাণ হয়ে বিশাল দেহটি অনেকখানি জায়গা জুড়ে বহু

গাছপালা ভেঙ্গে নিয়ে ভীষণ শব্দে পড়ে গেল। গোপালের অমঙ্গল আশঙ্কায় মা যশোদা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। অন্যান্য গোপমায়েরা ছুটে গেলেন গোপালকে দেখতে। শিশু সম্পূর্ণ অক্ষত, পূতনার বুকের উপর খেলা করছে! তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে মা যশোদার নিকট গেলেন।

গোপগণ পূতনার বিশাল দেহটি দেখে খুব ভীত হল। তাকে মৃত জেনে কুঠার দিয়ে দেহটি খণ্ড খণ্ড করে আগুনে পুড়িয়ে দিল। তখন তার ধোঁয়া বহুদূর ছড়িয়ে পড়ল এবং সুগন্ধে গোকুলের আকাশ বাতাস ভরে গেল। মহা পাপীয়সী পূতনা, তার দেহ হতে দুর্গন্ধ বের হওয়াই স্বাভাবিক। প্রকৃত সত্ত্বগুণীর দেহ হতেই এমন সুগন্ধ বের হতে পারে। বস্তুতঃ পূতনার আর কোন পাপ নেই, তার পুঞ্জীভূত পাপরাশি সব শ্রীহরি হরণ করেছেন। হরির স্বভাব হরণ করা, পূতনার ছিল কেবল পাপরাশি, তাই হরণ করলেন। পাপ না থাকলে কোন সিদ্ধলোকে তার গতি হতে পারে। কিন্তু সে লাভ করল বৈকুণ্ঠে ধাত্রীগতি। এজন্য চাই বিশেষ কিছু পুণ্য। পূতনার কি পুণ্য আছে যদি প্রশ্ন করেন গোপালকে, সে বলবে—পূতনা আমায় কোলে করে আদর করেছে, আমার রূপগুণের প্রশংসা করেছে, মায়ের মত স্তন দিয়েছে, এসব তার বিশেষ পুণ্য। কিন্তু এসবই তার ছলনা, আসল উদ্দেশ্য শিশুর প্রাণ নাশ করা। সুতরাং বৈকুণ্ঠগতি তো নয়ই, ছলনার জন্য শাস্তি পাওয়া উচিত।

শাস্তি হল না কেন যদি গোপালকে জিজ্ঞাসা করেন, সে বলবে—এসব বিচারের সময় ছিল না। যেমন, কোন শিশু যদি প্রদীপের আগুনে হাত দেয়, তার হাত পুড়ে যাবে, যদি অগ্নিদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, শিশু অবোধ না জেনে হাত দিয়েছে, আপনি কেন হাত পোড়ালেন? অগ্নিদেব বলবেন,—বিচার করার সময় ছিল না, আগুনে হাত দেবা মাত্র হাত পুড়ে গেছে। বস্তুর শক্তি বিচার-বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে না (ন হি বস্তুশক্তিঃ বুদ্ধিং অপেক্ষতে)। না জেনে বিষ খেলেও বিষের ক্রিয়া হবে। পূতনা মাতৃমূর্তি ধরে এসে কোলে

নিয়েছে, আদর করেছে, স্তন দিয়েছে। মা যশোদার অনুকরণে স্তন দিয়েছে। তাই তৎক্ষণাৎ সে পেয়েছে বৈকুণ্ঠে ধাত্রীগতি। তার কপটতার বিচারের সময় মেলেনি।

শ্রীভগবানের একটি বিশেষ গুণ 'হতারিগতিদায়কত্ব'। শত্রুভাবে মারতে এসে যে ভগবানের হাতে মরে, সে উত্তমা গতি লাভ করে। রাম-রাবণের যুদ্ধে রাবণ নিহত হলে দেবতারা খুব উৎফুল্ল হয়ে সকৃতজ্ঞ চিত্তে রামচন্দ্রকে অভিনন্দিত করেন এবং তাঁর কিছু সেবা করে ধন্য হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রামচন্দ্র ইন্দ্রকে বল্লেন, বানরেরা যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে সীতা উদ্ধারের জন্য। সীতার উদ্ধার এখন হয়েছে, যদি মৃত বানরদের প্রাণদান সম্ভব হয়, তবে একবার সীতাকে দর্শন করে ধন্য হোত। ইন্দ্র আকাশ হতে যুদ্ধক্ষেত্রের উপর অমৃতবারি বর্ষণ করলেন। বানর সেনারাই বেঁচে উঠল, রাক্ষসেরা বাঁচল না। রামচন্দ্র বিস্মিত হয়ে ব্রহ্মাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রহ্মা জানালেন,—রাক্ষসেরা যুদ্ধে এসেছে রাম নাম করতে করতে, কোথায় রাম, রামকে মার, তাই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারা সব মুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু বানরেরা রাবণের নাম, রাক্ষসদের চিন্তা করতে করতে মরেছে, এঁদের মুক্তি হয় নি ; যারা মুক্ত নয়, তারাই বেঁচে উঠবে অমৃতবারিতে। পুতনার ক্ষেত্রে দেখা গেল, তিনি পরমশত্রুকেও বৈকুণ্ঠে গতি দিয়েছেন। যাঁরা তাঁর ভক্ত, প্রিয়, তাঁদের প্রাপ্তি যে কত আনন্দরস মাধুর্যপূর্ণ তা বর্ণনার অতীত।

মা যশোদা, মা রোহিণী যেখানে, পূতনাও সেই বৈকুণ্ঠে স্থান পেল। গোপাল যাঁদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, সেই মায়েরা এবং শিশুঘাতিনী হিংস্রস্বভাবা পূতনা একই স্থানে ভাবতে ভক্তপ্রাণে বড়ই ব্যথা লাগে। শিশু গোপাল কেন এমন ঘটাল যদি জানতে চান, সে বলবে, পূতনাকে দানটা একটু বেশী হয়ে গেছে। প্রথম দান কিনা, তাই বেশী হয়েছে। নন্দনন্দন গোলোক হতে এসেছেন ভূলোকে আনন্দামৃত ভাণ্ডার নিয়ে। পূতনাই প্রথম এল যমুনা পার হয়ে গোপালের কাছে, পূতনাই প্রথম যাত্রী। পূতনার করুণা লাভ

দুষ্কৃতকারী ভজনহীন সকলের প্রাণেই আশার সঞ্চার করবে। ভগবান অসীম অনন্ত, তাঁর করুণাই ভগবত্তা, এজন্য করুণাও অন্তহীন, সীমাহীন। পূতনার প্রতি করুণা হইতেই জানা গেল কি অপরিসীম দয়া তাঁর, এমন আর কে আছেন যাঁর শরণ লইব? (কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম)।

প্রথম পরিবেশনে বা দানে দানের মাত্রা একটু বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। নিমন্ত্রণ বাড়ী, প্রথম পংক্তিতে খেতে বসেছেন বিশিষ্ট অতিথিরা। খাবার পরিবেশন হচ্ছে। বাড়ীর কর্তা দেখতে এলেন পরিবেশন ঠিক হচ্ছে কিনা! তিনি দেখলেন কারও পাতে কিছু খাবার পড়ে নেই। পরিবেশকদের কাজে তিনি খুসী হলেন না। বল্লেন,—এটা প্রথম পংক্তি, সব বিশিষ্ট অতিথি, খাবার রয়েছে প্রচুর, বেশী বেশী করে পাতে দাও, পেট ভরে খেয়েও যাতে পড়ে থাকে, পাত খালি দেখে মনে হচ্ছে কারও খেয়ে তৃপ্তি হচ্ছে না। খাবার কম পড়বে কিনা, তা ভাববার এখন সময় নয়, শেষের দিকে দেখা যাবে। প্রথম দান বলে পূতনার প্রাপ্তিটাও বেশী হয়ে গেছে!

পূতনার প্রাপ্তিতে আমাদের লাভ আছে। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে দুই প্রকারের লোক আসেন। যাঁদের নিমন্ত্রণ হয়েছে, আর যারা অনিমন্ত্রিত, অনাহুত, রবাহুত, গরীব-দুঃখী যাদের সচরাচর খাওয়া জোটে না পেটভরে। নিমন্ত্রিতেরা আসেন নিশ্চিন্ত মনে। অনাহুত-রবাহুতের দল আসে ভয়ে ভয়ে। বাড়ীর কর্তা যদি কৃপণ হয়, নিমন্ত্রিতেরাই যদি ভাল করে খেতে না পান, তবে ঐ রবাহুতেরা হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। আর যদি শোনে, কর্তা খুব উদার, নিমন্ত্রণ পত্র দেখছেন না, যে আসছে সেই পেট ভরে খেতে পাচ্ছে, তবে খুব উল্লসিত হয়। নিমন্ত্রণ-বাড়ী আসার পথে খোঁজ করে, কর্তা কেমন ব্যক্তি। পূতনা ব্রজের প্রথম যাত্রী। জীব আমরা নিরানন্দ, আনন্দময় ভগবানকে আমরাও চাই। কি করে তাঁকে পাব, তাঁর কাছে যাব, আমাদের নেই সাধন-ভজনের নিমন্ত্রণ পত্র। সারাজীবন পাপ করেছি, পুণ্য কিছুই নেই। সেই আনন্দধামের ভগবান, ব্রজেশ্বর

কেমন তিনি, পরমদয়ালু কিনা, আমরাও জানতে চাই। পথে দেখা পূতনার সঙ্গে, সে ফিরছে আনন্দধাম হতে, আমরা চলেছি সেই ধামের দিকে। অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করছি পূতনাকে, আমাদের কোন ভরসা আছে কি, আনন্দময় ভগবানের কৃপা কি হবে আমাদের উপর ?

পূতনা তার জীবন দিয়ে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। আমাদের বলছে,—নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে যান। সাধন-ভজন নেই, তার জন্য কিছু ভাববেন না। যদি বলেন,—হীন কুলে জন্ম, সারাজীবন অখাদ্য খেয়েছি, কোন পুণ্য কাজ করিনি, অনেকের সর্বনাশ করেছি। তবে বলি, শুনুন আমি পূতনা, হীনতম রাক্ষসকুলে আমার জন্ম, আমার থেকে খারাপ বংশ হয় না। আমার খাদ্য কি শুনুন—ছোট শিশুদের হত্যা করে তাদের রক্ত পান, এর থেকে কুখাদ্য আর হতে পারে না। ক্ষেত্রবিশেষে পেশা খারাপ হতে পারে, সেজন্য অন্যায় কাজও করতে পারে, এখন আমার পেশা কি শুনুন। মহারাজ কংস কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছি সদ্যোজাত নিষ্পাপ শিশুদের হত্যার জন্য। এর থেকে খারাপ পেশা কারও হতে পারে না। জীবনে ছলনা-কপটতা করেছেন অনেকে, আমি মায়ের মূর্তি ধরে, শিশুর যেটি পরম নির্ভর-স্থল সেই মাতৃস্তনে বিষ মাখিয়ে স্তন্যদান ছলে হত্যার চেষ্টা করেছি শিশুকে। এমন জঘন্য কপটতা আর কি হতে পারে ? পাপের সীমা নেই আমার, সেই আমি পেয়েছি বৈকুণ্ঠে ধাত্রীগতি। এমন দয়াল কি কেউ কোথায় দেখেছে বা শুনেছে ? সুতরাং নির্ভাবনায় চলে যান আপনারা। আর পাপ কোরব না, এই সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যান নন্দনন্দনের দিকে।

পূতনার মত এমন জীবন্ত ভরসার বাণী আর কি কেউ শুনিয়েছে আমাদের ? আলো এলে অন্ধকার তৎক্ষণাৎ চলে যায়। শত বছরের আঁধার-ঘর মুহূর্তে আলোকিত হয়ে ওঠে। নন্দকুলচন্দ্রের দিকে ফিরুন, তাঁকে জীবনের ধ্রুবতারা করে চলুন, আপনার জন্ম-জন্মান্তরীন অজ্ঞান-অন্ধকার, পুঞ্জীভূত পাপরাশি সব দূরে যাবে, জীবন আনন্দে পূর্ণ হবে। পূতনা এই ভরসা দিচ্ছে সকলকে।

'ব্রজে প্রসিদ্ধ নবনীত চৌরঃ।' নন্দের আঙ্গিনা, ব্রজের মায়েরা প্রত্যহ সকালে গোপালকে দেখতে আসেন। সখাদের নিয়ে গোপাল যে সব দৌরাত্ম্য করেছেন তাদের বাড়ীতে তারও নালিশ জানান মা যশোদার কাছে। ক্ষীর ননী ছানা ব্রজের ঘরে ঘরে চুরি করে খায় গোপাল। চুরির অভিযোগ শুনে মা যশোদা বিশ্বাস করতে পারেন না। ছেলের সম্বন্ধে অভিযোগ শুনতেও মায়ের ভাল লাগে না। নন্দরাজার নয় লক্ষ গরু, সব দুধ ঢেলে দিলে গোকুল ভেসে যাবে। মা গোপালকে যতদূর পারেন প্রাণ ভরে খাওয়ান। এরপর অন্যের বাড়ী চুরি করে খাবে কেন? ছোট ছেলে কত খেতে পারে? মা ভাবেন, তার সর্বাঙ্গসুন্দর ছেলেকে হিংসা করেই সবাই মিথ্যা অভিযোগ করছে।

মা যশোদা জিজ্ঞাসা করেন এক ব্রজমায়ীকে,—তোর বাড়ী চুরি করেছে, না দলে পড়ে এসেছিস্। সে বল্লে,—হাঁ, চুরি করেছে। মা সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করেন,—কখন চুরি করেছে, দিনে না রাতে? সে বল্লে,—দিনে। মা যশোদা ভাবেন, রাত্রে বল্লে তো মিথ্যা ধরা পড়ে যেত, কেন না গোপাল সারারাত আমার কোলের কাছে ঘুমায়। মা যশোদা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন,—তোরা দিনে বাড়ী থাকিস না? সেই মা বল্লে,—থাকি, বাড়ীর লোক সব তাড়িয়ে চুরি করে। গোপাল ও সখারা সব বাছুরের দড়ি খুলে দেয়, (বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে) আর বলে তোদের পাওনা দুধ খা গিয়ে। তখন বাছুরগুলি গরুর দুধ যদি খেয়ে নেয় তবে বিকালে আর দুধ হবে না। মথুরার হাটে বিক্রী করতে না পারলে সংসার চলবে কিসে? তাই বাড়ীর সবাই ছুটি বাছুরদের ধরবার জন্য। সেই অবসরে খেয়ে যায়।

মা যশোদা বল্লেন,—সবাই না গিয়ে একজন কাউকে পাহারা রাখতে পারিস্। সে বল্লে,—কেউ পাহারা থাকতে চায় না। একদিন এক বুড়ীকে পাহারা রেখে সবাই বাছুর ধরতে গেছি, সেই সময় গোপাল সঙ্গীদের নিয়ে ঘরের ক্ষীর-ননী-দই খেয়ে এক ভাড় দই এনে বুড়ীর গালে বেশ করে মাখিয়ে সকলে মিলে হাততালি

দিচ্ছে এবং চীৎকার করে বলছে,—বুড়ী চোর বুড়ী চোর, আর দোষ হয় আমাদের। তাদের চীৎকারে লোক জমে গেল এবং সবাই জানল বুড়ী চোর। সেই থেকে বুড়ীর নাম হয়ে গেল 'চোর বুড়ী'। সেজন্য আর কেউ পাহারায় থাকতে চায় না।

মা যশোদা বল্লেন, তোরা গালি দিস্ না কেন? তাহলে লজ্জা হবে, আর চুরি করতে আসবে না। মায়েরা বল্লেন, আমরা গালি দি কিন্তু তাতে কোন কাজ হয় না। তোর ছেলে কেবল হাসে (ক্রোশ-সপ্তাত হাস), গালিগুলি মনে হয় ফিরে এসে আমাদের গায়ে লাগে, যেমন কোন বস্তু কাউকে দিলে যদি সে না নেয়, তবে দাতারই রয়ে যায়। তখন রাগে দুঃখে আমাদের গা জ্বলে যায়।

মা যশোদা বল্লেন,—ছোট ছেলে সব, তোরা খাবার জিনিস উঁচুতে রাখিস না কেন, তাহলে আর হাতে নাগাল পায় না। আর এক মায়ী তখন বলছেন,—উঁচুতেই রাখি সকলে, কিন্তু তাতেও রক্ষা নেই। গোপাল যদি দেখে খাবার উঁচুতে রয়েছে, তখন একজনের পিঠে আর একজন ওঠে, তাতে হাত না পেলে আর একজন তাঁর কাঁধে ওঠে। তাতেও যদি নাগাল না পায়, তখন পাঁচুনী দিয়ে ঘা মেরে হাড়ির তলা ভেঙ্গে ফেলে তার নীচে দাঁড়িয়ে 'হাঁ' করে খাবে। খাবেই খাবে। নারায়ণের ভোগের জন্য যা পৃথক করে রাখা হয়, সেইটাই খাবে। ঠাকুরের সেবার বিঘ্ন হয়। ছোট ছেলেরা যদি কেবল খাবার জন্য চুরি করতো, তাহলে নালিশ করার মত ছোট মন নয় আমাদের। নিজেরা খাবে, আবার বাঁদরদের খাওয়াবে, খেতে খেতে বাঁদরদের পেট ভরে যায়, তখন আর খেতে চায় না। তোর ছেলে বলে, তোদের জন্য চুরি করলাম, আর তোরা খাবি না? বানরের উপর রাগ করে আমাদের হাড়িগুলি সব ভেঙ্গে ফেলে। রোজ রোজ হাড়ি ভাঙ্গলে কি করে আমাদের চলে?

মা যশোদা বল্লেন, তোরা দ্রব্যাদি আঁধার কোঠায় রাখিস না কেন? এক মা তখন বলছেন, আঁধার কোঠাতেই তো রাখি। কিন্তু জগতে এমন কোন আঁধার কোঠা আছে কি যেখানে তোর ছেলে প্রবেশ

করলে আর আঁধার থাকে ? ছেলেকে কেন অলঙ্কার পরাস্, জানি না। এতে তোর ছেলের কিছু শোভা বাড়ে না, অলঙ্কারের শোভাই হয়। তোর ছেলের অঙ্গজ্যোতি অলঙ্কারে প্রতিফলিত হয়ে আঁধার কোঠা আলোকিত হয়। তাতে চুরির সুবিধাই হয় (ধ্বান্তাগারে ধৃতমণিগণং)।

এত চুরির অভিযোগ শুনে মা যশোদার কিছু বিশ্বাস হয়ে থাকবে। আবার ভাবছেন, একদিনে এত বাড়া চুরি করে খেয়েছে, তাই বা কি করে সম্ভব। মা তখন বল্লেন,—যদি একদিন ধরে আনতে পারিস্, তবে বিশ্বাস করতে পারি। তখন আর এক গোপমায়ী বলছেন,—একদিন তোর ছেলে ঘরে ঢুকছে, ঘরে আমি আছি বুঝতে পারেনি। ধরে ফেলেছি। জিজ্ঞাসা করলাম,—কে তুই ? কিছুতেই নাম বলে না, বল্ল—বলাই দাদার ভাই। বল্লাম,—তোর নাম জানিস্ না ? ভাবছিস বলাই দাদার গায়ে খুব জোর, তার নাম করলে ছেড়ে দেব, তা হচ্ছে না। তা এখানে ঢুকেছিস কি করতে ? গোপাল বল্ল, আমাদের বাড়ী মনে করে ঢুকেছি ! বল্লাম,—দুষ্ট ছেলে, নিজের বাড়ী তুমি চেন না ? তা ননীর হাড়িতে হাত কেন ? বল্ল — পিপড়ে তাড়াচ্ছিলাম। বল্লাম,—শয়তানি বুদ্ধি তো খুব। আমার বাড়ী, চোর কোথাকার। গোপাল বল্ল,—এটা আমার বাড়ী, তুই চোর। আমি যত বলি—আমার বাড়ী, তুই চোর। গোপাল তত জোরের সঙ্গে বলে,—"এটা আমার বাড়ী, তুই চোর।" তখন আমার বুক কাঁপতে লাগল, মনে হল সত্যই ওর বাড়ী, আমি চোর। গীতা গ্রন্থে শ্রীভগবান বলেছেন,—সংসারে ভগবানের জিনিষ তাঁকে অর্পণ না করে যে খায়, সে চোর। (তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ)।

উপানন্দের স্ত্রী তখন বল্লেন, তোর ছেলে চুরি করে খায়, নারায়ণের সেবার দ্রব্যই খায়, দেখেও কিছু বলি না। একদিনের ঘটনা বলি। গোপাল সন্তর্পণে ঘরে ঢুকেছে, নারায়ণের পূজার খাবার দ্রব্য নিয়ে খাচ্ছে। এমন সময় ঘরে ঢুকে ওকে ধরে ফেলেছি। বল্লাম, আজ

তোকে ধরে নিয়ে যাব তোর মার কাছে। গোপাল বল্ল, আজকের দিনটা ছেড়ে দাও, আর কোন দিন চুরি করব না। আমি বল্লাম, আজ তোর মাকে দেখাব তুই চুরি করে খাস, কিছুতেই ছাড়ব না। তোর মাকে চুরির কথা বল্লে৷ আমলই দেয় না, ভাবে মিথ্যে দোষারোপ করি তোর নামে। তারপর গোপালকে জোর করে কোলে তুলে, বেশ করে কাপড়ে জড়িয়ে নিলাম, যাতে তাঁর সখারা দেখতে না পায়। শীঘ্র যশোদার কাছে এসে বল্লাম, আজ তোর ছেলের চুরি ধরেছি ওকে ধরে নিয়ে এসেছি। যশোদা বল্লে, তোর কি মাথা খারাপ, এই একটু আগে গোপালকে খাইয়ে কাপড় পরিয়ে সখাদের সঙ্গে খেলতে পাঠালাম, এর মধ্যে তোর বাড়ী গেল, চুরি করল, তুই ধরে নিয়ে এলি, এসব আবোল তাবোল কি বকছিস্। তখন গোপালকে জড়ানো কাপড় খুলতে খুলতে বল্লাম, বিশ্বাস না হয়, এই দেখ। যশোদা দেখলেন, সে গোপাল নয়, উপানন্দের ছেলে। আর বল্লেন, গোপালের উপর রাগে চোখের মাথা খেয়েছিস, নিজের ছেলে চুরি করে তাও চোখে দেখিস না, দোষ দিস্ গোপালের নামে। উপানন্দের স্ত্রী অবাক বিস্ময়ে তাকান একবার ছেলের দিকে, একবার বস্ত্রাঞ্চলের দিকে। ভেবে কিছু স্থির করতে পারেন না। ধরে আনলাম গোপালকে, আর এখানে এসে দেখছি নিজের ছেলে। ছাড়া পেয়ে ঐ ছেলে ছুটল মাঠের দিকে যেখানে সব খেলার সঙ্গী। লজ্জা-দুঃখ-অপমানে ও মা যশোদার বাক্যবাণে জর্জ্জরিতা উপানন্দের স্ত্রীর মনে হচ্ছে, মাটির সঙ্গে মিশে যেতে, মুখ নীচু করে বেরিয়ে গেলেন। পথে দেখা হল গোপালের সঙ্গে। গোপাল বল্লে,—শোন মন দিয়ে, আজ ধরে নিয়ে গিছলে, তোমার ছেলের চেহারা ধরেছিলাম, আর যদি কোনদিন ধর, তবে তোমার স্বামীর চেহারা ধরব। সেজন্য যত কিছু উৎপাত করে, সব মুখ বুজে সহ্য করি, কিছু বলি না।

ব্রজের মায়েরা যখন এই সব চুরির কথা বর্ণনা করছেন, তখন সেখানে গোপালও দাঁড়িয়ে শুনছে। ভগবান ভক্ত নারদকে বলেছেন, আমি বৈকুণ্ঠে বা যোগীদের হৃদয়ে থাকি না, আমায় ভক্তেরা যেখানে

রূপ-গুণ-লীলা কথা কীর্তন করে, আমি সেখানেই থাকি (নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ, মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ)। ব্রজমায়েদের এই সকল অভিযোগ শুনে গোপালের অবস্থাটা কেমন হয়েছে, দেখুন। লজ্জা-ভয়-ক্রোধ-সংকোচ মেশান এক অপরূপ শোভা মুখখানিতে। মা যশোদার সামনে নালিশ না করলেই এই শোভা হয় না। ঐ মুখশ্রী দর্শনের জন্যই মায়েদের যত নালিশ।

গোপালের মুখ দেখে মা যশোদার মনে হয়েছে, গোপাল কিছু অন্যায় করে থাকবে, আর ভয়ও পেয়েছে। তখন সব মায়েদের বল্লে, তোরা সব ঘরে যা, আমি গোপালকে শাসন কোরব, এখন থেকে বাড়ীর বাইরে যেতে দেব না। মার নিষেধে গোপাল যদি সত্যই আর না আসে, তবে তাদের দুঃখের অন্ত থাকবে না। তারা চান, গোপাল আসবে, চুরি করে খাবে এবং তারাও মার কাছে এসে নালিশ করবেন। তাই সব মায়েরা ধীরে ধীরে যাচ্ছেন, ইশারায় গোপালকে জানিয়ে যাচ্ছেন তাদের বাড়ী যাবার জন্য, তাদের ইঙ্গিত আবার মা যশোদা বুঝতে না পারেন, সেদিকেও লক্ষ্য রয়েছে। এই চোরের জন্য বৃন্দাবনের সকলেই সর্বক্ষণ উন্মুখ হয়ে আছে।

জন্ম হতেই যিনি চুরি শুরু করেছেন, বয়সে তিনি যে পাকা চোর হয়ে উঠবেন, তাতে সন্দেহ কি? কিশোর বয়সেও চুরির অভ্যাস যায় নি। তখন দৃষ্টি পড়েছে বড় চুরির দিকে, একেবারে রাজভাণ্ডারে। বৃষভানুরাজনন্দিনীর প্রেমের ভাণ্ডারটি চুরি করতে চান। কেন, কি করবেন সেই প্রেম-সম্পদ নিয়ে? ব্রজগোপীর বিশুদ্ধ প্রেম যা ত্রিজগতে দুর্লভ, তাই জগৎজীবকে দান করবেন। এই প্রেম না হলে তো জীবের জীবনের দুঃখ চিরতরে দূর করা যাবে না।

চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতে নাহি অবস্থান॥ চৈঃ চঃ

প্রেমভক্তি বস্তুটি শ্রীকৃষ্ণে নাই। যেমন পতিভক্তি পতির নয়, উহা স্ত্রীর। পিতৃভক্তি পিতার নেই, আছে পুত্রের। প্রেমভক্তি

আছে ব্রজগোপীদের। মহাভাবময়ী শ্রীরাধা হচ্ছেন এই ভক্তির মূল উৎস। জগতের অগণিত জীবকে বিতরণ করতে বিরাট ভাণ্ডার চাই, তা আছে শ্রীরাধার হৃদয়েই। ওই সম্পদেই তাঁরা কৃষ্ণকে বশীভূত করেছেন। এই সম্পদ তাঁরা হাতছাড়া কখনই করবেন না। তাই পাবার প্রকৃষ্ট উপায়, হরণ করা, চুরি করা।

চুরির সবচেয়ে সুন্দর সুযোগ উৎসবের দিন, সেদিন সকলেই কিছু না কিছু ব্যস্ত ও অন্যমনস্ক থাকে। রাসোৎসব রজনী। ব্রজগোপীগণ সকলেই মত্ত রাস-রসের আনন্দে। আজ কোথাও তেমন সাবধানতা নেই। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেমরস ভাণ্ডারটি চুরি করলেন। পাছে ধরা পড়েন, এজন্য শ্রীরাধার অঙ্গকান্তিখানিও চুরি করলেন ও তা দিয়ে নিজ অঙ্গ ঢাকলেন! চুরি করে যদি বাড়ীর কর্তার পোষাক পরে বেরুনো যায়, তবে দ্বারে যে পাহারা থাকে তার আর সন্দেহ হয় না। ব্রজগোপীরা যখন জানলেন চুরি গেছে শ্রীরাধার ভাবসম্পদ, সবাই চোরের খোঁজে ছুটলেন। ছোট চুরিতে পুলিশে খবর দেয়, কিন্তু বড় চুরি হলে গোয়েন্দা নিয়োগ করে। ব্রজগোপীরা সব ছদ্মবেশী গোয়েন্দা, সবাই বেরিয়ে পড়েছেন, পুরুষ বেশে চোরের সন্ধানে। তাঁদের প্রেমভাণ্ডার নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ কোথায় লুকালেন। শ্রীরাধার প্রেমভাব ও অঙ্গকান্তি নিয়ে তিনি এসেছেন নবদ্বীপে।

রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ চৈঃ চঃ

রায় রামানন্দ হয়ে এসেছেন, শ্রীরাধার এক অন্তরঙ্গা সখি। গোদাবরী নদীর তীরে বিদ্যানগরে গৌরসুন্দর মিলিত হন রায় রামানন্দের সঙ্গে। উভয়ে দশ দিন নিভৃতে আলাপের পর, রামানন্দের দৃষ্টিতে গৌরহরির রাধাকৃষ্ণ মিলিত স্বরূপ ধরা পড়ে যায়। সংশয়ান্বিত হয়ে তিনি মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করেন,—

পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুই গোপরূপ ॥

তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তায় গৌরকান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা॥
তাহাতে প্রকট দেখি সংবশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল নয়ন॥ চৈঃ চঃ মধ্য-৮

রায় রামানন্দ বল্লেন,—প্রভু। এর কারণ তুমি অকপটে বল। মহাপ্রভু দেখলেন, তিনি ধরা পড়ে যাচ্ছেন। তখন ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য বলছেন,—ও কিছু নয়, তুমি মহাভক্ত, তাই যেখানে সেখানে তোমার ইষ্টদেবের দর্শন হতে পারে, আসলে তোমার চোখ খারাপ, তাই এরকম দেখছে।

প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ য়িশ্চয়॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাহা তাহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্তি।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্তি॥
রাধা কৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাহা তাহা রাধাকৃষ্ণ তোমার স্ফূরয়॥ চৈঃ চঃ মধ্য-৮

রায় রামানন্দ অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সহজে ভোলবার পাত্র নন। মহাপ্রভুকে তিনি বল্লেন,—তোমার এসব ফাঁকিতে আমি ভুলব না, তুমি ধরা পড়ে গেছ, এখন সত্য করে বল, তোমার স্বরূপ কি—

রায় কহে, প্রভু তুমি ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজ রূপ না করিহ চুরি॥
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিছ অবতার॥
নিজ গূঢ় কার্য তার প্রেম আস্বাদন।
আনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥

মহাপ্রভু দেখলেন, আর লুকান সম্ভব নয়, সত্যিই ধরা পড়ে

গেছেন, তখন রায় রামানন্দকে নিজ স্বরূপটি দেখালেন। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীরাধার মিলিত তাঁর স্বরূপটি,...

তবে হাসি প্রভু তারে দেখাল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাবে দুই একরূপ ॥

ঐ দুই স্বরূপের মিলনমাধুর্য দর্শনে আনন্দের আতিশয্যে রামানন্দ মূর্চ্ছিত হলেন। রামানন্দ কৃষ্ণকে ও শ্রীরাধাকে পৃথক দেখেছেন, ইহাদের মিলিত স্বরূপ গৌরসুন্দরকে দর্শন করেছেন, কিন্তু কি করে রাধা ও কৃষ্ণ মিলিত হ'য়ে গৌর হচ্ছেন, সেই ভবন্ মিলনটি যার সর্বাতিশায়ী মাধুর্য, উহা দর্শনেই মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হলেন। মহাপ্রভু স্পর্শ দ্বারা তাঁকে চেতনযুক্ত করলেন এবং বল্লেন,—আমার তত্ত্বলীলারস কিছুই তোমার অজানা নয়, তোমার কাছে আমার গোপনীয় কিছু নেই, লুকাতে চেষ্টা করলেও তুমি প্রেমবলে তা জানতে পার। তুমি ছাড়া আর কেউ আমার এই স্বরূপের দর্শন পায়নি, আর বল্লেন,—

'গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্র সুত বিনা তেহ না স্পর্শে অন্য জন ॥
তার ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজ মাধুর্যরস করি আস্বাদন ॥' চৈঃ চঃ

চোর যদি ধরা পড়ে যায়, তবে ঘুষ দিয়ে গোয়েন্দা-পুলিশের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করে। মহাপ্রভু সেইরূপ তাঁর স্বরূপ মাধুর্য দর্শন করিয়ে বল্লেন—তোমার এই দর্শনের কথা কারও কাছে প্রকাশ কোর না। রামানন্দ তার কোন উত্তর করলেন না। শ্রেষ্ঠতম অধিকারী জেনেই শ্রীস্বরূপ দামোদরের নিকট প্রকাশ করেন। তিনি যোগ্যপাত্র ও পরমপ্রিয় শিষ্যস্থানীয় রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে উক্ত ঘটনা সবিস্তারে বলেন। রঘুনাথের কৃপায় উহা অবগত হন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ। তিনি আপন গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে অত্যন্ত মধুরভাবে উহা বর্ণনা করেছেন। তাইতো সকলে জানতে পেরেছেন।

এইভাবে প্রেমভক্তি লাভ করে শ্রীকৃষ্ণ আপন ভক্তিদানের ইচ্ছা পূরণ করেন। শ্রীরাধার প্রেমভাণ্ডার চুরি করে, রাধার ভাব-কান্তি নিয়ে অযাচিত অযোগ্যজনকেও অকাতরে প্রেম বিলিয়েছেন। প্রেম-বস্তুটি নিজের নয়, উহা শ্রীরাধার। কৃষ্ণ কৃপা বললে শ্রীরাধার কৃপাই বুঝায়। অপারকরুণাময়ী শ্রীরাধা, তাঁর কৃপা হলেই জীব কৃষ্ণদাস স্বরূপে স্থিত হয়ে কৃষ্ণসেবা ভাগ্য পেতে পারে।

কৃষ্ণপ্রেম অতি মূল্যবান বস্তু। দান করলেও গ্রহণ করা কঠিন। যেমন রাজা 'হাতি' দান করছেন, কিন্তু কেউ দান নিতে এগিয়ে আসছে না, সবাই ভাবছে নিজেরাই পাই না পেটভরে খেতে, তা হাতি নিয়ে খাওয়াব কি? রাজা যদি হাতির সঙ্গে হাতির খোরাকের ব্যবস্থাও দিয়ে দেন, তখন ঐ দান গ্রহণ করতে কারও আপত্তি হবে না। অপার্থিব ব্রজের প্রেম দান করেছেন, সঙ্গে দিয়েছেন কৃষ্ণনাম, যাতে প্রেম প্রাপ্তি ও রক্ষা দুইই হয়।

'নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসার।' চৈঃ চঃ

সে যুগে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রধান প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেছেন, গৌর হেন দাতা হয়নি, আর হবে না। আমার সর্বস্ব হরণ করেছে ঐ গৌর চোর, এমন কি সন্ন্যাস ধর্ম পর্যন্ত। তাই এখন 'সব ছেড়ে দিয়ে হরি হরি বলে নাচতে বাসনা হতেছে।'

জয় গৌরহরি! জয় বন্ধুহরি!

———

স্থান : ভিমুদার আখড়া হাওড়া
তাং : ৬ই আগষ্ট, ১৯৬০ (ঝুলন পুর্ণিমা)

শ্রীগৌরতত্ত্ব মাধুরী

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ মন্ত্রে গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিতানন্দ প্রভু দুই-জনকে বন্দনা করে বলেছেন—উভয়ে সূর্য-চন্দ্র তুল্য, পরম মঙ্গলদাতা ও অজ্ঞানরূপ তমোনাশক, একই কালে গৌড়দেশে যুগপৎ উদিত হয়েছেন। বস্তুতঃ শ্রীগৌর ও নিতাই-এর আবির্ভাব একই কালে নয় বা একই স্থানে নয়। গৌরসুন্দর জন্মেছেন নবদ্বীপে ১৪৮৬ খৃষ্ট অব্দে। এর এগার বছর পূর্বে রাঢ়দেশে বীরভূম জেলার একচাকা গ্রামে নিত্যানন্দের আবির্ভাব। তবে কি গ্রন্থকারের বর্ণনা মিথ্যা? না, তা নয়। পরমনিষ্ঠাবান ভক্ত বৈষ্ণব কবিরাজ গোস্বামীর বক্তব্যে মিথ্যার কোন আভাস বা অবকাশ নেই। উপরন্তু গ্রন্থখানি বৃন্দাবনের শ্রীমদনমোহনজীর কৃপায় ও বৃন্দাবনের ভক্ত বৈষ্ণবগণের আগ্রহে লিখিত। তবে এই ঘটনা উক্ত দুই প্রভুর প্রথম মিলনমাধুর্য ধ্যানে দর্শন করে লিখেছেন।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পিতৃপিণ্ডদান উপলক্ষ্যে গয়ায় গিয়েছিলেন। সেখানে শ্রীঈশ্বর পুরীজীর নিকট দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করেন। ফিরলেন যখন, দেখা গেল সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ। পূর্বের পাণ্ডিত্যের গৌরব, ঔদ্ধত্যের ভাব একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে। সেখানে জন্ম নিয়েছে এক দিব্য উন্মাদ, যিনি কৃষ্ণপ্রেমে সদাই মাতোয়ারা। আহার, নিদ্রা, দেহাভিনিবেশ বিন্দুমাত্র নেই। রাত্রদিন 'হা কৃষ্ণ, দেখা দেও' বলে ক্রন্দন ও অশ্রুধারার বিরাম নেই। ক্রমে কৃষ্ণ-উন্মাদনা কিছু প্রশমিত হয়েছে, সব ভক্ত-পার্ষদগণকে আকর্ষণ করেছেন, বহুদূর দেশ হতে

এসে তাঁরা নবদ্বীপে সমবেত হচ্ছেন। কৃষ্ণ-অভিন্ন নাম-সংকীর্তন প্রবর্তন করেছেন। সর্বপ্রকার বিক্ষুদ্ধভাব জয় করে ঘরে ঘরে সংকীর্তনের রোল উঠছে। প্রতিদিন রাত্রে মহাপ্রভু ভক্তগণ সহ শ্রীবাস অঙ্গনে একত্রিত হয়ে নাম সংকীর্তন আস্বাদন করছেন। ভক্তগণের আনন্দের হাট পূর্ণ হয়েছে।

গৌরসুন্দর কিন্তু প্রায়ই 'হা নিতাই, হা নিত্যানন্দ' বলে ক্রন্দন করেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীবৃন্দাবন দাসজী বর্ণনা করেছেন,—

মিলিলা সকল ভক্ত বই নিত্যানন্দ।
নিত্যানন্দে না হেরিয়া কান্দে গৌরচন্দ্র ॥

ভক্তগণ বুঝতে পারেন না, মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন—কে এই নিত্যানন্দ? মহাপ্রভু বলেন,—সে এক বিরাট পুরুষ, শীঘ্রই তিনি নবদ্বীপে আসবেন। তখন দেখবে কি আনন্দ হয়। নাম-প্রেমের জোয়ারে সব ভেসে যাবে। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের মধ্যে এ পর্যন্ত দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। মিলনের পুর্বে বিরহের ক্রন্দন পূর্বরাগ বিরহ।

নিতাই-এর বালক বয়স। সেই সময় শঙ্করারণ্য নামে এক সন্ন্যাসী এসে তাঁকে পিতামাতার কাছ থেকে ভিক্ষা করে নিয়ে যান। বহু তীর্থ একত্র পর্যটন করার পর সেই সন্ন্যাসী মরদেহ ত্যাগ করে নিত্যানন্দে লীন হন। নিতাই শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণে ব্রজে এসেছেন। এসে জানতে পারলেন, কৃষ্ণ এখন নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছেন গৌরসুন্দর রূপে। মিলনের আকুল আগ্রহে ব্রজ ছেড়ে চলেছেন নবদ্বীপে। গৌরসুন্দরের জন্য তিনিও পূর্বরাগ বিরহের বেদনা বুকে নিয়ে চলেছেন।

একদিন সকালে মহাপ্রভু ভক্তদের বল্লেন,—ভোর রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, সেই বিরাটপুরুষ নিত্যানন্দ বিরাট এক তালধ্বজ রথে আমার গৃহের সামনে এসে নেমেছেন। জিজ্ঞাসা করছেন,—এই গৃহ কি গৌরসুন্দরের? আমি বেরিয়ে আসতে বল্লেন,—কাল তোমাতে আমাতে হবে মিলন। গৌরহরি ভক্তদের বল্লেন,—আমার বিশ্বাস,

তিনি নবদ্বীপে এসেছেন, তোমরা সকলে খুঁজে দেখ, তিনি কোথায় আছেন।

ভক্তেরা বেরিয়ে পড়ছেন এক এক দল, এক এক দিকে। কিন্তু সকলেই ফিরে এসে জানালেন,—নবদ্বীপে তেমন কেউ আসেন নি। মহাপ্রভু তখন বল্লেন,—এস সব আমার সঙ্গে। সকলকে নিয়ে নন্দনাচার্যের গৃহে এলেন, যেখানে নিত্যানন্দ এসে রয়েছেন অতি সঙ্গোপনে। সেইখানে ঘটে দুই প্রভুর প্রথম মিলন। উহাই ধ্যাননেত্রে দর্শন করে কবিরাজ গোস্বামী উক্ত মঙ্গলাচরণ মন্ত্রে বর্ণনা করেছেন।

নবদ্বীপ ছোট শহর। অথচ কোন ভক্তই খুঁজে পেলেন না নিত্যানন্দকে। শেষে মহাপ্রভু সকলকে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করালেন নিত্যানন্দের সঙ্গে। ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মহাপ্রভুর লীলায়। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীবৃন্দাবনদাসজী সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন ইহার,—

বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য জানায় যারে সে জানিতে পারে॥

ঐ গ্রন্থেই বর্ণনা করেছেন নন্দনাচার্যের গৃহে দুই প্রভুর প্রথম মিলনের মাধুর্যটি।

রসনায় লেহে যেন দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায় ঘ্রাণ॥

গভীর স্নেহ অতি নির্মল, রসনার দ্বারা লেহন করে স্নেহ প্রকাশ করে। দুই প্রভুকে দর্শন করে মনে হচ্ছে, যেন রসনা উভয়ের প্রতি উভয়ের গাঢ় নির্মল ভালবাসা প্রকাশ করছে। উভয়ে উভয়কে দর্শন করছেন, দেখে মনে হচ্ছে, উভয়ে উভয়ের মাধুর্য সুধা পান করছেন। দু'জনের বাহুগুলি দেখে মনে হচ্ছে, উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করার জন্য তৎপর। উভয়ের নাসিকা যেন উভয়ের অঙ্গ সৌরভের ঘ্রাণ গ্রহণ করছেন। প্রথম মিলনের এই মাধুর্য যা ভক্তগণ আস্বাদন করেছেন, উহাই কবিরাজ গোস্বামী দর্শন করেন ধ্যাননেত্রে।

সূর্য-চন্দ্র অন্ধকার বিনাশ করে। গৌর-নিতাই অভিনব সূর্য-চন্দ্র

কারণ তাঁরা যে অন্ধকার বিনাশ করেছেন, সেই অন্ধকার পার্থিব চন্দ্র-সূর্য দূর করতে সক্ষম নয়। জীবের চিত্তে অজ্ঞানতা অন্ধকার আছে, যেজন্য জীব ঈশ্বরকে জানতে পারে না এবং মায়ার কবলে পড়ে অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করে। সেই অজ্ঞানতা অন্ধকার বিনাশ করে তাঁরা দুই ভাগবতের সঙ্গে জীবের অন্তরঙ্গ পরিচয় দান করিয়াছেন,—

দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥ চৈঃ চঃ

গৌর ও নিতাই—এই দুই স্বরূপের মধ্যে কে সূর্য ও কে চন্দ্র তা বোঝা কঠিন। লৌকিকে চন্দ্র-সূর্যের তফাৎ এই. চন্দ্রের নিজস্ব আলোক নেই, সূর্যের আলোকে সে আলোকিত। এই দুই চন্দ্র-সূর্যের মধ্যে কে কাকে প্রকাশ করেন, আলোকিত করেন বা কে কাকে চালান, তা স্থির করা সহজ নয়। নিত্যানন্দ সম্বন্ধে গৌরহরি রাঘব পণ্ডিতকে বলেছেন,—

রাঘব তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই ॥ চৈঃ ভাঃ

খুব গোপন বিষয় অত্যন্ত আপন জনকেই বলা যায়। কিন্তু নিজ গোপ্য এমনই বস্তু যা নিজের মধ্যেই থাকবে, অত্যন্ত আপনজন স্ত্রী-পুত্রের নিকটেও প্রকাশ করা যাবে না। নিত্যানন্দের স্বরূপ মহাপ্রভুর নিজগোপ্য। তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। নিতাই সম্বন্ধে আবার বলেছেন মহাপ্রভু,—

আমার সকল কার্য নিত্যানন্দ দ্বারে।
সেই আমি করি যা নিতাই করান আমারে ॥ চৈঃ ভাঃ

গৌরসুন্দরের করুণায় যেমন নিত্যানন্দকে পাওয়া যায়, নিতাই-এর কৃপা না হলে গৌরসুন্দরকে পাওয়া যায় না। উভয়ে একই বস্তু, একই স্বরূপ—কোন পার্থক্য নেই। শ্রীবৃন্দাবনদাসজী লিখেছেন,—

এক বস্তু দুই ভাগ ভক্তি বিলাইতে।
গৌরচন্দ্রে জানি সবে নিত্যানন্দ হৈতে ॥ চৈঃ ভাগবত

যিনি গৌরহরিকে খুব ভক্তি করেন, অথচ নিত্যানন্দকে উপেক্ষা

করেন, তার গৌরহরিতে ভক্তি দৃঢ় হয় না বা ভক্তি রক্ষা করা সম্ভব হয় না। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী নিজ ভাইকে এ-বিষয়ে সাবধান করে বলেছেন,—

দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ।
নিত্যানন্দে না মান তোমার হবে সর্বনাশ ॥ চৈঃ চঃ

বস্তুতঃ ঘটেছিল তাই। নিত্যানন্দের ভক্তের প্রতি অবজ্ঞার ফলে গৌরহরিতে তার যে ভক্তি বিশ্বাস ছিল, উহাও নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং সূর্য ও চন্দ্র নিতাই-গৌর দু'জনেই।

গৌর-নিতাই আবির্ভূত হয়ে কি করেছেন? অত্যন্ত সংক্ষেপে অত্যন্ত সুন্দর উত্তর দিয়েছেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। জীবের চিত্ত গুহার অজ্ঞান-অন্ধকার নাশ করে দুই ভগবতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার বা অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটিয়েছেন। এক ভাগবত, ভাগবত শাস্ত্রগ্রন্থ। উহা খুব প্রাচীন এবং ব্রজের যে প্রেম-রস-মাধুর্য উহাতে বর্ণিত হয়েছে, উহার যথার্থতায় মানুষের সন্দেহ জেগেছিল। মহাপ্রভু ভাগবতের রসমাধুর্য নিজের লীলাময় জীবনে জীবন্ত করে দেখিয়েছেন এবং ভক্তগণ উহা আস্বাদন করেছেন। ভাগবত মূর্ত হয়েছে গৌরলীলায়।

আর ভাগবত হচ্ছেন ভক্ত। ভজ্ ধাতু হতে ভক্তি। জীবনের প্রতিটি ক্ষণ যাঁরা ভগবদ্-ভজনে ডুবে আছেন, যাঁরা ভজন ছাড়া আর কিছু জানেন না, সমস্ত জীবনই ভজনময়, এমন ভক্ত ত্রিকালে দুর্লভ, সেইরূপ ভক্ত-পার্ষদদের মহাপ্রভু নিয়ে এসেছিলেন, সেই পরম ভাগবতগণকে দেখে মানুষের জীবন সার্থক হয়েছিল।

ভাগবত শাস্ত্রের মূল কথাটা কি? জীব তুমি দুঃখী। অন্যান্য শাস্ত্র বলেছেন, তোমার সব দুঃখ দূর হবে ও জীবন আনন্দপূর্ণ হবে, যদি আনন্দময় ভগবানের নিকট যেতে পারে, যদি তাঁকে লাভ করতে পার। ভাগবত শাস্ত্র বলেছেন,—হে কলিহত জীব! ভগবানের কাছে যাবার ক্ষমতা তোমার কোথায়? ভগবান নেমে এসেছেন তোমার নিকটে। তোমার কি ক্ষমতা আছে ভগবানকে ডাকার? তিনি তোমায় ডাকছেন, মধুর স্বরে সর্বভূতের মনোহরণকারী বংশী ধ্বনি

করে ডাকছেন। সংসারের কর্মকোলাহলে কর্ণ তোমার বধির, তাই শুনতে পাও না। সংসার থেকে একটু সরে এসে কান পেতে শোন। ছেলে এসেছিল মেলায় বাবার সঙ্গে। ভিড়ের চাপে কখন ধরা-হাত গেছে খুলে জানতে পারে নি। এখন বাবাকে হারিয়ে বড়ই বিপন্ন সে। একা বাড়ী ফিরে যেতে পারবে না। আকুল হয়ে 'বাবা, বাবা' বলে চীৎকার করে কাঁদছে। শুভাকাঙ্ক্ষী একজন বল্লেন,—খোকা, মেলায় এসেছে অসংখ্য তোমার মত ছেলের বাবা। 'বাবা বাবা' বলে ডেকে কোন লাভ হবে না। বরং শোন চুপ করে, তোমার বাবা ডাকছেন তোমার নাম ধরে। তোমায় হারিয়ে তোমার বাবাও ভয়ানক বিপন্ন। তোমাকে না নিয়ে তিনি বাড়ী ফিরতে পারবেন না। এই অভিনব সংবাদ শুনলো ছেলে যে, তাকে হারিয়ে বাবাও বিপন্ন। ভাগবতের অভিনব সংবাদ এই—ভগবান জীবের দুঃখে কাতর, আকুল হয়ে তিনি ডাকছেন কাঁদছেন জীবের জন্য ('উচ্চৈঃস্বরে কান্দে প্রভু জীবের লাগিয়া')। ভাগবতের বার্তা অনেকদিনের। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে লোকের মনে হয়তো সন্দেহ জেগেছিল। মহাপ্রভুর আগমনে ভাগবতের মন্ত্রাক্ষর জীবন লাভ করল।

অন্যান্য শাস্ত্রে অধিকারী-অনধিকারীর বিচার আছে। সবাই যে অধিকারী তা নয়। স্ত্রীলোক, শূদ্র অনধিকারী। ব্রাহ্মণ জন্ম মাত্র শূদ্র, উপনয়ন সংস্কারের পর নিত্য গায়ত্রী মন্ত্র জপ করলে হবে দ্বিজ, তারপর নিত্য বেদাধ্যয়ন করলে বিপ্র, শেষে ব্রহ্মকে জানলে পরে হবেন ব্রাহ্মণ। ভাগবত বল্লেন,—আমার কাছে অনধিকারী কেউ নেই, সবাই অধিকারী। কিসের ভিত্তিতে ভাগবত একথা বল্লেন? বল্লেন এজন্য যে, ভগবান লাভ করতে যে বস্তুর দরকার, তা সকল জীবের আছে। কি সেই বস্তু যা সকলের আছে এবং যা দিয়ে ভগবান লাভ করা যায়? তা হচ্ছে, হৃদয়ের শুদ্ধ ভালবাসা এবং ইহার দ্বারা ভগবানকে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়—ইহাই ভাগবতের মহতী বার্ত্তা। কিন্তু জীবের হৃদয়ের ভালবাসা তো শুদ্ধ নয়। বিষয়-সুখ, ইন্দ্রিয়ের ভোগ-সুখ, নাম-যশ-অর্থ প্রতিপত্তির জন্য লালসাই জীবের

স্বাভাবিক। ঈশ্বরে শুদ্ধ ভালবাসা কোথায়? শ্রীভাগবত বলেছেন—এই ভোগ-সুখ-রূপ মলিন ভালবাসার মধ্যেই শুদ্ধ ভালবাসা আছে। যেমন ময়লা জলের মধ্যেকার ময়লা যদি ফিলটার করে আলাদা করা যায়, তবে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায়, সেইরূপ ভালবাসার মধ্যে যে মলিনতা রয়েছে উহা দূর করতে পারলে, শুদ্ধ ভালবাসাই থাকবে। ভালবাসার এই মলিনতা দূর হবে কিসে? নিরন্তর ভাগবত কথা, শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্তনে চিত্তের মলিনতা চলে যাবে ও কৃষ্ণপ্রেম লাভ হবে।

নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥

বেদ-উপনিষদে শ্রীভগবানকে রসস্বরূপ (রসো বৈ স) বলে উল্লেখ করলেও শ্রীভাগবতেই আমরা প্রথমে দেখতে পাই তিনি রসিক, রসমাধুর্য আস্বাদন করেন, তিনি নৃত্য-গীত-পরিহাস বিশারদ। রস-আস্বাদনের জন্য ভগবানের যদি লোলুপতা না থাকে, তবে তিনি রস-আস্বাদন করবেন কেন? জগতে ভগবানের আবির্ভাবের কারণ গীতায় ভগবান বলেছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

—অর্থাৎ সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীর বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে আসেন। এই সব কাজগুলি জগতের প্রয়োজনে, সুতরাং বহিরঙ্গ প্রয়োজন। এই কাজগুলি ভগবানের অংশ বা কলায় সম্পন্ন হতে পারে, স্বয়ং ভগবানের না এলেও চলে। তাঁর আবির্ভাবের পিছনে অন্তরঙ্গ কোন প্রয়োজন, নিজস্ব কিছু ইচ্ছা পূরণের তাগিদ আছে কিনা তা প্রকাশ করেন নি।

শ্রীভগবানের এই অন্তরঙ্গ প্রয়োজনের দিকটি উদ্‌ঘাটন করেছেন বৈষ্ণব আচার্যগণ। ভগবানের রস-স্বরূপতার দু'টি কার্য—আনন্দের আস্বাদন ও আনন্দের বিতরণ। সমস্ত জগৎ ব্যাপার সম্পন্ন হয় তাঁর এক পাদ বিভূতিতে (একাংশেন স্থিত জগৎ—গীতা) বাকি তিন অংশে তিনি আনন্দ আস্বাদন করেন। অফুরন্ত আনন্দ আছে তাঁর

মধ্যে। বাড়তি টাকা থাকলে লোকে যেমন বিলাসিতা করে, অফুরন্ত আনন্দ হেতু ভগবান আনন্দের বিলাস করেন। এই আনন্দের বিলাসই তাঁর লীলা। এই স্বরূপের দিকে দৃষ্টি করে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেছেন,—'সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন'। লীলায় যখন আসেন তখন তাঁর গূঢ় প্রয়োজন—আত্ম আস্বাদন, আত্ম বিনোদন। আনন্দঘন পুরুষের কাজই হচ্ছে আনন্দের আস্বাদন ও আনন্দের বিতরণ। যখনই আস্বাদন, তখনই তাঁর বিতরণ। তাঁর পাওয়াই দেওয়া, দেওয়াই পাওয়া। একটি উদাহরণ দিলে মনে হয় বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। গ্রামের জমিদারের কোন পুত্র ছিল না। অনেক কাল পরে বহু প্রত্যাশার শেষে একটি পুত্র হয়েছে। 'জমিদারের খুব আনন্দ। পুত্রের অন্নপ্রাশন উৎসব খুব ঘটা করে সম্পন্ন হবে। গ্রামাঞ্চলের সকলকে নিমন্ত্রণ করেছেন। কাঙাল, গরীব, দুঃখী সকলের জন্য আজ অবারিত দ্বার। প্রচুর ভাল খাবার ও দান সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাঙ্গাল-দুঃখী যারা প্রাণভরে ভাল খাবার খাচ্ছে, পোটলা বেঁধে আবার খাবার নিয়ে যাচ্ছে বাড়ী এবং কাপড়-টাকা-পয়সা দানসামগ্রীও পাচ্ছে। পেট ভরে যাদের খাবার জোটে না, তারা এত ভাল খাবার ও দান সামগ্রী পেয়ে ভাবছে, জমিদার কত দয়ালু। আসলে জমিদার খাওয়াচ্ছেন নিজের আনন্দে, একমাত্র ছেলের অন্নপ্রাশন, এত লোক আসছে, খাচ্ছে, দানসামগ্রী পেয়ে আনন্দ করতে করতে ফিরে যাচ্ছে, এতেই জমিদারের আনন্দ। তারা খেতে পায় না, অভাবগ্রস্ত সেজন্য তিনি খাওয়াচ্ছেন না। খাওয়াচ্ছেন নিজের আনন্দে, গরীব-দুঃখী যারা খাবার ও দান সামগ্রী পাচ্ছে তারা দেখছে করুণা।

ভগবান যখন রস আস্বাদন করেন, তখনই বিতরণ করেন। যাঁরা পেয়ে যায়, তাঁরা করুণাই দেখে। যখন আনন্দ আস্বাদন করেন, তখন তিনি রসিক ; যখন আনন্দ বিতরণ করেন, তখন করুণ। ফুল ফুটছে আপন আনন্দে, আপনি নিকটে থেকে তার সৌরভ লাভ করে আনন্দিত হচ্ছেন। ভগবান লীলা করছেন নিজের আনন্দে, তার কণা

যাঁদের ভাগ্যে লাভ হচ্ছে তাঁরা দেখছেন করুণাই। ভগবান জীবের দুয়ারে কেঁদে বেড়াচ্ছেন, এও আনন্দের আস্বাদন। সীতাকে হারিয়ে রামচন্দ্র বনে বনে কেঁদে বেড়াচ্ছেন, এ লীলাও তাঁর আনন্দের লীলা। তাঁর দিক দেখলে, দেখি রসিক। জীবের দিক দেখলে, দেখি করুণ। যখন রস আস্বাদন করেন, তখন রসিক। আর যখন রসের নির্যাস বা পরম পরাকাষ্ঠা, ব্রজের প্রেমরস-মাধুর্য আস্বাদন করেন তখন, রসিক-শেখর। আর যখন সেই ব্রজপ্রেম, রাগমার্গের ভক্তি বিতরণ করেন, তখন পরম করুণ। প্রেম-পুরুষোত্তম শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব রহস্য উদ্ঘাটনে এই নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে,—

রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হয় ইচ্ছার উদ্‌গম॥
প্রেমরস নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে বিতরণ॥

রস আস্বাদনের জন্য দু'য়ের প্রয়োজন, রস ও রসিক, আস্বাদ্য ও আস্বাদক। পরমতত্ত্ব কিন্তু এক এবং দ্বিতীয়রহিত (একমেব অদ্বিতীয়ম্)। একই স্বাভাবিক। দুই হয়েছেন ইচ্ছায়, আত্ম-আস্বাদনের প্রয়োজনে। একই তত্ত্ব দুই হয়েছেন—'রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি।' জোর করে দুই রূপ ধরে না রাখলে এক হয়ে যান। নিত্যকাল ধরে দুই আছেন। যখনই এক, তখনই দুই। আবার যখন দুই, তখনও এক। এ এক অচিন্ত্য তত্ত্ব।

রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রের প্রমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥ চৈঃ চঃ আদি-৪র্থ

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য অনন্যসাধারণ, নিজ মাধুর্যে নিজেই মুগ্ধ হন।

বৃন্দাবনে একদিন শ্রীকৃষ্ণ স্নান করে ফিরছেন। দেওয়ালের মণিভিত্তিতে আপন অঙ্গের ছায়া পড়েছে। প্রথমে বুঝতে পারেন নি নিজের ছায়া। দেখছেন, মাধুর্যের ঘনীভূত মূর্তি। অবাক হয়ে ভাবছেন, এ মূর্তি কার? এর মাধুর্য আমার চিত্তকে আলোড়িত করছে, ইচ্ছা হচ্ছে এঁকে সবলে জড়িয়ে ধরে এঁর মাধুর্য ভোগ করি। পরে বুঝলেন, দেওয়ালে প্রতিবিম্বিত মূর্তি তাঁর-ই। ম্যাজিশিয়ান খেলা দেখিয়ে অন্যকে চমৎকৃত করেন, নিজে মুগ্ধ হন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অনন্যসাধারণ চারটি মাধুর্য, যথা রূপ মাধুর্য, লীলা-মাধুর্য, বেণু-মাধুর্য ও প্রেম-মাধুর্যে তিনি নিজেই মুগ্ধ হয়ে যান। নিজের বেণুর গীত স্তব্ধ হয়ে নিজে শুনছেন। লীলার জন্য, আত্ম-আস্বাদনের জন্য তিনি দুই হলেন, শ্রীরাধা হলেন।

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥ চৈঃ চঃ আদি-৪র্থ

রস-সম্ভোগের ক্ষেত্রে দু'টি সত্তা বিদ্যমান—একটি রসের বিষয় অর্থাৎ যাকে ভোগ করা হয়, অপরটি রসের আশ্রয় অর্থাৎ যিনি ভোগ করেন। কৃষ্ণ হলেন রসের বিষয়, কৃষ্ণ-মাধুর্য আস্বাদন করেন শ্রীরাধা। শ্রীরাধা হলেন রসের আশ্রয়। রস-সম্ভোগকালে শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারেন, তাকে আস্বাদন করে শ্রীরাধা যে পরমানন্দ ভোগ করেন, তার কিঞ্চিৎ মাত্রও তাঁর ভাগ্যে ঘটে না। সুতরাং রসের ক্ষেত্রে তিনি হেরে যান। তাই তাঁর ইচ্ছা জাগে শ্রীরাধার মত আনন্দ সম্ভোগের। কিন্তু সকল সময়েই তিনি রসের বিষয়। রসের আশ্রয় না হতে পারলে ঐ মাধুর্য ভোগ করা সম্ভব হবে না। দেহ-ইন্দ্রিয়-সর্বসত্তা দিয়ে যে তাঁকে আস্বাদন করে, তাঁর অর্থাৎ শ্রীরাধার দেহ-ইন্দ্রিয়-সর্বসত্তা পেলে তবেই ঐ আস্বাদন সম্ভব। মোট কথা, শ্রীকৃষ্ণ যদি পূর্ণরূপে শ্রীরাধা হয়ে কৃষ্ণ-মাধুর্য ভোগ করতে পারেন, তবেই বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

সেই প্রেমের রাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমের আমি হই কেবলি বিষয়॥
বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটি গুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥
আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়। চৈঃ চঃ আদি-৪র্থ

শ্রীকৃষ্ণের রাধা হওয়ার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপে। এক (কেবল কৃষ্ণ) থাকলে রসবাঞ্ছা পূর্ণ হচ্ছে না। আবার দুই পৃথক (রাধা ও কৃষ্ণ) থাকলেও বাঞ্ছা পূরণ হচ্ছে না, আশ্রয় জাতীয় সুখ ভোগ হচ্ছে না। এখন দুই হয়ে যদি পুনরায় এক হন, দু'য়ের বৈশিষ্ট্য সেখানে বিদ্যমান থাকে, তবেই ঐ মাধুর্যের ভোগ বা বাঞ্ছা পূরণ সম্ভব হতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোঁসাই ব্রজেন্দ্র কুমার।
রসময় মূর্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।

শ্রীগৌরসুন্দরে দুই স্বরূপ (রাধা ও কৃষ্ণ) মিলিত হয়ে এক হয়েছেন, অথচ ঐ দুই স্বরূপের মাধুর্য লুপ্ত হয় নি। কখনও কৃষ্ণ এবং কখনও রাধাভাব প্রকটিত।

কৃষ্ণভাবে কাঁদে গোরা রাধে রাধে বলি।
রাধাভাবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ফুকারে আকুলি॥

প্রধানতঃ শ্রীরাধার দিব্য ভাবই গৌরসুন্দরে দৃষ্ট হয়। অন্ত্যলীলায় শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ ভাবই মহাপ্রভুর উপজীব্য।

শ্রীরাধার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
এই মত প্রলাপ চেষ্টা প্রভুর রাত্রদিনে॥

পৃথক হয়ে তারপর যে একত্ব তাতে আশ্রয়ের আশ্রিত ভাবেই আস্বাদনের চমৎকারিত্ব। সকল ভক্তই ভগবানের মাধুর্য আস্বাদন করেন। সকলের আস্বাদন একরূপ নয়। শ্রীহনুমানজীর রামচন্দ্রকে আস্বাদন ও শ্রীসীতার আস্বাদনের চমৎকারিত্বে পার্থক্য অনেক। 'কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়'। পৃথিবীর বহু স্থান হতেই

সূর্যের উদয় দর্শন করা যায়, যেমন সমুদ্রের তীর হতে বা পাহাড়ের উপর হতে। কিন্তু দার্জিলিং-এর টাইগার হিল হতেই সর্বাপেক্ষা সুন্দর সূর্যোদয় দর্শন করা যায়। সাতটি বর্ণের খেলা যেন পৃথক ভাবেই দৃষ্ট হয়। সেইরূপ কৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদনের শ্রেষ্ঠতম ভূমি শ্রীরাধা।

কৃষ্ণ রাধার ভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। নিজ মাধুর্য সম্যকরূপে আস্বাদনের জন্য। কৃষ্ণ ছিলেন রসের বিষয়, এখন নিজ মাধুর্য আস্বাদনের জন্য শ্রীরাধার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। শ্রীরাধার মধ্যে মূর্ত হয়েছেন নিজে। একের (রাধার) অন্তরে অন্যে (কৃষ্ণ) প্রবেশ করেছেন। বাইরে একেবারে এক, একটুও বোঝার উপায় নেই, অথচ ভিতরে দুই হয়ে আছেন। যিনি যাঁর ধ্যান করেন, তিনি তাঁর মত হয়ে যান। সাধক সাধনা করতে করতে উচ্চ হতে উচ্চতর, উচ্চতম ভূমিতে উন্নীত হন ও শ্রীভগবানের তুল্যতা প্রাপ্ত হন (মদ্ভাবমাগতা)—ইহা শ্রীগীতার এক বিরাট সংবাদ। ভগবান ভক্তের ধ্যান করতে করতে ভক্ত হয়ে যান। শ্যামসুন্দর রাধার ধ্যান করতে করতে রাধা-ই হয়ে গেছেন। গীতার বিরাট সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ইহা ভাগবতের অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী ও মধুরতম সংবাদ—ভগবান সাধনা (করুণারূপ) করতে করতে একেবারে মানুষ হয়ে আসেন, তখন মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা ও করুণায় ছড়াছড়ি।

ব্রজের নিভৃত নিকুঞ্জের মিলিত মাধুর্য, গাঢ় মিলনে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের একীভূত বিগ্রহ আজ নদীয়ার পথে পথে। চলেছেন গৌরহরি যেন একেবারে শ্রীরাধা, সেই ভাব সেই রূপ। এমন কি 'হা কৃষ্ণ' বলে ক্রন্দনটি রাধার অনুরূপ। অন্তরে গোবিন্দ লুকিয়ে আছেন একটুও প্রকাশ নেই। অন্য অবতারে ধরা সহজ। গূঢ় প্রচ্ছন্ন এই অবতারে বোঝবার কোন উপায় নেই। গোদাবরীর তীরে বিদ্যানগরে প্রেমিক ভক্ত রায় রামানন্দ কয়েকদিন সঙ্গ করার পর বুঝেও ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না ; তাই প্রশ্ন করেছেন —

পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুই শ্যাম গোপরূপ ॥
তোমার সম্মুখে এক কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌর কান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা ॥ চৈঃ চঃ

প্রকৃত ভক্তের নিকট তিনি ধরা পড়ে যান। ভক্তের কাছে হেরে গিয়ে ভগবানের আনন্দ। আর এক ভক্ত সাধক গেয়েছেন,—

কে বলে গৌরাঙ্গ ভাল।
বাহিরে তাঁর গৌর বরণ ভিতরে শুধুই কালো।

রায় রামানন্দও তাই দেখেছেন। ভিতরে কৃষ্ণ বাইরে এক গৌরাঙ্গীর (রাধার) (গৌর বরণে তাঁর (শ্যামের) অঙ্গটি ঢাকা।

মহাপ্রভু ধরা পড়ে গেছেন দেখে বিষয়টি চাপা দেবার চেষ্টা করছেন; বল্লেন,—ও কিছু নয়। তুমি মহাপ্রেমিক ভক্ত। তা ভক্তদের চোখ খারাপ। স্থাবর বা জঙ্গম, যেখানে সেখানে সেই বস্তুর পরিবর্তে নিজ ইষ্টদেবের মূর্তি দর্শন হয়। রাধা-কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম, সেজন্য আমার মধ্যেও রাধা কৃষ্ণ দেখছ। যাঁরা মহাভাগবত তাঁরা—

স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তাঁর মূর্তি।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্তি ॥
রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাঁরা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমার স্ফুরয় ॥ চৈঃ চঃ মধ্য-৮ম

রায় রামানন্দ তখন বল্লেন,—আমার সঙ্গে তুমি আর চালাকি কোর না। তোমার স্বরূপ আমি যথার্থ ই উপলব্ধি করেছি, তা এই—

রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥
নিজ গূঢ় কার্য তার প্রেম আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু তখন হেসে তাঁকে নিজ স্বরূপ দেখালেন, রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবময়ী শ্রীরাধার মিলিত রূপ—

তবে হাসি তারে প্রভু দেখাল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥

প্রেমানন্দে মূর্চ্ছা দশা প্রাপ্ত রায় রামানন্দকে চেতনা দান করে অত্যন্ত দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানালেন,—

গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্র সুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥ চৈঃ চঃ

স্পষ্টই জানা গেল, রাধা-কৃষ্ণ মিলিত তনু গৌরহরি। গৌরহরির মধ্যে তীব্র বিরহের বেদনা ও মিলনের আনন্দ একই কালে অনুভূত। বিষামৃতে একত্র মিলন, বাইরে বিষের জ্বালা, ভিতরে অমৃতের আস্বাদন। ইহা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, কেবল অনুভবের বিষয়। এমন মিলন কখনও হয়নি বা হবে না (ন ভূতঃ ন ভবিষ্যতি)।

বিরহের মধ্যেও একটা মিলন-মাধুর্য আস্বাদিত হয়। বি-রহ অর্থাৎ বিশেষভাবে রহ (গোপন) স্থানে মিলনের আস্বাদন। বিরহ কালে রাধা কৃষ্ণকে বাইরে হারান, কিন্তু অন্তরে প্রাপ্ত হন। বিরহ যত তীব্র, অন্তরে প্রাপ্তি তত গাঢ়। অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে বল্লেন,—কৃষ্ণ তোমার অন্তরে। বিরহের কালে অন্তরে রয়েছে মিলনের মাধুর্য। রাধা-কৃষ্ণ মিলিত তনু মহাপ্রভু সম্ভোগ (মিলন) ও বিপ্রলম্ভের (বিরহের) ঘনীভূত বিগ্রহ। গম্ভীরা লীলার শেষ দ্বাদশ বৎসর মহাপ্রভুর কেবল বিরহের স্ফুর্তি, বিপ্রলম্ভ রসাবতার রূপে মাথুর বিরহ কালীন দিব্যোন্মাদ অবস্থার আস্বাদন।

ব্রজে রাধা-কৃষ্ণের মিলন ও বিরহের দ্বারে যে মোট চৌষট্টি প্রকার রসমাধুর্য আস্বাদিত হয়, উহা গৌরসুন্দরে নিরন্তর আছে। যখনই আস্বাদন, তখনই বিতরণ। ব্রজের এই প্রেমরস মাধুর্য তিনি আচণ্ডালে বিতরণ করেছেন। গৌরহরির কণ্ঠে কৃষ্ণনাম, ভিতরে ব্রজরসের আস্বাদন। মুলা খেলে যেমন মুলার ঢেকুর ওঠে, মহাপ্রভুর মুখোচ্চারিত নামগানে ব্রজরসের উদ্‌গার উচ্ছলিত হচ্ছে। যে শুনেছে তাঁর কণ্ঠের নাম গান, সে তৎক্ষণাৎ লাভ করেছেন ব্রজের নির্মল প্রেম। ব্রহ্মাদি দেবগণেরও দুর্লভ এই ব্রজপ্রেম যাকে তাকে দান

করেছেন পরম করুণ গৌরহরি। তাই কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

ভগবান যখন ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল দান করেন বা অন্যান্য অভাবাদি দূর করেন, তখন তিনি দাতা। কিন্তু যখন তাঁকে পাবার যে সম্পদ, রাগমার্গের ভক্তি দান করেন, যে ভক্তিতে ভগবান ভক্তের অধীন হয়ে পড়েন, তার প্রেমের বন্ধনে বাধা পড়েন, তখন তিনি দাতা শিরোমণি। বিধিমার্গে সাধক ভগবানকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, কিন্তু ভগবদ্-বোধ হেতু সম্ভ্রম করে, বড় বলে মনে করে, একেবারে আপনার জন করে নিতে পারে না, সেই ভক্তি তাঁর কাম্য নয়। কিন্তু ব্রজের মায়েরা ভগবানকে ছোট ভাবেন, সখারা মনে করেন—'তুমি কোন্ বড়লোক তুমি আমি সম্' ব্রজগোপিণীগণ তাঁকে প্রিয়তম বলে জানেন, এঁরা কেউই কৃষ্ণকে ভগবান বলে ভাবতে পারেন না, এঁদের ভালবাসা তাঁকে সর্বাতিশায়ী আনন্দ দান করে। সেই প্রেমে ভগবান তাঁদের বশীভূত ও আনন্দে আত্মহারা হন।

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন-পালন ॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড়লোক তুমি আমি সম ॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥

এই প্রেম গৌরহরি নির্বিচারে বিলিয়েছেন যাকে তাকে। সেই প্রেম যারা পেল, সর্বস্ব ত্যাগ করে ছুটল তারা তাঁর দিকে। গৌরহরিকে দর্শন করে ভক্ত সাধক বলেছেন—'ঝরে প্রেম ঝরে রে'। এই রাগমার্গের ভক্তি জীবের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করে তিনি-ই পরম কারুণিক।

জীবের স্বরূপ মহাপ্রভু বলেছেন—কৃষ্ণের নিত্যদাস। ব্রজের প্রেমভক্তিতে তার অধিকার ছিল না। ইতিপূর্বে ব্রজপ্রেম দান করা হয় নি। সকল অসম্ভবতা, সকল অনধিকারিত্ব ঘুচিয়ে গৌরহরি

প্রেমভক্তি দিয়েছেন সকলকে। এই প্রেমের একেবারে অধীন হয়ে পড়েন ভগবান, তাই দিতে চান না।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥
হেন প্রেমভক্তি গৌর দিল যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্যন্ত অন্যের কা কথা॥

গীতায় ভগবান বলেছেন, জীব তাঁর অংশ (মমৈবাংশ জীবলোকে)। মহাপ্রভু বলেছেন, জীব কৃষ্ণ দাস। অংশের কাজ, পূর্ণ যিনি তাঁর সেবা। যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেহের অংশ, পূর্ণ দেহটির সেবা করাই তাদের কাজ। যদি তারা (অঙ্গ প্রত্যঙ্গ) সেবা না করে, হাত ক্ষুধায় যদি খাবার তুলে মুখে না দেয়, চলবার প্রয়োজনে পা যদি না চলে, তবে তা পরম দুর্ভাগ্য, হস্ত-পদ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত। সেইরূপ অংশ জীবের কাজ পূর্ণ ভগবানের সেবা করা। যদি জীব না করে তবে বুঝতে হবে তার পরম দুর্ভাগ্য, সে ভবরোগগ্রস্ত। তার রোগ নিরাময় করে কৃষ্ণসেবায় প্রতিষ্ঠিত করা অবিলম্বে প্রয়োজন।

কৃষ্ণকে সেবা সুখ দানে সর্বাধিক যোগ্যতা শ্রীরাধার। কৃষ্ণ সেবাই যখন জীবের স্বরূপ ধর্ম তখন তার আসল ও গোপন পরিচয় শ্রীরাধার দাস্য। শ্রীরাধার দাস্যেই আস্বাদিত হবে রাধা-কৃষ্ণের দিব্য মিলন মাধুর্য। শ্রীরাধার আনুগত্যময় ভজনে ব্রজে কৃষ্ণ প্রাপ্তি ঘটবে—

রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥ চৈঃ চঃ

শ্রীরাধার ভাব-আশ্রয়ে নিজ (কৃষ্ণ) মাধুর্য আস্বাদন ও সর্ব-সাধারণে ব্রজপ্রেম বিতরণ—এই দুই হেতু অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা উদ্ভূত হয়। সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারীর বিনাশ, এসব প্রকৃত কারণ নয়। আসলে, সাধুর কোন বিপদ নেই বা বিপদ-বোধ নেই, তাঁর নিকট লাভ-লোকসান, সুখ-দুঃখ সবই ভগবানেই করুণা। একটা বিপদ কখনও কোন মহা সাধুর ঘটে। যেমন, জীবের দুঃখে

কাতর হয়ে শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য প্রতিজ্ঞা করেন,—'কৃষ্ণকে করাইমু সর্ব নয়নগোচর'। সাধুর প্রতিজ্ঞা যদি রক্ষা না হয় তবে বিপদ, এই বিপদ থেকে সাধুকে রক্ষা করেন নিজে অবতীর্ণ হয়ে। এইরূপ বিপদ অবশ্য সচরাচর ঘটে না।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেমের ভাণ্ডার এনে জগৎজীবকে বিতরণ করেছেন। শ্রীরাধার প্রেমে তিনি ঋণী। শ্রীরাসলীলার 'ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং' শ্লোকে শ্রীরাধা-প্রেমের ঋণ স্বীকার করে বলেছেন, এই ঋণ তিনি শোধ করতে অসমর্থ। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলেছেন,— "হরিনামই রাইঋণ"। প্রভু বলতে চেয়েছেন, মহাপ্রভু 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলে পথে পথে কেঁদে কেঁদে নাম-প্রেম বিতরণ করেছেন, এতে রাইঋণ শোধ হয় নি। সকল জীব যখন হরিনামে মত্ত হয়ে ক্রন্দন করবে, সর্বত্র আকাশ বাতাস হবে হরিনামে মুখরিত, তখন হবে রাইঋণের পরিশোধ। হে প্রভু! কবে রাইঋণ পরিশোধ করে তোমার মহাউদ্ধারণ লীলা পূর্ণ করবে, হরিনামে জগৎ মাতাবে, সেই দিনটি ত্বরান্বিত কর আমাদের জীবনে।

জয় জগদ্বন্ধু! জয় মহাপ্রভু!

——

স্থান ঃ তিনুদার আখড়া, হাওড়া।

তাং ঃ ২২শে আগষ্ট, ১৯৬১

শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্বমাধুরী

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।

গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥

চৈঃ চঃ মঙ্গলাচরণ মন্ত্র-১

অত্যন্ত অদ্ভুৎ একটি ঘটনা, এক অভিনব চন্দ্র-সূর্যের একই কালে যুগপৎ উদয় এবং পার্থিব চন্দ্র-সূর্য যে অন্ধকার দূর করতে অক্ষম, জীব চিত্তের সেই অজ্ঞান অন্ধকার, ঐ দুই চন্দ্র-সূর্য বিনাশ করছেন।

এক অদ্ভুৎ সমকালে দোঁহার প্রকাশ।

আর অদ্ভুৎ চিত্ত গুহার তমো করে নাশ ॥ চৈঃ চঃ

এই চন্দ্র-সূর্য কোথায় উদিত হয়েছেন? গৌড়োদয়ে, গৌড়দেশে, বাংলাদেশে। কোথা হতে এসেছেন? উত্তর—ব্রজ হতে,—

ব্রজে যে বিহরে পূর্বে কৃষ্ণ বলরাম।

কোটি চন্দ্র-সূর্য জিনি দোঁহার নিজ ধাম ॥

সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।

গৌড়দেশ পূর্বশৈলে করিলা উদয় ॥

দ্বাপরের শেষে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামরূপে যাঁরা লীলা-বিহার করেছিলেন, জগতের প্রতি অসীম করুণাপরবশ হয়ে তাঁরাই আবার এসেছেন। নাম-রূপ বদলে এসেছেন। কি নাম, কি রূপ তাই বলেছেন,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।

দোঁহার প্রকাশে সর্ব জগত আনন্দ ॥

এই দুই ভাই কলিতাপদগ্ধ জীবের হৃদয়ের অজ্ঞান অন্ধকার ক্ষালন করে গ্রন্থ ভাগবত ও ভক্ত ভাগবতের সঙ্গে জীবের হৃদয়ের অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটাচ্ছেন। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মহাদান ইহাই,

ফলে জীব-চিত্তের বিষয়বাসনা তিরোহিত হয়ে ব্রজের শুদ্ধা ভক্তি, প্রেমভক্তি সম্পদ লাভে ধন্য হয়েছে।

দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥

কিন্তু উভয়ে একই স্থানে বা একই কালে আবির্ভূত হন নি। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে গৌরসুন্দরের আবির্ভাবের এগার বছর পূর্বে বীরভূমের একচাকা গ্রামে নিত্যানন্দের জন্ম।

যেদিন নবদ্বীপে জন্মিলা গৌরচন্দ্র।
রাঢ়ে থাকি হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ ॥

ঘটনা দৃষ্টে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনায় 'সহোদিতৌ' বাক্যের সমর্থন পাওয়া যায় না। তবে তিনি লিখেছেন, এই দুই প্রভুর প্রথম মিলনমাধুর্য ধ্যানে দর্শন করে।

পরিব্রাজক সন্ন্যাসী শঙ্করারণ্য স্বামী এসে নিত্যানন্দের পিতা হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে অতিথি হয়েছেন। চলে যাবার পূর্বে সন্ন্যাসী অতিথি বল্লেন,—একটি বস্তু ভিক্ষা চাই। অত্যন্ত সরলহৃদয়, উদার-প্রকৃতি হাড়াই পণ্ডিত বল্লেন, আমার সাধ্যের মধ্যে যদি হয়, নিশ্চয় তা পূরণ করব, কি আপনার প্রার্থনা, বলুন। সন্ন্যাসী হাড়াই পণ্ডিতের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্র নিত্যানন্দকে ভিক্ষা চাইলেন। বাক্য-বদ্ধ, সত্যনিষ্ঠ পণ্ডিত আপনার প্রাণঘাতী ঐ সত্য রক্ষা করলেন। সন্ন্যাসী ও নিত্যানন্দ বহু তীর্থ একত্র পর্যটন করে, আপন স্বরূপ নিত্যানন্দে লীন করে, সন্ন্যাসী অন্তর্দ্ধান করেন। কথিত আছে, ইনি মহাপ্রভুর বড় ভাই। সর্ব শক্তি নিত্যানন্দে অর্পণ করে, শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে মিলে গেলেন।

নিতাই বহু তীর্থ দর্শনের পর কৃষ্ণের আকর্ষণে শ্রীবৃন্দাবনে এসেছেন। কিন্তু কৃষ্ণকে দেখতে পান না কোথাও, জানতে পারলেন, তিনি আবির্ভূত হয়েছেন নবদ্বীপে গৌরসুন্দররূপে। এ পর্যন্ত উভয়ের দেখাসাক্ষাৎ হয়নি, অথচ গাঢ় প্রেমের আকর্ষণে ছুটে আসছেন নবদ্বীপে। আবার গৌরসুন্দর সব ভক্তদের নিয়ে সংকীর্তন রসে মগ্ন

থেকেও মাঝে মাঝে বিলাপ করেন নিত্যানন্দের অভাবে। পূর্বরাগ বিরহ উভয়ের, উভয়ের জন্য।

নিতাই নবদ্বীপে পৌঁছে, নন্দনাচার্যের গৃহে সঙ্গোপনে আছেন। গৌরসুন্দর ভক্তদের বল্লেন, নবদ্বীপে খুঁজে দেখ সেই বিরাট পুরুষ নিত্যানন্দ কোথায় আছেন, ভোররাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, তিনি নিশ্চয় এসে গেছেন। ভক্তেরা কেউ খুঁজে পেলেন না। তখন মহাপ্রভু সব ভক্তদের নিয়ে এলেন নন্দনাচার্যের গৃহে। এই লীলার মধ্য দিয়ে এই তত্ত্বই প্রকাশ করলেন—

বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য জানায় যারে সে জানিতে পারে॥

এই নন্দনাচার্যের গৃহে দুই প্রভুর প্রথম মিলনের দৃশ্যটি ধ্যানে দর্শন করে, কবিরাজ গোস্বামিজী লিখেছেন 'সহোদিতৌ'।

গৌর কৃপায় যেমন নিতাইকে জানা যায়, নিতাই-এর কৃপা ব্যতিরেকে গৌরকে পাওয়া যায় না। রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাপ্রভু অন্ত প্রাণ। মহাপ্রভুর সান্নিধ্যলাভের জন্য বহুবার বাড়ী থেকে পালিয়ে যান, কিন্তু প্রতিবারেই ধরা পড়ে যান। পিতার অনুমতি নিয়ে এসেছেন পানিহাটীতে নিত্যানন্দের নিকট। প্রথম দর্শনেই নিতাই বলেন তাকে,—চোরা! আমাকে বাদ দিয়ে গৌরকে পেতে চাস, তোকে আজ দণ্ড দেব। সব ভক্ত বৈষ্ণবদের চিড়া-দই, চিড়া-দুধ ফলার খাওয়াবি। রঘুনাথ পরমানন্দে ঐ কৃপা-দণ্ড মাথায় পেতে নিলেন। বিরাট ধনী জমিদারের সন্তান। পানিহাটীর আশে পাশে যত গ্রাম, সর্বত্র প্রচারিত হল মহোৎসব বার্তা, যত চিড়া-দুধ-দই পাওয়া যায় সব কিনে নেন, সকল লোকের নিমন্ত্রণ। নিত্যানন্দের আগ্রহে, মহাপ্রভু সেখানে আবির্ভূত হয়ে মহোৎসবের দই-চিড়া গ্রহণ করেন। প্রাণভরে নিত্যানন্দ রঘুনাথকে আশীর্বাদ করে বলেন,—তোর সকল বন্ধন ঘুচে গেল। তার কিছুদিন পরে রঘুনাথ গৃহত্যাগ করে নীলাচলে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-সান্নিধ্য লাভ করেন। আজও

পানিহাটীতে প্রতি বছর দণ্ডমহোৎসব স্মরণে বিরাট উৎসব, নাম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

কথায় বলে—'নিতাই এনেছে নাম গৌরহরি হরিবোল'—ইহা ধ্রুব সত্য। গৌরসুন্দর পুরীধামে আছেন। নিতাইকে বলেছেন,—

প্রতি বর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা।
গৌড়ে থাকি মোর ইচ্ছা সফল করিবা॥

প্রেমের আতিশয্যে আজ্ঞা লঙ্ঘন করেও এসেছেন নিত্যানন্দ পর বৎসর। মহাপ্রভু বল্লেন, শ্রীপাদ তুমি আর এস না। তাঁর ভয়, পাছে নিতাইও তাঁর মত ব্রজরস মাধুর্যে ডুবে যান, তাহলে তাঁর অবতারের কাজ, নাম-প্রেমদান, সফল হবে না। বেদনায় আকুল হয়ে কি করছেন নিত্যানন্দ? শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেছেন,—

নিতাই জপয়ে নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
স্বপ্নেও নিতাইয়ের মুখে নাহি আর অন্য॥

নামের প্রকট বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীহরিদাস ঠাকুর সারাজীবন জপ করেছেন 'হরে কৃষ্ণ' নাম। কিন্তু অন্তিম সময়ে,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রামণ॥ চৈঃ চঃ অন্ত্য-১১

শ্রীনিত্যানন্দের নাম-দান-তত্ত্ব কোন যুক্তি তর্ক শাস্ত্র সিদ্ধান্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। নিতাই-এর প্রচারের ধারাই অভিনব।

"দন্তে তৃণ ধরিয়া নিতাই বলে যাচিয়ে।
ভজ গৌরহরি মোরে লহ কিনিয়ে॥
নিতাই এত বলি পড়ে ঢলি ভাবতে হয়ে মগন।
রাধা প্রেমে ঢল ঢল আঁখি ছল ছল।
কেঁদে নিতাই বলে সবে বলরে হরি বল॥"—প্রভু জগদ্বন্ধু

একেবারে অভিমানশূন্য নিতাই। হাতে পায়ে ধরে, ধুলায় লুটিয়ে, সবিনয় কাতর নিবেদনে নাম বিলাচ্ছেন, যাকে নিতাই ধরেছেন, স্পর্শ করেছেন, তাঁর নাম না নিয়ে গত্যন্তর ছিল না। লোচনদাসজী

ঠাকুর নিতাই সম্বন্ধে লিখেছেন—"গৌরপ্রেমে গরগর মাতোয়ারা।" শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা অবতার।
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার॥

নিত্যানন্দ প্রেম না দিলে কারও প্রেমলাভের উপায় নেই। স্বয়ং মহাপ্রভু বলেছেন নিত্যানন্দকে—

যে কীর্তন নিমিত্ত তোমার অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল কিবা চাহ আর॥
তোমার যে প্রেমভক্তি তুমি প্রেমময়।
বিনা তুমি দিলে কার ভক্তি নাহি হয়॥ চৈঃ ভাঃ

মহাপ্রভু পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে এসেছেন। অত্যন্ত নিভৃতে তাঁকে জানালেন,—

রাঘব তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই॥ চৈঃ ভাঃ

'নিজ গোপ্য' অর্থাৎ এতই গোপনীয় বস্তু যা অতি প্রিয়জনকেও বলা চলে না এবং নিজের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। নিতাই প্রসঙ্গে আরও বল্লেন,—

এই নিত্যানন্দ যেই করান আমারে।
সেই আমি করি এই কহিনু তোমারে॥
আমার সকল কার্য নিত্যানন্দ দ্বারে।
এই আমি অকপটে কহিনু তোমারে॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি শ্রীবাসের অগাধ ভক্তি বিশ্বাস দেখে মহাপ্রভু অপার আনন্দভরে বল্লেন,—

প্রভু কহে—"কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস।
নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতই বিশ্বাস॥
মোর গোপ্য নিত্যানন্দ জানিলা সে তুমি।
তোমারে সন্তুষ্ট হঞা বর দিব আমি॥

যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে ;
তথাপি দারিদ্র্য তোর নাহিবেক ঘরে ॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীকৃষ্ণকে যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের প্রাপ্তি একরূপ নয়। 'কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়'। নিতাই-এর কৃপায় যদি পাওয়া যায়, তবেই যথার্থ পাওয়া, পূর্ণ মাধুর্যের আস্বাদন। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মশায় বলেছেন,—

নিতাই পদ কমল কোটিচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জীবন জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায় ॥

প্রেম পুরুষোত্তম গৌরহরির প্রেমের ভাণ্ডারী হচ্ছেন নিতাই। নিতাই ছাড়া রাধাকৃষ্ণে প্রেমলাভের উপায় নাই। যতরূপে গৌরের সেবা, সবই নিতাইয়ের দান। জড় বস্তুতো ভগবান গ্রহণ করতে পারেন না, নিতাইয়ের করুণায় সবই চিন্ময় হয়।

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের ভক্ত জয়নিতাইদেব। তাঁর অন্তরের বিশ্বাস, তিনি নিতাইতত্ত্ব খুব ভালই বোঝেন। একদিন প্রভুর সাক্ষাতে তিনি বলেছেন, 'নিতাইচাঁদের কি মহিমা'! শুনে প্রভু তৎক্ষণাৎ বল্লেন,—'ছি! অমন কথা বলতে নাই'। জয়নিতাইদেব অনেক চিন্তা করেও বুঝে উঠতে পারলেন না, তাঁর কথার কি ত্রুটি হল। শেষে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানালেন,—মহিমা শব্দটি ঐশ্বর্যজ্ঞাপক, বলতে হয়, নিতাইচাঁদের কি মাধুরী'।

শ্রীনিতাইচাঁদের মাধুর্যের দিকটি গৌর পার্ষদগণের কেহ, বা কবিরাজ গোস্বামিজী বা বৃন্দাবনদাসজী কেহই কিছু উল্লেখ করেন নি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে "সংকর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী" ইত্যাদি পর পর পাঁচটি শ্লোকে শ্রীনিতাইয়ের (তথা শ্রীবলরামের) ঐশ্বর্যের দিকটি ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কি করে নিতাই গৌরাঙ্গবল্লভ বা ব্রজপ্রেমের ভাণ্ডারী হলেন, তা অব্যক্ত রয়ে গেছে। বলরামে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ভাব আছে, মধুর রসে তাঁর প্রবেশ বা অধিকার কিছু

আছে কিনা তা জানা যায় না। অবশ্য সব রসের মধ্যে দাস্য আছে। ব্রহ্মমোহন লীলায় বলরামের 'মে ভর্ত্তুঃ' পদে দাস্যভাব ব্যক্ত। শ্রীরাধাতেও দাস্যভাব আছে। শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চায় নিতাইকে গৌরাঙ্গবল্লভ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ব্রজলীলায় শ্রীরাধা-গোবিন্দের মধুর রসের লীলায় বলরামজীকে দেখা যায় না ; গৌর-সুন্দর নিতই সম্বন্ধে বলেছেন—'আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই' বা "তোমার যে প্রেমভক্তি তুমি প্রেমময়"—শ্রীবলরাম স্বরূপে তার সমর্থন পাওয়া যায় না। নিতাই কি করে ব্রজপ্রেমদাতা হলেন বা অভিন্ন গৌরাঙ্গ স্বরূপ, তা এক গভীর রহস্য। নিতাই স্বরূপটি গৌরসুন্দর 'নিজ গোপ্য' বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু উহা গোপ্যই রয়ে গেছে। কেহ এ সম্বন্ধে কিছু জানলেও প্রকাশ করে নি। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর কৃপা করে কিছু প্রকাশ করায়, আমরা তা জানতে সক্ষম হয়েছি। মধুর রসে নিতাইচাঁদের মঞ্জরী স্বরূপের মাধ্যমে উহা আস্বাদিত হয়েছে।

শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর রাধা-গোবিন্দ মিলিত, গাঢ় মিলনে একীভূত হয়েছেন। মিলনে আনন্দের স্ফূর্তি হওয়ার কথা, অথচ গৌরহরিতে দিবারাত্র বিরহের ক্রন্দন। সুতীব্র মাথুর বিরহের কান্না। কৃষ্ণের মথুরা গমন ও অবস্থানকালে শ্রীরাধার যে সুতীব্র বিরহ, গৌরসুন্দরে তাই।

শ্রীরাধার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
এই মত প্রলাপ চেষ্টা প্রভুর রাত্রদিনে ॥ চৈঃ চঃ

মিলনের গাঢ়তার মধ্যে সুতীব্র বিরহ—এ এক অপূর্ব রহস্য। ব্রজে রাধা-কৃষ্ণের বহু প্রকারের মিলন ঘটেছে, কিন্তু কখনও একীভূত হন নি। আজিকার মিলনে একে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। ইচ্ছা জাগে, ভালবাসার ধনকে হৃদয়ে পুরে রাখি, কখনও হৃদয় ছাড়া না হয়, ব্রজলীলায় তা সম্ভব হয় নি, হয়েছে নবদ্বীপ লীলায়।

মিলন ও বিরহ যেন দোলকের দু'টি প্রান্ত। কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন। গৌরসুন্দরে এক হয়ে আছেন, অথচ রয়েছে

একের অপরকে হারানোর বেদনা। সকল বিরুদ্ধভাবের সমাধান ঈশ্বরস্বরূপে। মিলন ও বিরহের একত্র স্থিতি। আমাদের অভিজ্ঞতা, এইরূপ মিলন হলে, সেখানে বিরহ থাকতে পারে না। আবার বিরহকালে থাকবে না কোনরূপ মিলনের আনন্দ। গৌরসুন্দরে একই কালে মিলন ও বিরহ আস্বাদিত হচ্ছে। মিলনের আনন্দামৃত ও বিরহের তীব্র বিষ—বিষামৃতে একত্র মিলন।

শ্রীরাধার বিরহ ও শ্রীরাধাভাবাশ্রয়ী গৌরের বিরহের পার্থক্য এই—শ্রীরাধার বিরহের শেষ আছে, কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে বিরহের অবসান। কিন্তু গৌরহরির বিরহ কখনও শেষ হবে না। শ্রীরাধাভাবে আকুল হয়ে খুঁজছেন কৃষ্ণকে। স্বরূপ দামোদর বলেছেন, কৃষ্ণ আছেন তোমার অন্তরে। নখ দিয়ে চিরতে গেছেন বক্ষ। ভাবদশার চরমে হাত-পা ঢুকে গেছে শরীরের মধ্যে, কূর্মাকৃতি হয়ে গেছেন মহাপ্রভু, যেন অন্তরে কৃষ্ণকে পেতে চাইছেন, সবটা সত্তা দিয়ে পেতে চান।

লোকে নাহি দেখি কভু শাস্ত্রে নাহি শুনি।
ঐছে প্রেম প্রকাশিলা ন্যাসী চূড়ামনি।
পেটের ভিতর হস্ত-পদ কূর্মের আকার।
মুখে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার॥ চৈঃ চঃ

কখনও ভাবদশায় কৃষ্ণকে দেখছেন বাইরে, ধরবার প্রচণ্ড আগ্রহে হস্ত-পদের সন্ধি খুলে গেছে, ভাবদশায় মূর্চ্ছিত হয়েছেন, দেহ পাঁচ-সাত হাত দীর্ঘ হয়েছে।

শরীর দীঘল তাঁর হাত পাঁচ সাত।
এক এক হস্ত তাঁর তিন তিন হাত॥
অস্থি সন্ধি ছাড়ি চর্ম করে নড়বড়ে। চৈঃ চঃ

গৌর তো কখনই কৃষ্ণকে খুঁজে পাবেন না। যাঁকে খুঁজছেন, তিনি তো অন্তরে। মিলনের মধ্যে বিরহের আস্বাদন অতি অপূর্ব, ইহাই প্রেম-বৈচিত্র্য।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের তিনটি বাঞ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়। তিনি সকল সময়ই প্রেমের বিষয়। শ্রীরাধা (ও গোপীরা) প্রেমের আশ্রয়।

সেজন্য আশ্রয় জাতীয় সুখ তিনি কখনই পেতে পারেন না। ভগবান ভক্তি বা প্রেমের বিষয়, ভক্ত আশ্রয়। ভক্ত ভগবানকে পেয়ে যে সুখ অনুভব করেন, তা ভগবান কখনও পেতে পারেন না। শ্রীরাধার সঙ্গে মিলনকালে কৃষ্ণ অনুমান করেন, তাঁর থেকে শ্রীরাধার সুখ কোটি গুণ অধিক। সেই সুখের তিনি অভিলাষী হন। এই প্রেমের আশ্রয় হতে পারলে তবেই ঐ সুখ আস্বাদন সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ যদি শ্রীরাধা হতে পারেন, তবেই ঐ বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ, এক ছিলেন, রস আস্বাদনের জন্য দুই হয়েছেন। এখন দেখছেন আশ্রয়ের সুখাতিশয্যে তিনি বঞ্চিত। অথচ ঐ সুখ আস্বাদন করতে চান। এখন উপায় কী—

ঐ আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়।
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়॥ চৈঃ চঃ

শ্রীগৌরাঙ্গস্বরূপে সেই বাঞ্ছা পূর্ণ হল।

রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥ চৈঃ চঃ

শ্রীহরি—শ্রী অর্থাৎ শ্রীরাধাকে, হরি অর্থাৎ হরণ করেছেন, শ্রীরাধার ভাব-কান্তি হরণ করেছেন। কিন্তু কি উপায়ে একে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন তার স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

মাথুর বিরহে শ্রীরাধা দশম দশা অথবা মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়েছেন। বিরহের চরম মৃত্যুদশা। বিরহের মধ্যে একটা প্রাপ্তি আছে। বি-রহ অর্থাৎ বিশেষভাবে রহ স্থান অর্থাৎ গোপন স্থানে পাওয়া। শ্রীরাধা বিরহকালে বাইরে শ্রীকৃষ্ণকে হারান, কিন্তু অন্তরে কৃষ্ণকে পান। বাইরে হারানোর বেদনা যত তীব্র, অন্তরে প্রাপ্তির আনন্দ তত নিবিড়। চরম বিরহে গাঢ়ভাবে অন্তরে পেয়েছেন কৃষ্ণকে। কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু জানেন না, ভাবেন না, দেখেন না। মিলন কালে কৃষ্ণ ছাড়াও দেখেন, রাসলীলায় দেখলেন সব গোপীর পাশে এক এক কৃষ্ণ, অবশ্য

ইহা কেবল রাধিকাই দেখেছিলেন। মিলনের মধ্যেও একটা অভাব জাগে। মিলনে বাইরে কৃষ্ণকে পেয়ে অন্তরে কৃষ্ণের জন্য ভাবনা থাকে না অর্থাৎ অন্তরে কৃষ্ণকে হারান। রসিক ভক্ত বিরহের আস্বাদনই চান। বিরহে বাইরে হারানোর বেদনা অথচ ভিতরে গাঢ় আনন্দের আস্বাদন।

এই বিরহের সিংহদ্বার দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করেন রাধার অন্তরে। বিরহ যত চান, অন্তরে প্রবেশ তত নিবিড়। বিরহের চরমতায় অন্তরভরা কৃষ্ণ ; 'হা কৃষ্ণ' বলে আকুল চরম বিরহে। ব্রজের নিভৃত কক্ষের এই স্বরূপটি নদীয়ার ঠাকুরে মূর্ত, প্রকাশ হয়ে পড়েছে। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর আস্বাদন করেছেন—"বড় দুঃখে এক রে"। তীব্র বিরহে অন্তরের দরজা খুলে গেছে, ঢুকলেন শ্যামসুন্দর সেই পথে—ইহাই গৌরস্বরূপ। এই জন্য স্বরূপে মিলিত তনু হলেও সদাই "হা কৃষ্ণ" বলে বিরহের আর্তি।

বিরহের চরমে শ্রীরাধা মৃত্যুদশায় উপনীত। ভাবছেন, আর বুঝি বাঁচবেন না। কিন্তু শ্যামসুন্দরের জন্য ভাবনাও কিছু কম নয়। সদাই ভাবছেন মরণ আসন্ন, যদি মরে যান তবে শ্যামকে কার কাছে দিয়ে যাবেন—"কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব" ? ভাবলেন, চন্দ্রাবলী কৃষ্ণকে খুবই ভালবাসে, প্রাণভরা সেবায় সে নিশ্চয় কৃষ্ণকে সুখী করবে, তবে চন্দ্রাবলীকে দিয়ে যাব। চন্দ্রাবলীকে ডেকে পাঠালেন, চন্দ্রা আসতেই শ্রীরাধা বল্লেন—আমার কৃষ্ণকে তোমায় দিলাম।

রাধা ও চন্দ্রা একই, কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। লীলার বৈচিত্র্য ঘটিয়ে কৃষ্ণকে সুখ দেবার জন্য উভয়ের বিরোধিতা। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ব্রজলীলায় তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন তিনটি শব্দে—"ললিতা-কৃষ্ণ-শৈব্যা"। ললিতা পদে রাধা যুথ (রাধা ও তাঁর সখীগণ) ; শৈব্যা পদে চন্দ্রাযুথ ; কৃষ্ণ মাঝখানে থেকে উভয়ের পার্থক্য, বিরোধিতা রক্ষা করেন। কৃষ্ণ যদি মাঝখান থেকে সরে যান, রাধা ও চন্দ্রা এক হয়ে যান। কৃষ্ণকে সুখ দেবার জন্যই বিরোধিতা এবং বিরোধিতা হেতু লীলার বৈচিত্র্য। বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, কলহন্তারিতা ইত্যাদি

রসলীলার আস্বাদন সম্ভব হোত না, যদি চন্দ্রাবলীর বিরোধিতা না থাকত। বিরোধিতা থাকে না বিরহকালে। বিরোধিতা কৃষ্ণ সুখার্থে, যদি কৃষ্ণ না থাকেন, তবে বিরোধিতাও থাকে না।

শ্রীরাধার আহ্বানে চন্দ্রা এসে দেখলেন, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধার দুর্দশা। বিরহ-বেদনায় শ্রীরাধা মৃতপ্রায়, উত্থান শক্তি রহিত, তাঁর নিজের থেকে রাধার বিচ্ছেদ-বেদনা হাজার গুণ বেশী। শ্রীরাধা চন্দ্রাকে বল্লেন,—আমার শ্যামকে তোমায় দিলাম। কিন্তু দেবেন কি করে? শ্যামসুন্দর তো এখন ব্রজ ছেড়ে মথুরায় আছেন। 'যেই নাম সেই কৃষ্ণ', 'নাম ও নামী অভিন্ন'। শ্রীরাধা চন্দ্রা সহ সব সখিদের বললেন,—'আয় কৃষ্ণ নাম নে'।

কৃষ্ণ নাম মন্ত্র আজি লও সখিগণ।
চরমে তোদের গুরু হলাম এখন॥"

শ্রীরাধার প্রথম মন্ত্র দান। নামমন্ত্রের সহিত কৃষ্ণকে দান করেছেন। চন্দ্রা 'গুরুর চরণে আত্ম-নিবেদন করে', রাধাভাবময় হয়েছেন, মাদনাখ্য মহাভাবেরর সাগরে ডুবে গেছেন। রাধাও নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। উভয়ে উভয়কে সমর্পণ করে একাত্ম হয়ে গেছেন। চরম বিরহে রাধার অন্তরে গাঢ়ভাবে প্রাপ্ত কৃষ্ণ স্বরূপটি গৌর আর রাধাভাবময়ী চন্দ্রা ও কৃষ্ণনাম মিলিত স্বরূপটি নিত্যানন্দ। মাধুর্যের দিক হতে শ্রীগৌর ও নিতাই-এ কোন পার্থক্য নেই। গৌর ও নিতাই সম্বন্ধে যে বক্তব্য—'এক বস্তু দুই ভাগ ভক্তি বিলাইতে' (চৈতন্যভাগবত) এবং 'দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ' 'চৈতন্য-চরিতামৃত)-এর সমাধান এইখানেই পাওয়া যায়।

গুরু শ্রীরাধা চাইলেন দক্ষিণা। দক্ষিণা—"সংকীর্তন প্রচারণ"—লিখেছেন প্রভু জগদ্বন্ধু। "নামে মত্ত হল রে প্যারীর দশমী লয়ে" —প্রভু জগদ্বন্ধু। এজন্য ব্রজপ্রেমের প্রধান ভাণ্ডারী নিতাই, নাম-প্রেম বিতরণে-দানে তিনিই দাতা শিরোমণি। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মশায় মনে করেন, নিতাইয়ের সঙ্গে যাঁর কোন সম্বন্ধ নেই, তার জন্ম বৃথা, সে পশু হতেও অধম—

সে সম্বন্ধ নাই যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।

তিনি খুব জোর দিয়ে বলছেন, যাঁর প্রতি নিতাইয়ের করুণা হবে, তিনি নিশ্চয় ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবেন।

নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি।

চন্দ্রাবলীর সত্তা থাকায় নিতাইয়ের মধ্যে কিছু বিরুদ্ধভাব আছে। বিরোধিতা করে তিনি লীলার পুষ্টি সাধন করেছেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পরেই মহাপ্রভু চলেছেন ব্রজের পথে। সঙ্গী নেই কেহ। প্রেমোন্মাদ অবস্থা, তিন দিন তিন রাত আহার-নিদ্রা নেই, নেই কোন দেহস্মৃতি, ক্রমাগত চলেছেন, কিন্তু রাঢ় দেশের একই অঞ্চলে ঘুরেছেন। নিতাইয়ের ধৈর্য শেষ সীমায় পৌঁছেছে, আর থাকতে পারলেন না মহাপ্রভুর অবস্থা দেখে। তিনিও এই কয়েক দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করে ঘুরেছেন মহাপ্রভুর পিছনে। নিকটে মাঠে রাখালগণ গরু চরাচ্ছিল, নিতাই তাদের বল্লেন—খুব উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কর, মহাপ্রভুকে দেখিয়ে বল্লেন, ঐ সাধু আকৃষ্ট হয়ে বৃন্দাবনের পথ জিজ্ঞাসা করলে সামনের ঐ গঙ্গাতীরের পথ দেখিয়ে দিবি। এদিকে অদ্বৈতাচার্যের নিকট খবর পাঠিয়েছেন, নতুন গৈরিক-বরণ কৌপীন-বহির্বাস নিয়ে গঙ্গাতীরে আসতে।

রাখালগণের কথায় মহাপ্রভু গঙ্গাতীরে এলে, নিতাই সামনে এসে দেখা দিলেন। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন,—শ্রীপাদ! তোমার কোথাতে গমন? নিতাই বল্লেন,—তোমার সাথে যাব বৃন্দাবন। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন,—আর কত দূর বৃন্দাবন? নিতাই গঙ্গা দেখিয়ে বল্লেন, এই কর যমুনা দরশন। মহাপ্রভু মহা আনন্দে প্রেমে উন্মত্ত হয়ে যমুনার স্তব করে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। এমন সময় অদ্বৈতাচার্য নৌকা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে মহাপ্রভুর মনে কিছু সন্দেহ হল। জিজ্ঞাসা করলেন,—

তুমি ত অদ্বৈত গোঁসাই হেথা কেন আইলা।
আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমনে জানিলা॥

নিতাইয়ের সঙ্গে মহাপ্রভুর কি কথা হয়েছে, তিনি জানেন না। প্রখর বুদ্ধি অদ্বৈতাচার্যের, তিনি বল্লেন,—

আচার্য কহে, যাঁহা তুমি, তাঁহা বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন॥

মহাপ্রভু নিতাইয়ের বঞ্চনায় খুব ক্ষুব্ধ হয়ে বল্লেন,—

প্রভু কহে, নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গাকে আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা॥

নিত্যানন্দ চুপ করে আছেন, কোন কথার উত্তর দিচ্ছেন না। অদ্বৈতাচার্য তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা বুঝে বললেন,—

আচার্য কহে, মিথ্যা নহে শ্রীপাদ বচন।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন॥
গঙ্গায় যমুনা বহে হৈয়া একধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্বে গঙ্গাধার॥ চৈঃ চঃ

তখন অদ্বৈতাচার্য অনেক অনুনয় করে মহাপ্রভুকে শান্ত করে বললেন,—ভিজা কৌপীন ছেড়ে এই শুষ্ক বস্ত্র পরিধান কর, তিন দিন উপবাসী, আজ আমার গৃহে দু'টি শাক-অন্ন গ্রহণ করবে। নিত্যানন্দের এই বিরোধিতায় মহাপ্রভুর লীলাজীবনের সব ধারাটাই পাল্টে গেল। মাতৃ আজ্ঞা বলবতী, বৃন্দাবনের স্থলে নীলাচলে স্থায়ীভাবে বাস স্থির করলেন। নিত্যানন্দ ফিরিয়ে না আনলে সব লীলাটাই অন্যরূপ হোত। নিজ পরিকর সব বাংলার ভক্তগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ হয়তো নষ্ট হোত এবং লীলা এত মাধুর্যমণ্ডিত হোত না।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর যখন প্রথম নীলাচলে যাচ্ছেন, সঙ্গে নিত্যানন্দ জগদানন্দ প্রভৃতি আছেন। নীলাচলে পৌঁছিবার কিছু আগে একদিন মহাপ্রভু তাঁর সন্ন্যাসের দণ্ডটি জগদানন্দের হাতে দিয়ে স্নান করতে গেলেন। জগদানন্দ উহা নিত্যানন্দের নিকট রেখে ভোগ রান্নার যোগাড় করতে গেছেন। নিত্যানন্দ উহা ভেঙ্গে তিন

খণ্ড করে ভার্গী নদীর জলে ফেলে দিলেন। পরে, যখন পুনরায় যাত্রা শুরু হবে, তখন মহাপ্রভু সন্ন্যাসের দণ্ডটি চাইলেন। নিত্যানন্দ নির্বিকার চিত্তে বল্লেন,—বাঁশের খণ্ডটা ভেঙ্গে গেল, নদীর জলে ফেলে দিয়েছি। শুনে মহাপ্রভু ভয়ানক চটে গেলেন। বল্লেন,—সন্ন্যাসীর দণ্ডে সব দেবতারা অধিষ্ঠিত থাকেন, আর তুমি বলছ, সামান্য বাঁশের দণ্ড। তোমাদের সঙ্গে আমার কোন আর সম্পর্ক নেই, তোমাদের সঙ্গে আর যাব না। হয় তোমরা আগে যাও, আমি পিছে যাব। না হয় তোমরা পিছে এস, আমি আগে চলে যাই। মুকুন্দ বল্লেন,—প্রভু! আপনি আগেই যান, আমরা পিছনে আসছি।

মহাপ্রভু অত্যন্ত দ্রুতবেগে সবাইকে পিছনে ফেলে চল্লেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি চেষ্টা করেও তাঁর নাগাল পেলেন না। মহাপ্রভু আঠার নালার নিকটে এসে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের চূড়া দেখতে পেলেন। সেই চূড়ায় অপরূপ সুন্দর এক বালগোপাল হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডাকছে। সেই দর্শন হতেই মহাপ্রভু ছুটলেন মন্দিরের দিকে বিদ্যুৎবেগে! মন্দির মধ্যে প্রবেশ করে শ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহ দর্শন করলেন, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান নেই, দ্রুত ধাবিত হলেন জগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করার জন্য। জগন্নাথদেবকে স্পর্শ করার আগেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। পাণ্ডারা সব কোলাহল করে ছুটে এসেছে মারবার জন্য। সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য। তিনি পুরীর রাজার সভাপণ্ডিত, রাজার ও সকলের অতি সম্মানের পাত্র। তিনি দেখলেন, এই অপরূপ সন্ন্যাসীর সর্বাঙ্গে দিব্য সাত্ত্বিক বিকার। পাণ্ডাদের স্পর্শ করতে নিষেধ করলেন। লোক দিয়ে নিজের গৃহে এনে এক পবিত্র স্থানে রাখলেন।

মহাপ্রভুর সঙ্গীগণ অনেক পরে মন্দিরে এসে এই ঘটনা শুনতে পেলেন। বুঝলেন, ইনি মহাপ্রভু ছাড়া আর কেহ নন। সকলে এলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে। মহাপ্রভুকে ঘিরে নাম সংকীর্তন করতে করতে অনেকবেলায় জ্ঞান ফিরল। মহাপ্রভুকে নিয়ে সকলে

সমুদ্র স্নান করে এসে প্রসাদ পেলেন। নিতাইয়ের বিরোধিতার জন্য পুরীধামের লীলার চিত্রটি সম্পূর্ণ অন্যরূপ হল। মহাপ্রভু একাকী আসায় যেভাবে সার্বভৌমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হল এবং তাঁর মাধ্যমে অতি অল্পদিনেই উড়িষ্যার রাজা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের গভীর শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলেন, তা সম্ভব হোত না সকলে একত্র এলে। নিত্যানন্দের বিরোধিতা সর্বত্রই লীলার মাধুর্য দান করেছে। মহাপ্রভু যে বলেছেন—'আমার সকল কার্য নিত্যানন্দ দ্বারে, সেই আমি করি যা নিতাই করান আমারে'—ইহা সর্বৈব সত্য।

নামের মূর্ত বিগ্রহ নিত্যানন্দ, তিনি নাম, মহাপ্রভু নামী। নাম ও নামীতে কোন ভেদ নেই—"নাম ও নামী অভিন্ন"—প্রভু জগদ্বন্ধু। "যেই নাম সেই কৃষ্ণ" রাধারাণী চন্দ্রাবলীর নিকট গুরুদক্ষিণা চাইলেন—"হরিনাম প্রচারণ"। মহাপ্রভুর লীলায় নাম প্রচারণ ও প্রেম বিতরণের প্রধান ভার নিত্যানন্দের উপর। গৌরের সত্তাটা 'হরি' এবং নিতাইয়ের সত্তা হরিনাম। রাধারাণীর শ্রীমুখ হতে নাম পেয়ে চন্দ্রার যে স্বরূপ, তাহাই নিত্যানন্দ। বৈষ্ণব আচার্যগণের অনুভব মঞ্জরীশ্রেষ্ঠা অনঙ্গমঞ্জরী, শ্রীরাধার ভগিনী, তিনিও মিলিত হয়েছেন ঐ স্বরূপে। নিত্যানন্দের এই মাধুর্যের স্বরূপটি অনন্য-সাধারণ, প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের করুণায় প্রকাশিত।

নাম—নামীর গোপ্য ধন। নামের মধুরতা কত তা নামীও জানেন না। 'রাম না শকহি নাম গুণ গাই'—তুলসীদাস। নামীর সর্বশক্তি নামে আছে। দেখা যায়, নামীর অনেক ক্ষেত্রে অন্যবস্তুর অপেক্ষা আছে, যেমন সাগর পার হতে রামচন্দ্রকে বানরদের সাহায্যে সাগর বন্ধন করতে হয়েছিল, কিন্তু অনেকেই 'রাম' নাম আশ্রয় করে অনায়াসে দুস্তর ভবসাগর পার হয়ে গেছেন। মহাপাপী রত্নাকর দস্যু রাম নাম গ্রহণ করেই বাল্মিকী মুনি হয়েছেন।

নিত্যানন্দের কৃপাতেই নামে রুচি হয়। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর

বলেছেন—"নাম উচ্চারণে ভক্তি হয়"। মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে বলেছেন,—

মূর্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি-ধন।
বুঝিলাম ঈশ্বরের তুমি পূর্ণ শক্তি।
তোমা ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণভক্তি॥ চৈঃ ভাঃ

মহাপ্রভু নাম-সাধকদের উদ্দেশ্যেই বলেছেন, প্রতি জীবে কৃষ্ণ আছেন, এই বোধে সম্মান দেবে।

উত্তম হৈয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥

এইরূপ হৈয়া যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়॥ চৈঃ চঃ

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলেছেন,—"মার খাইও, মারিও না। জীব দেহ নিত্যানন্দের বাস। জীব দেহে আঘাত করলে নিত্যানন্দকে আঘাত করা হয়। সব জীবে নিতাই-এর স্বরূপ দেখো।"

বর্তমান যুগকে প্রভু জগদ্বন্ধু 'প্রলয় যুগ' বলে উল্লেখ করেছেন। চারিদিকে এই সময় ভয় ও ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা ঘটতে থাকবে। এই প্রলয় আঘাত থেকে রক্ষার একমাত্র উপায়—"রাক্ষ হরিনাম", ইহাই প্রভুর সিদ্ধান্ত ও ভরসা বাক্য।

হরিনাম লও ভাই, আর অন্যগতি নাই,
হের প্রলয় এল প্রায়।—প্রভু জগদ্বন্ধু

মানবের সর্ববিধ কল্যাণ হরিনামে হবে। এযুগে হরিনামই মহাযজ্ঞ, ইহাতে শস্যবর্দ্ধন, ধান্যবর্দ্ধন ও ফলবর্দ্ধন হবে।

হরিনাম-তত্ত্ব বিষয়ে প্রভু জগদ্বন্ধু লিখেছেন—"হরিনাম শব্দ হরিঠাকুরের নাম নহে। যেমন পুষ্পবৎ বা পুষ্পবন্ত শব্দে চন্দ্র, সূর্য বুঝায়, সেইরূপ গুরু-গৌরাঙ্গ-গোপী-রাধাশ্যাম সব মিলিয়া এক হরিনাম। হরিবোল বললে সবই বলা হয়।"

নাম বিনা কলিযুগে নাহি আর ধর্ম।
সর্ব মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মন্ত্র॥

নিতাইয়ের করুণায় নামে রুচি জন্মে। এই ভয়ানক দুর্দিনে নিতাইয়ের করুণা জগৎময় পরিব্যাপ্ত হোক, জগৎ ভরে হরিনামের রোল উঠুক, জগতের দুঃখ অশান্তি দুর্যোগ অপগত হোক—এই প্রার্থনা জানাই নিত্যানন্দের আনন্দ-স্বরূপে।

জয় নিতাই! জয় জগদ্বন্ধু!

———

স্থান : ৭, ডোভার লেন, বালীগঞ্জ

তাং : ২১শে আগষ্ট, ১৯৬১

শ্রীরামানন্দ সংবাদ

(কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পরমাশ্চর্য দিব্য লীলা-তত্ত্বগুণ-প্রধান গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রচয়িতা, শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ কৃপা-পূত-জীবন, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী চরণৈক-স্মরণ, কুঞ্জে কস্তুরী মঞ্জরীরূপে সেবানিষ্ঠ, বাদরায়ণি শুকদেব অভিন্নজন-শ্রীল শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। উক্ত শ্রীগ্রন্থের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও পরম রসিক ভক্ত রায় রামানন্দের মিলন প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে।)

শ্রীগৌরহরি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে ৪৮ বৎসর কাল সর্বনয়ন-গোচরে বিরাজমান ছিলেন। মহাপ্রভুর লীলা-জীবনের প্রথম ২৪ বৎসর নদীয়ালীলা। উহা আদিলীলা বলে বর্ণিত। পরবর্তী ২৪ বৎসর সন্ন্যাস ও নীলাচল লীলা।

চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লা পক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥

সন্ন্যাস গ্রহণ করে মাতৃ আজ্ঞায় নীলাচলে অবস্থান করেন। শেষ চব্বিশের প্রথম ছয় বৎসর নীলাচল ধাম কেন্দ্র করে দক্ষিণ ভারত, বাংলাদেশ, কাশী-প্রয়াগ-বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ পদব্রজে পর্যটনছলে নাম-প্রেম বিতরণ করেন। এই ছয় বৎসরের লীলা মধ্যলীলা বলে কথিত। শেষ অষ্টাদশ বছর নীলাচল ধাম ছেড়ে কোথাও যান নি, এই লীলা মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের প্রতি পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে উক্ত পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়বস্তু নির্দেশক একটি শ্লোক আছে। মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভের শ্লোকটি এই—

সঞ্চার্য্য রামাভিধভক্তমেঘে
স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ
স্তজ্‌জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রয়াতি॥

—শ্রীগৌরাঙ্গরূপ সমুদ্র রায়রূপ ভক্তমেঘে নিজ ভক্তিসিদ্ধান্ত অমৃত সঞ্চার করিয়া তৎকর্তৃক বর্ষিত সেই সিদ্ধান্তস্বরূপ মাধুর্যামৃতের জ্ঞাতৃত্বরূপ রত্নের আলয় হইয়াছেন। সমুদ্র মেঘে জল সঞ্চার করে, সেই জল মেঘ হতে বর্ষিত হওয়ায় সমুদ্র রত্নের আলয় হয়। স্বাতি নক্ষত্রে বৃষ্টির জল শুক্তিতে পড়লে উহা মুক্তা হয়, এইরূপে সমুদ্র রত্নের আলয় হয়।

রামানন্দ সংবাদের বিষয়বস্তু সাধ্য-সাধন তত্ত্ব নিরূপণ। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই, এখানে প্রশ্নকর্তা মহাপ্রভু আর রায় রামানন্দ বক্তা। সর্বত্র দেখা যায়, বড় যিনি তিনি বক্তা, ছোট যিনি তিনি প্রশ্নকর্তা-শ্রোতা। এখানে একমাত্র ব্যতিক্রম—ভগবান শাস্ত্র বিষয়ে প্রশ্ন করছেন ও আকুল আগ্রহে শুনছেন ; ভক্ত যিনি, তিনি বলছেন ; শিষ্য যিনি, ছোট যিনি, তিনি বলছেন, আচার্য যিনি, বড় যিনি, তিনি শুনছেন। অদ্ভুত সংবাদ।

ভগবান সর্বজ্ঞ, তাঁর জানার কিছু বাকি থাকতে পারে না। শাস্ত্র বিষয়ে তিনি কেন প্রশ্ন করতে যাবেন? সর্ব বিষয়ে পূর্ণ যিনি, তাঁর তো কোন অভাব নেই। তবে কিসের প্রশ্ন তাঁর? এই রহস্য আমরা জানতে পারতাম না, যদি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রারম্ভিক শ্লোকটিতে উহার ইঙ্গিত না করতেন। সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে যে মেঘ হচ্ছে, উহা যেমন দেখা যায় না, সেইরূপ গৌরহরি ভক্তিসিদ্ধান্ত সকল রামানন্দে সঞ্চারিত করেছেন এবং যখন রামানন্দের মুখ হতে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব শুনলেন, তখন অপূর্ব ভক্তিসিদ্ধান্তের ক্রমপর্যায় জেনে তিনি লাভবান হলেন। রামানন্দ অবশ্য তা অনুভব করেছেন এবং মহাপ্রভুকে তা বলেছেন,—"মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা"। ছোট শিশুকে কথা শিখিয়ে তার মুখ হতে শুনে মা-বাবা আনন্দলাভ

করেন, মহাপ্রভুও ভক্তের মুখ হতে ভক্তি-সিদ্ধান্ত শুনে পরমানন্দ লাভ করেছেন।

প্রভু কহে আগে কহ শুনিতে পাই সুখে।
অপূর্ব অমৃত নদী বহে তোমার মুখে ॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলাচলে এসেছেন। তাঁর অদ্ভুত প্রেমবিকার দর্শন করে সকলের মনে হচ্ছে, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। ইতিমধ্যে সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে কৃপা করেছেন, ষড়ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়েছেন, এক অহঙ্কারী পণ্ডিত এখন পরম বৈষ্ণবে রূপান্তরিত হয়েছেন।

ভট্টাচার্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্বজন।
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ চৈঃ চঃ

নীলাচল আসার কয়েকদিন পর মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে (দক্ষিণ ভারত) গমন করেন। যাবার সময় সার্বভৌম বল্লেন,—যদি বিদ্যানগরে যান, তবে ঐ অঞ্চলের শাসনকর্তা রামানন্দ রায়ের সঙ্গে অবশ্য মিলিত হবেন, পরম কৃষ্ণভক্ত সে, তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে আনন্দ পাবেন।

মহাপ্রভু বিদ্যানগরে এসেছেন। গোদাবরী নদী দর্শন করে যমুনার কথা মনে হচ্ছে, নদীতীরের বনরাজি দর্শনে অন্তরে জেগেছে বৃন্দাবনের স্মৃতি। স্নান করে ঘাটের অদূরে বসে কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করছেন। সর্বাঙ্গে সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশিত হয়েছে। এমন সময় দোলায় চড়ে বাদ্য-বাজনা সহকারে রায় রামানন্দ এসেছেন স্নান করতে, সঙ্গে তার বহু লোকজন। মহাপ্রভু তাকে দেখে অনুমান করলেন, ইনি রায় রামানন্দ। যদিও তার সঙ্গে মিলিত হতে মন উৎকণ্ঠিত, তথাপি ধৈর্য ধরে বসে রইলেন। সহজেই রায় রামানন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল অদ্ভুত তেজঃপুঞ্জ কলেবর দিব্যদর্শন সন্ন্যাসীর প্রতি। নিকটে এসে দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। মহাপ্রভু তাঁকে রায় রামানন্দ জেনে দৃঢ় আলিঙ্গন করলেন। দুজনে দুজনের স্পর্শে ভাবাবিষ্ট হয়েছেন, অশ্রু-পুলক দেখা দিয়েছে সর্বাঙ্গে। বহিরঙ্গ লোক দেখে

মহাপ্রভু ভাব সংবরণ করলেন। মহাপ্রভু তাকে বল্লেন,—সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মুখে তোমার গুণের কথা শুনে তোমায় দর্শনের জন্য আমার এখানে আগমন। রামানন্দ তার উত্তরে বল্লেন,—সার্বভৌম আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, পরোক্ষেও আমার কল্যাণ চিন্তা করেন, তাই আপনাকে বলেছেন এখানে আসার কথা। যখন কৃপা করে এসেছেন, তখন অন্ততঃ দশদিন এখানে থেকে আমার অশুদ্ধ মন শুদ্ধ করুন। সন্ধ্যাকালে দুজনে নির্জনে মিলিত হবেন, এই আশ্বাস পেয়ে রামানন্দ গমন করলেন।

সন্ধ্যাকালে রায় রামানন্দ একজন মাত্র ভৃত্যসঙ্গে মহাপ্রভুর নিকট এলেন। দুজনে নিভৃত স্থানে বসে কৃষ্ণকথা আরম্ভ করলেন। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করছেন, রায় রামানন্দ উত্তর দিচ্ছেন।

প্রভু কহে পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়॥

সাধ্যের নির্ণয় করতে বলেছেন। সাধ্য কি? প্রতিটি মানবের জীবনের যা চরম লক্ষ্য, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন, জীবনের সকল প্রচেষ্টা দ্বারা যা লাভ করা শ্রেয়স্কর, যা লাভ করলে অন্য কিছু লাভ করা অধিক মনে হবে না, তাহাই সাধ্য। সাধ্য নির্ণয় করতে নিজের মনগড়া কথা বল্লে হবে না, শাস্ত্রানুকূলে বলতে হবে, তোমার অনুভব বা কথা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই—'পড় শ্লোক' কথাটার ইহাই তাৎপর্য। "তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্য-ব্যবস্থিতৌ"—গীতা-১৬/২৪ অর্থাৎ কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই প্রমাণ। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মশায় বলেছেন—"সাধু শাস্ত্র গুরু বাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য"। জীবন-যাত্রাপথের শেষ কোথায়, চরম লক্ষ্য বস্তু কোন্‌টি, তা পথিক মাত্রেরই জানা দরকার। লক্ষ্য বস্তু হতে যেন আমরা দূরে সরে না যাই, জীবনতরী যেন ঘাটের দিকেই চলে, অকূল সংসার সাগরে লক্ষ্য যেন স্থির থাকে, সে বিষয়ে সকলেরই সচেতন থাকা দরকার। তাহাই সাধ্য, জীবনের সর্বশক্তি, প্রযত্ন, চেষ্টায় যাহা লাভ করা উচিত।

রায় রামানন্দ উত্তরে বল্লেন,—"রায় কহে, স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।" প্রমাণ স্বরূপ বিষ্ণুপুরাণের একটি শ্লোক উল্লেখ করলেন,—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তত্তোষকারণং ॥

—অর্থাৎ পুরুষ বর্ণাশ্রম আচারবান হয়ে পরমপুরুষ বিষ্ণুকে আরাধনা করেন, সেই আরাধনা ভিন্ন বিষ্ণুর সন্তোষ বিধানের আর পথ নেই। ব্যক্তি ও পরিবার ও সমাজ জীবন এই বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুশাসনে শৃঙ্খলাবদ্ধ। বর্ণ ও আশ্রম নির্দিষ্ট ধর্ম পালনে ব্যক্তি-পরিবার-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। প্রত্যেক মানুষই এই বর্ণ ও আশ্রম ধর্মের অনুগত হয়ে জীবন যাপন করবেন। যথাযথ পালিত হলে শ্রীভগবান বিষ্ণু পরম প্রীত হন, তাঁর সন্তোষ বিধানের ইহা ছাড়া কোন উপায় নেই।

বর্তমান যুগে বর্ণ ও আশ্রম বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র চারি বর্ণের এই বিভাগ এখন আর নেই। ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ-বাণপ্রস্থ-সন্ন্যাস ঐ চারি আশ্রম বিভাগও লুপ্তপ্রায়। তবু মানবসমাজ যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে প্রত্যেক মানবের কিছু-না-কিছু কর্তব্য রয়েছে। পিতা-মাতারূপে সন্তান-সন্ততির প্রতি, সন্তানরূপে পিতা-মাতার প্রতি, স্বামী স্ত্রীর প্রতি, স্ত্রী স্বামীর প্রতি, প্রতিবেশী প্রতিবেশীর প্রতি, মানুষ যে সমাজবদ্ধ হয়ে আছে সেই সমাজের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি—অসংখ্য কর্তব্যের বন্ধনে সকলে আমরা বদ্ধ। ঐ সকল কর্তব্য যথাযথ পালিত হলে সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার সুন্দর ও শৃঙ্খলাযুক্ত হয়। শ্রীভগবান তাহাতে প্রীত হন।

মহাপ্রভু শুনে বল্লেন,—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।" "এহ বাহ্য" শব্দে রামানন্দের বক্তব্য ভুল, সমর্থনের অযোগ্য তা বোঝাতে চান নি। বক্তব্য ঠিকই আছে তবে আরও এগিয়ে যেতে হবে, এর থেকে গভীরে প্রবেশ করে উন্নততর কি সাধ্য বা জীবনের লক্ষ্য তা নির্ধারণ করতে হবে। যেমন, ভারতবর্ষ থেকে লণ্ডন যেতে হবে,

আপনি স্নোম এসেছেন, গন্তব্যস্থলের দিক ঠিক আছে, তবে আরও এগিয়ে যেতে হবে।

মহাপ্রভুর মন্তব্য শুনে রায় রামানন্দ বল্লেন,—"রায় কহে কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্য সার।" এর সমর্থনে গীতা শাস্ত্র গ্রন্থ হতে একটি শ্লোক উল্লেখ করেছেন। যথা—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

—ভগবান বল্লেন, হে অর্জুন! তুমি যে কর্ম করিতেছ, যাহা ভোজন, হোম, দান, তপস্যা করিতেছ, তাহা আমাকে সমর্পণ কর।

বিষ্ণুপুরাণের স্বধর্মাচরণের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে বলে মহাপ্রভু উহা বাহ্য বল্লেন। স্বধর্ম পালনে পালনকারীর অন্তরের কোন খবর নেই। যদি সেখানে অহঙ্কার, অভিমান, স্বসুখবাঞ্ছা বা ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে স্বধর্মাচরণ ত্রুটি যুক্ত হবে, শ্রীভগবান তাতে প্রীত হবেন না। সেজন্য পরবর্তীস্তরে সকল কর্ম শ্রীভগবানে অর্পণের কথা বলেছেন। এই অর্পণের ফলে কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হবে। কিন্তু ইহাও বাহ্য বলেছেন এবং উন্নত স্তর কিছু থাকলে তার উল্লেখ করতে বলেছেন (এহো বাহ্য আগে কহ আর)। রায় রামানন্দ তখন বল্লেন,—"রায় কহে স্বধর্ম ত্যাগ ভক্তি সাধ্য সার।" এর স্বপক্ষে শ্রীভাগবত ও গীতা হতে দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়া দিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্মান্ সংত্যজ যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥ (১১।১১।৩২) ভাঃ)

—শ্রীভগবান উদ্ধবকে বল্লেন—আমা কর্ত্তৃক দেবরূপে আদিষ্ট ধর্মসকল পরিত্যাগ করিয়া ও ধর্মাধর্মের দোষগুণ জানিয়া যিনি আমাকে ভজনা করেন, তিনিই উত্তম সাধু।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ গীতা-১৮।৬৬

—অর্থাৎ সকল ধর্ম ত্যাগ করিয়া তুমি আমার শরণাগত

হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।

'কৃষ্ণে কর্মার্পণ' বাহ্য বলেছেন। ইহাতে কি দোষ আছে যেজন্য মহাপ্রভু বাহ্য বলেছেন? অর্পণের মধ্যে একটা দোষ থাকতে পারে, অর্পণকারীর অহঙ্কার বা কর্তৃত্বাভিমান, সেক্ষেত্রে অর্পণ দোষযুক্ত হবে। সেজন্য পরবর্তী স্বধর্মত্যাগ অর্থাৎ অহং ত্যাগের কথা বলেছেন। সত্তাটা শ্রীভগবানে অর্পিত হলে, একান্ত শরণাগতির ফলে আপনার বলতে কিছু থাকবে না। কর্মের যে দুটি দোষ ফলাকাঙ্ক্ষা ও কৃত্বাভিমান, উহাদের প্রথমটি দূর হবে কৃষ্ণে কর্মার্পণে এবং দ্বিতীয়টি ত্যাগ হবে স্বধর্মত্যাগে, পূর্ণ শরণাগতিতে।

কিন্তু মহাপ্রভু উহাকে বাহ্য বলেছেন এবং আরও আগে বলার জন্য অনুরোধ করেছেন। 'স্বধর্মত্যাগ' গীতার একটা চরমভূমি, উহাকে কেন বাহ্য বল্লেন? গীতার এই শ্লোকে ভগবান বলেছেন, যদি আমার স্মরণ লও আমি সব পাপ থেকে মুক্ত করব, এই ভরসায় যে শরণ উহা খুব উজ্জ্বল নয়। যদি লাভের কোন আশা না থাকে, শরণাগতি যদি স্বতঃস্ফূর্ত হয় এবং উহার ফলে যদি সকল ধর্ম ত্যাগ হয়, তবেই হবে শরণাগতি সুন্দর ও ত্রুটিহীন। শরণাগতি হওয়া চাই স্বাভাবিক-ভাবে, কোন উপদেশ বা ভরসায় নয়। স্বামীকে ভালবাসা স্ত্রীর কর্তব্য এই উপদেশ শুনে যদি স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে, তবে তা উজ্জ্বল নয়, স্বাভাবিকভাবে ভালবাসা যদি জাগে তবেই তা সুন্দর। সেজন্য মহাপ্রভু 'এহো বাহ্য' বলে আগে বলার জন্য অনুরোধ করলেন।

রায় রামানন্দ তখন বল্লেন,—"জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্য সার।" এর স্বপক্ষে গীতা হতে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন,—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

—অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মে স্থিত, তিনি প্রসন্নচিত্ত, কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কিছু লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না, সব প্রাণীতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন ও পরমভক্তি লাভ করেন।

স্বধর্মত্যাগে শরণাগতি অপেক্ষা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি উন্নত স্তর বলেছেন রায় রামানন্দ, তার কারণ শ্রীভগবানই যে একমাত্র শরণ্য এই জ্ঞান যদি শরণাগতির পিছনে না থাকে তবে তা দুর্বল হতে পারে। সেজন্য ভগবদ্-তত্ত্বের জ্ঞান চাই, তবেই শরণাগতি দৃঢ় হবে। এই অবস্থা পরাভক্তি বা শুদ্ধাভক্তিলাভের পূর্বাবস্থা। কিন্তু মহাপ্রভু ইহাও বাহ্য বলেছেন। তখন রায় রামানন্দ বল্লেন,—"জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্য সার।" জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির দোষ এই, ঈশ্বরের জ্ঞান শুদ্ধাভক্তির পথে বাধক। জ্ঞানেতে সম্ভ্রমবোধ জাগায়। সম্ভ্রমবোধ প্রেম স্বাভাবিক মাধুর্য হারিয়ে ফেলে এবং সেই প্রেমে ভগবান প্রীত হন না।

ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সর্ব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্যে শিথিল প্রেম নহে মোর প্রীত ॥ চৈঃ চঃ

এজন্য মহাপ্রভু বাহ্য বলেছেন। জ্ঞানশূন্যায় জ্ঞানকে বাদ দিয়েছেন। ঈশ্বর তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রয়োছন ছিল শরণাগতি দৃঢ় করার জন্য। এখন জ্ঞানের আর প্রয়োজন নেই। জ্ঞানশূন্যায় জ্ঞান নেই যে, তা নয়। জ্ঞান ঠিকই আছে কিন্তু জ্ঞানের কোন ক্রিয়া থাকবে না। জ্ঞানের পূর্ণতায় জ্ঞানের ক্রিয়া না থাকায় জ্ঞানহীনের মত মনে হয়। এই অবস্থায় প্রেমভক্তি লাভের পথ সুগম হয়। ধূপকাঠি জ্বালতে প্রথমে আগুন ধরাতে হবে, আগুন ধরলে উহা নিবিয়ে দিতে হবে, তবেই সুগন্ধ পাওয়া যাবে। জ্ঞান পূর্ণ ও জ্ঞান শূন্য উভয়েই বাহ্যদৃষ্টিতে সাম্য আছে, যেমন শূন্য কলসী ও পূর্ণ কলসী, উভয়েই জলের কোন শব্দ নেই। যেখানে জ্ঞানের প্রকাশ বা কচকচি আছে, বুঝতে হবে জ্ঞানের পূর্ণতা আসে নি। শ্রীভগবানকে অজ্ঞ ব্যক্তি জানে না, ব্রজের গোপীরা-সখারা-মায়েরাও কৃষ্ণকে জানেন না ভগবান বলে। এঁদের জ্ঞান পূর্ণরূপেই আছে, গভীর ভালবাসায় উহা আচ্ছন্ন হয়েছে। সখারা এঁটো ফল কৃষ্ণের মুখে দিচ্ছেন, মনে হবে যে শাস্ত্রজ্ঞান নেই, ভগবানকে কিরূপ শুদ্ধাচারে দেওয়া কর্তব্য জানে না। কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানের ভূমিতে এঁরা আছেন, কৃষ্ণের প্রতি

গভীর ভালবাসা সব জ্ঞানকে ঢেকে ফেলেছে। রায় রামানন্দ এই জ্ঞানশূন্যা ভক্তির সমর্থনে উদাহরণ দিয়েছেন শ্রীভাগবত হতে—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাড় নমস্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্তাম্।
স্থানস্থিতাঃশ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যেপ্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ ভা ১০/১৪৪

—ব্রহ্মা শ্রীভগবানকে বল্লেন, যাঁরা জ্ঞানের প্রয়াস ঈষন্মাত্রও না করে সাধুদিগের নিবাস স্থানে অবস্থান করে, তোমার অথবা তোমার ভক্তের বার্তা দেহ-বাক্য-মন দ্বারা প্রণাম করতঃ সেই সাধুর নিকট শ্রবণ পূর্বক অবস্থান করিতেছেন, তুমি ত্রিলোকের সর্বত্র অজেয় হলেও সেই ভক্তের দ্বারা পরাজিত হও।

এইবার মহাপ্রভু বল্লেন,—"এহো হয়, আগে কহ আর।" অর্থাৎ এতক্ষণে শুদ্ধাভক্তির অন্দরে প্রবেশ করেছ, আরও অগ্রসর হও। তখন রায় রামানন্দ বল্লেন,—"প্রেমভক্তি সর্বসাধ্য সার।" জ্ঞানশূন্যা ও প্রেমভক্তি প্রায় একই। জ্ঞানশূন্যায় জ্ঞান নেই, এই বোধ আছে, অন্ধকার ঘরে বসে আছেন, ঘরে কি আছে জিজ্ঞাসায় বল্লেন—কিছু নেই। কিছু যে নেই, এটাও জ্ঞানের বিষয়। প্রেমভক্তিতে এ-জ্ঞানও নেই, আছে ভগবানে তীব্র সর্বাতিশায়ী আকর্ষণ। এই প্রেম কথাটাই শুনতে চান মহাপ্রভু।

প্রেম বস্তু কি? যেমন খাদ্যবস্তু গ্রহণের লালসা ক্ষুধা, কৃষ্ণ-প্রাপ্তির দুর্দমনীয় লালসাই প্রেম। খাদ্যবস্তু আস্বাদনের জন্য ক্ষুধা যেমন অপরিহার্য, সেইরূপ কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের জন্য প্রেম অপরিহার্য। খাদ্য আছে ক্ষুধা নেই, খাদ্য কিছু আস্বাদিত হবে না। কৃষ্ণ আছে প্রেম নেই, কৃষ্ণ-মাধুর্য ভোগ হবে না, যেমন কংস ও শিশুপালের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কৃষ্ণ আছেন তাদের সামনে অথচ প্রেম না থাকায় কৃষ্ণ-মাধুর্য কিছুই আস্বাদন সম্ভব হয় নি। আবার ক্ষুধা আছে খাদ্য নেই, এ অবস্থা খুবই কষ্টকর। সেইরূপ প্রেম আছে কৃষ্ণ নেই, এরূপ অবস্থা কষ্টদায়ক নয় কি? না, এরূপ ঘটা সম্ভব

নয়। প্রেম যেখানে আছে, কৃষ্ণ সেখানে থাকবেনই। প্রেম কৃষ্ণাকর্ষী, কৃষ্ণ যেখানেই থাকুন, প্রেম তাঁকে আকর্ষণ করে আনে। জ্ঞানশূন্যায় কৃষ্ণে নিষ্ঠা জেগেছে এবং বিষয়ে বিতৃষ্ণা আছে, কিন্তু প্রেমভক্তির মত কৃষ্ণের জন্য দুর্দমনীয় লালসা নেই। তাই প্রেমভক্তির স্তর জ্ঞানশূন্যা ভক্তি হতে উন্নত। প্রেমভক্তির সমর্থনে দুটি শ্লোক উচ্চারণ করেছেন রায় রামানন্দ। যথা,—

(১) নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জঠরা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো নন্থু ভক্ষ্যপেয়ে॥ (রামানন্দ কৃত
শ্লোক পদ্যাবল্যাম্, ১১ অঙ্ক)

—অর্থাৎ বিভিন্ন উপচারকৃত পূজা ব্যতীত প্রেম দ্বারা ভক্তহৃদয় সুখে, দ্রবীভূত হয়। যতক্ষণ জঠরে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রবল থাকে ততক্ষণই ভক্ষ্য ও পেয় সুখের কারণ হয়।

(১) কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

—অর্থাৎ যদি কৃষ্ণভক্তি-রসভাবিত চিত্ত কোথাও পাও, তবে উহা ক্রয় করে রাখ, উহা ক্রয়ের একমাত্র মূল্য কৃষ্ণের জন্য তীব্র লালসা, কোটি জন্মের সুকৃতির বিনিময়ে লভ্য নয়।

প্রেম যদি থাকে, তবে ভগবানের পূজার জন্য অন্য কোন উপচারের প্রয়োজন হয় না। ভোজনকারীর প্রতি গ্রাসে তুষ্টি পুষ্টি ও ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ প্রেম-আরাধনায় ভক্তি, ঈশ্বরানুভব ও বৈরাগ্য লাভ হয়। কৃষ্ণকে পাওয়ার একমাত্র উপায় কৃষ্ণের জন্য লালসা অর্থাৎ প্রেম।

মহাপ্রভু বল্লেন,—“এহো হয়, আগে কহ আর।” মহাপ্রভু আরও গভীরে কেন যেতে বল্লেন? প্রেম একটা দুর্লভ ও উন্নততর অবস্থা।

আসলে প্রেম একটা স্থিতাবস্থা, উহার মধ্যে সম্বন্ধের যোগ না হলে উহা গতিশীল, বৈচিত্র্যময় বা সুখাতিশায়ী হয় না। তখন রায় রামানন্দ বল্লেন,—দাস্য প্রেম সর্বসাধ্য সার।" এর সমর্থনে দুটি শ্লোক উচ্চারণ করেছেন,—

(১) যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে ॥ (ভাগবত ৯/৫/১৬)

—অর্থাৎ, দুর্ব্বাসা মুনি ভক্ত অম্বরীষকে বল্লেন,—যাঁর নাম শ্রবণ মাত্র জীব মায়াবন্ধন হতে মুক্ত হয়, সেই তীর্থপদ ভগবানের দাসগণের আর অভাব কি আছে, অর্থাৎ কোন অভাব নেই। কর্মার্পণ, শরণাগতি সেবা ইত্যাদি সবই সার্থক, যিনি শ্রীভগবানে "দাস্য ভক্তি লাভ করেছেন। শ্রীহনুমানজী দাস্যভক্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

২) দ্বিতীয় শ্লোকটি গোস্বামিপাদোক্ত, যথা—
ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরং প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্ ॥

—অর্থাৎ হে নাথ! সেই অতি নীচ আমি, সর্বপ্রকারে বিবিধ বিষয় বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক তোমার একমাত্র কিঙ্কর হইয়া সর্বদা তোমার সেবা করতঃ কবে আপন জীবন আনন্দিত করিব। জীবের স্বরূপ কৃষ্ণ-দাস, কৃষ্ণ-সেবা ভাগ্য লাভই পরম পুরুষার্থ।

এই দাস্যভক্তি মহাপ্রভু অনুমোদন করে বল্লেন,—"এহো হয় আগে কহ আর।" দাস্যরতিতে ভগবানের প্রতি গৌরব বোধ থাকেই। ভক্ত সকল সময়ে ভাবেন, আমি দাস তিনি প্রভু। প্রভুর আজ্ঞা পালন আমার কর্তব্য, আমার ধর্ম। প্রভু কখনও ভুল বা অন্যায় করতে পারেন না। দাস-ভক্তের সেবাতেও সঙ্কোচ থাকে, প্রভুর প্রতি গৌরব বোধ অতিশয় থাকায় নিজের ইচ্ছামত কিছু করতে পারেন না। সেজন্য উন্নততর ভক্তির স্তর মহাপ্রভু জানতে চাইলেন।

রায় রামানন্দ তখন বল্লেন,—"রায় কহে সখ্য প্রেম সর্বসাধ্য সার।" এর সমর্থনে শ্রীভাগবতের একটি শ্লোক বল্লেন,—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহ্রু কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥
(ভাঃ ১০।১২।১০)

—অর্থাৎ যিনি জ্ঞানীদিগের নিকট ব্রহ্মসুখরূপে প্রতীয়মান হন, দাসভক্তগণের নিকট পরমদেবতারূপে প্রতীয়মান হন এবং মায়াশ্রিত মানুষের নিকট সামান্য নরবালকরূপে প্রকাশীভূত, তাঁর সঙ্গে কৃতপুণ্যপুঞ্জ ব্রজবালকগণ বিহার করেছিলেন।

রায় রামানন্দ ব্রজের শুদ্ধ ঐশ্বর্যজ্ঞানশূন্য সখ্য রসের কথা বললেন। ব্রজের বাইরে যে সখ্য, যেমন অর্জুন বা উদ্ধবের মধ্যে ঐশ্বর্যবোধ আছে। সেজন্য উহা বিশুদ্ধ সখ্য নয়, দাস্যই প্রধানতঃ সেখানে আছে। ব্রজের সখ্য বিশ্রম্ভ প্রধান। সখাদের কৃষ্ণের সঙ্গে একেবারেই অভিন্নমনন এবং তাঁদের সেবায় নেই কোন সঙ্কোচ-বোধ। কৃষ্ণ সম্বন্ধে সখাদের ভাবনা, 'তুমি কোন্ বড়লোক তুমি আমি সম।' কৃষ্ণের মুখে উচ্ছিষ্ট খাবার বা ফল দিতে তাঁদের মনে কোন দ্বিধা আসে না। খেলায় হেরে গিয়ে শ্রীদাম সখাকে কাঁধে নিয়ে কৃষ্ণ চলেছেন, কৃষ্ণ ছুটছেন, পাছে সখা পড়ে যান সেজন্য শ্রীদামের চরণ দুটি বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। এতে কৃষ্ণ বা সখার মনে কোন দ্বিধা বা সংকোচ নেই। সখ্যরসের ভক্তের এই উজ্জ্বল প্রীতির নিদর্শনে মহাপ্রভু খুব খুসী হলেন। তখন বললেন,—

প্রভু কহে, এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে, বাৎসল্যপ্রেম সর্ব-সাধ্য-সার॥

সখ্যপ্রীতি হতে মায়েদের বাৎসল্যস্নেহের উৎকর্ষ বা মাধুর্য বেশী। এই বাৎসল্য অবশ্যই ব্রজের। সখা কখনই ভাবতে পারে না, কৃষ্ণ ভুল করতে পারে বা অন্যায় করতে পারে। কৃষ্ণ যা করেন বা বলেন, সখার মনে হয় তাই ঠিক। কিন্তু বাৎসল্য রসবতী মায়েরা ভাবেন, কৃষ্ণ ছোট সেজন্য তাঁর বুদ্ধি কম, সে ভুলও করতে পারে, অন্যায়ও করতে পারে। মা নিজেকে বড় মনে করেন। মায়ের মমতাধিক্য বেশী, সেজন্য ভাবেন কৃষ্ণ অসহায়, তিনি তাঁকে না দেখলে

সে বড়ই বিপন্ন। তাছাড়া কৃষ্ণ ছোট ছেলে, সে অন্যায় করতে পারে, সেজন্য তাঁকে শাসন করার দরকার হতে পারে, প্রয়োজনে তাড়ন-ভর্ৎসন করেন মা কৃষ্ণকে।

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধরতি॥
আপনারে বড় ভাবে আমারে সমহীন।
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥ (চৈঃ চঃ আদি-৪)

ভগবান বাৎসল্য রসের ভক্তের একান্ত অধীন হয়ে পড়েন। দাস্যে সকল সময় ভক্ত কৃষ্ণকে ভাবেন শ্রেষ্ঠ, সখ্যে ভাবেন 'তুমি আমি সম' এবং বাৎসল্যে কৃষ্ণকে হীন, ছোট মনে করেন। বাৎসল্য রসের দুটি উদাহরণ দিয়েছেন শ্রীভাগবত হতে।

(১) নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এব মহোদয়ম্।
যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥ (১০-৮-৪৬)

—অর্থাৎ রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করেন—হে ব্রহ্মন্। নন্দগোপ মহাফলযুক্ত কি মঙ্গলজনক কার্য করেছেন, মহা ভাগ্যবতী মা যশোদাই বা কি মঙ্গলজনক কার্য করেছেন যে শ্রীহরি তাঁর স্তন পান করেছিলেন?

(২) নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥ (১০-৯-২০

—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হতে শ্রীযশোদা যে যে প্রসাদ পেয়েছেন, তা ব্রহ্মা, মহাদেব বা অঙ্গস্থিতা লক্ষ্মীদেবীও প্রাপ্ত হননি॥

মহাপ্রভু অত্যন্ত খুসী হয়ে বললেন,—

প্রভু কহে—এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে—কান্তাপ্রেম সর্ব সাধ্য সার॥

কান্তা প্রেম দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য রস হতে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য রসের গুণ কান্তা প্রেমে বিদ্যমান। কৃষ্ণ সেবার চরম পরাকাষ্ঠা এই প্রেমে।

সর্বতোভাবে কৃষ্ণের সেবা, দেহ-মন-প্রাণ সর্বস্ব দিয়ে সেবা এক কান্তা-প্রেমেই দৃষ্ট হয়। কান্তাগণ নিজেদের দেহকে কৃষ্ণসেবার উপচার বলেই ভাবেন, তাঁদের সমস্ত সত্তাটা কৃষ্ণকে সেবা-সুখ দানে নিয়োজিত, আপনার বলতে কিছু নেই তাঁদের। এই প্রেমের উদাহরণ ব্রজের গোপিণীগণ। তাঁদের সব সত্তা কৃষ্ণময়, নিজ দেহাভিনিবেশ পর্য্যন্ত নেই। দেহাভিনিবেশ না থাকলে কেন তাঁরা দেহের মার্জন, অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করেন? তার উত্তর দিয়েছেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—

যদ্যপি দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেই তো কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ দর্শি স্পর্শি কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করে দেহের মার্জন ভূষণ॥ চৈঃ চঃ

সকল রসের গুণ কান্তা-প্রেমে থাকায় এই রসের মাধুর্য সর্বাতিশায়ী এবং কৃষ্ণের পরিপূর্ণ আনন্দদায়ী।

পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥

কান্তা-প্রেমের উদাহরণ স্বরূপ ভাগবতের দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন,—

(১) নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিন গন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ—
লব্ধাশিষাং য উদ্‌গাদ্‌ব্রজবল্লবীনাম্॥ (ভাঃ ১০-৪৭-৬০)

—অর্থাৎ রাসোৎসবে যাঁদের কণ্ঠ ভগবানের ভুজদণ্ড কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল, সেই ব্রজসুন্দরীগণের প্রতি তাঁর যে প্রসাদ

(প্রেমপূর্ণ আচরণ) উদিত হয়েছিল, তা নারায়ণের বক্ষস্থিতা নিতান্ত-রতি লক্ষ্মীদেবীর প্রতি উদয় হয় নি। তখন স্বর্যোষিত অর্থাৎ শ্রীউপেন্দ্রাদি পত্নীগণের প্রতি কিরূপে হবে, অন্য স্ত্রীজাতির উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়।

(২) তাসাং আবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধঃ স্রগ্বী সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথঃ॥

—বনমালী শ্রীকৃষ্ণ পীতাম্বরধারণ পূর্বক ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে সাক্ষাৎ মন্মথের মন্মথরূপে সেই গোপী-মণ্ডলীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

পাঁচটি স্থায়ী রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর (কান্তা-প্রেম)। শান্তরসের গুণ—কৃষ্ণনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ (কৃষ্ণ ছাড়া অন্য বস্তুতে অনুরাগ না থাকা); দাস্যরসে আছে, অধিকন্ত আজ্ঞা পালনরূপ সেবা। দাস্যের সব গুণ সখ্যে আছে, অধিক আছে অভিন্নমনন ও অসংকোচে সেবা। সখ্যের সবগুণ বাৎসল্যে আছে, অধিকন্ত মমত্বাধিক্য হেতু তাড়ন-ভর্ৎসন। বাৎসল্যের সব গুণ মধুর রসে আছে, অধিক দেহ-আত্মদানে সর্বতোভাবে সেবা।

শেষ তিনটি রস—যথা সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসকে মহাপ্রভু উত্তম বলেছেন। ব্রজে এই তিন রসেই রতি বা Romance হয় অর্থাৎ প্রিয়ের প্রতি ভালবাসায় সমস্ত সত্তাটা ন্যস্ত (involved) হয়। সখ্যে বা বাৎসল্যে রতি জগতের কোন কাব্য বা সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। এক ভাগবত রস-শাস্ত্র উহার সাক্ষ্য বহন করেছেন। এই তিন রসে যারা আছেন, প্রত্যেকেই সেই সেই রসে ডুবে আছেন। এক রস হতে অন্য রসের উৎকর্ষ যে বেশী, তা তাঁরা মনে করেন না বা ভাবতে পারেন না।

এক রস হতে অন্য রসের উৎকর্ষ বেশী, তার বিচার করবে কে? যিনি এক রসে আছেন, তিনি সেই রসেই ডুবে আছেন, অন্য রসের খবর জানেন না। সুতরাং তিনি বিচারক হতে পারেন না। যিনি তিন রসেই আছেন তিনি বিচারক হতে পারেন। কিন্তু ব্রজের এই তিন রসের যোগ্যতা কারও নেই। যিনি যে রসে আছেন, তিনি

সেই রসে ডুবে গেছেন। সুতরাং একাধিক রসে কারও থাকা সম্ভব নয়। যদি কেউ ভাবেন তিনি তিন রসেই আছেন, তবে বুঝতে হবে তিনি কোন রসেই নেই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই বিচারকের সংবাদ দিয়েছেন,—

কিন্তু যার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম।
তটস্থ হয়ে বিচারিলে আছে তারতম॥

তটস্থ বিচারক কে? যিনি এক রসে থেকে অন্যরসের নিকটবর্তী হয়েছেন, তিনিই তটস্থ বিচারক। সুবল, উজ্জ্বল, মধুমঙ্গল—এঁরা সখ্য রসে থেকে মধুর রসের নিকটবর্তী হয়েছেন। এঁরাই কেবল উপলব্ধি করতে পারেন, রসের খেলায় থেকেও কৃষ্ণের সখ্য রসে আর মন নেই, বাৎসল্য বা মধুর রসের আকর্ষণ তাঁর তীব্রতর। সখা কৃষ্ণের আর খেলা ভাল লাগছে না। মা যশোদা বা শ্রীরাধার আকর্ষণ তাঁর (কৃষ্ণের) অধিকতর। সখার অন্তর বুঝে তাঁরা তখন সেই রসের সঙ্গে মিলনের উদ্যোগ করেন।

দাস্য ভক্তি ছিল জগৎ জীবের চরম গতি। উন্নততর ভক্তিরস, যথা সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরে কোন প্রবেশাধিকার ছিল না। অহেতুক কৃপাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু এসে সকল জীবকে সেই অধিকার দিলেন, ব্রজের রাগানুগা মার্গের ভক্তিলাভের পথ সুগম হল। মা যশোদার আনুগত্যে বাৎসল্য রসের ভজনে মা যশোদার আস্বাদিত মাধুর্য ভোগ হবে। ব্রজগোপীর আনুগত্যে ভজনের উপদেশ দিয়েছেন শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মশায়—

রাগের ভজন পথ, কহি এবে অভিমত,
লোক বেদ সার এই বাণী।
সখীর অনুগা হৈয়া, ব্রজে সিদ্ধদেহ পাইয়া,
সেইভাবে জুড়াবে পরাণী॥

আনুগত্যময় ভজন ছাড়া কারও পক্ষে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া সম্ভব নয়। আনুগত্য না থাকায় স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও পান নি।

রাগানুগা মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সখি অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য জ্ঞানে।
ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্র নন্দনে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিলা ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ চৈঃ চঃ

রায় রামানন্দ কান্তা প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করে বক্তব্যের উপসংহার করলেন—

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥ চৈঃ চঃ

গীতায় ভগবানের প্রতিজ্ঞা আছে, যে যেমন ভজনা করেন, তাকে তিনি সেভাবে ভজনা করেন, করুণা করেন, ভক্তের প্রেমের ঋণ শোধ করেন। কিন্তু রাসলীলায় তিনি নিজ মুখে স্বীকার করেছেন, গোপীগণের অনুরূপ ভজনা তাঁর পক্ষে কখনই সম্ভব নয়।

এই প্রেমের অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥ চৈঃ চঃ

রায় রামানন্দের বিষয় বস্তু পরিবেশনে পরম প্রীত হয়ে মহাপ্রভু বল্লেন,—

প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করে কহ যদি আগে কিছু হয়॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু উহা (কান্তাপ্রেম) সাধ্যের শেষ সীমা বলেও কেন আরও আগে শুনতে চাইলেন? সব গোপীদের প্রেম-মাধুর্যের কথা একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন রায় রামানন্দ। গোপীদের মধ্যে যদি কারও প্রেমের অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা কিছু থাকে, তার কথা বলা হল না, আমরা সেক্ষেত্রে ঠকে গেলাম। যদি কোন গানের আসরে সকলে সমবেত সংগীত পরিবেশন করছেন, সেই গায়ক-গায়িকাগণের মধ্যে যদি কারও পারদর্শিতা খুব বেশী থাকে বা কণ্ঠের অপূর্ব মাধুর্য থাকে, তবে তার গান আলাদা করে না শুনলে আমাদের যেমন ক্ষতি,

সেইরূপ বিশেষ কোন গোপীর প্রেমের অনন্যসাধারণ মাধুর্য আলাদা করে শুনতে হবে। রায় রামানন্দ তা অনুভব করে বল্লেন—

রায় কহে ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥ চৈঃ চঃ

ইতিপূর্বে রায় রামানন্দ 'সাধ্যাবধি' বলেছিলেন কান্তা প্রেমের ক্ষেত্রে। এখন শ্রীরাধার প্রেমকে বল্লেন সাধ্য শিরোমণি। রাধা-প্রেমের সর্বাতিশায়ী মাধুর্য. উহা পৃথকভাবে না বল্লে, ব্রজ-প্রেমের কথা অপূর্ণ থেকে যায়। ত্রিজগতে রাধা প্রেমের উপমা মেলে না। শ্রীরাধার প্রেম সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥ চৈঃ চঃ

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—ত্রিলোকমধ্যে পৃথিবী ধন্যা, যেখানে আমার বৃন্দাবন পুরী। সেই বৃন্দাবনে গোপিকা ধন্যা, যে গোপিকাগণ মধ্যে আমার রাধা নামে বল্লভা আছেন (ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী। তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম। —পুরাণ বাক্য)। রাধিকা—"রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্বাধিকা।" বক্তব্যের সমর্থনে ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

—ইনি নিশ্চয় ভগবান শ্রীহরিকে আরাধনা করিয়া বশীভূত করিয়াছেন, যেহেতু আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগোবিন্দ ইহাকে একান্ত স্থানে লইয়া গিয়াছেন। রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করলে কৃষ্ণকে বনে বনে গোপীগণ খুঁজতে থাকেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন খুঁজে পান, সেই সঙ্গে আর একজন গোপীর পদচিহ্ন দেখতে পান। গোপীগণ তখন ঐ কথা বলেছিলেন। সুতরাং সেই গোপী শ্রীরাধা সকল গোপীগণ হতে অতিশয় শ্রেষ্ঠা।

শ্রীরামানন্দের এই বক্তব্যে মহাপ্রভু একটি সংশয় প্রশ্ন তুলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে চুরি করে নিয়ে গেছেন, এতে মনে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অন্য গোপীর প্রেমের অপেক্ষা আছে, এতে রাধা প্রেমের মহিমা স্থাপিত হল না। যদি অন্য গোপীদের সম্মুখেই শ্রীরাধাকে নিয়ে যেতেন, তবে রাধাপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রমাণিত হোত।

চুরি করি রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈল প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে ॥
রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ ॥

এই প্রশ্নের উত্তরে রায় রামানন্দ বল্লেন,—রাসলীলায় যত গোপী তত কৃষ্ণ হয়ে প্রত্যেক গোপীর পাশে এক কৃষ্ণ আছেন। রাধিকা ইহা একাই দর্শন করেন এবং মান হেতু রাসমণ্ডলী ছেড়ে যান। তখন শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলী ছেড়ে রাধাকে খুঁজতে গেলেন।

শত কোটি গোপী সঙ্গে রাসবিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্তি রহে রাধা পাশ ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ॥
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেল মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইল শ্রীহরি ॥
সম্যক বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥
তাহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥ চৈঃ চঃ

শ্রীরাধাকে বাদ দিয়া অন্যান্য শত কোটি গোপী উপস্থিত থাকলেও রাসলীলা হবে না। ফুলের মালার শৃঙ্খলা রক্ষা করে ফুলের মালার মধ্যকার সূত্রটি, উহা ভিন্ন মালা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, শ্রীরাধা সেই রাসলীলার শৃঙ্খলস্বরূপ। প্রত্যেক গোপী রাধাভাবময় হইলেই রাসলীলা সম্ভব হয়। যদি গোপীগণ রাধাভাব হতে বিচ্যুত হন,

তবে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে রাসলীলা অসম্ভব হয়। শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দে বসন্তরাসের বর্ণনা হতে ইহার উদাহরণ দিয়েছেন—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥

—কংসারি কৃষ্ণ সম্পূর্ণ সাররূপ রাসলীলা-বাসনা বদ্ধা রাধাকে হৃদয়ে লইয়া অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিয়া গেলেন।

শ্রীরাধাকে হারিয়ে শ্রীরাধার খোঁজে শ্রীকৃষ্ণ গেলেন। রাধাকে হৃদয়ে নিয়ে গেলেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর রাধাময়। শ্রীরাধা ছাড়া রাসলীলা বাসনা সিদ্ধ হয় না। শ্রীরাধাই কৃষ্ণের সর্বস্ব। অন্যান্য গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের রাধা সহ ক্রীড়ারসের বৃদ্ধির উপকরণ মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণ সাধ্যবস্তু, তাঁকে লাভ করাই পরম পুরুষার্থ। সকলে কৃষ্ণকে খোঁজ করে, কৃষ্ণ কাউকে খোঁজেন না। রত্নকেই সবাই খোঁজে, রত্ন কাউকে খোঁজে না। রসের ভূমিতে শ্রীভগবান কাঙ্গাল। তিনি খোঁজ করেন, রসরাজ্যের চরমভূমি শ্রীরাধাকে না পেয়ে খোঁজেন। শিখতে হবে কেমন করে খুঁজতে হয়। কার কাছে শিখবেন? যিনি খুঁজতে জানেন, দেহ-দেহ-সমাজ-সংসার ভুলে খুঁজছেন, সেই ব্রজের গোপী শ্রীরাধাকে অন্তরে নিয়ে, রাধাভাব মণ্ডিত হয়ে খুঁজছেন। মহাপ্রভু প্রফুল্ল চিত্তে বল্লেন—

প্রভু কহে যে লাগি আইলাম তোমা স্থানে।
সেই সব বস্তু তত্ত্ব হইল মোর জ্ঞানে ॥

সাধ্য-সাধন তত্ত্ব অবগত হলাম। এখন আগে আর কিছু শোনবার ইচ্ছা, কৃপা করে বল।

এবে সে জানিল সাধ্য-সাধন নির্ণয়।
আগে আর কিছু শুনিবার মন হয় ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ।
রস কোন্ তত্ত্ব প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ ॥
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহত আমারে। চৈঃ চঃ

রায় রামানন্দ বল্লেন,—ঐ সকল বিষয় আমি কিছুই জানি না।

যা তুমি আমাকে দিয়ে বলাচ্ছ আমি তাই বলছি, সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, তোমার লীলা বোঝা দায়।

তোমার শিক্ষায় পড়ি যে শুকপাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট॥
হৃদয়ে প্রেরণ কর জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি॥

তখন কৃষ্ণ কথা শুনতে মহাপ্রভুর প্রবল ইচ্ছায়, রায় রামানন্দের অন্তরে নূতন প্রেরণা সঞ্চারিত হল। কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ, রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব কথা বল্লেন। সে সকল শুনে শোনার বাসনা মহাপ্রভুর বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও আগে শুনতে চাইলেন। তখন, "রায় কহে, ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর"। অর্থাৎ এর পরে রায়ের বুদ্ধিতে আর কিছু প্রবেশ করছে না। তবু আপন অন্তরের প্রেরণায় বলতে লাগলেন,—

যেবা প্রেমবিলাস বিবর্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥ চৈঃ চঃ

মিলনে বিরহের স্ফূর্তি প্রেমবিলাস বিবর্তে। বিরহের কথায় প্রভুর বেদনা উপস্থিত হতে পারে, এই ভাবনা রামানন্দের। তিনি ইহার বর্ণনায় নিজকৃত একটি গীত—যেমন "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল", উচ্চরণ করলেন। প্রেমবিলাস বিবর্তের মূর্তিই শ্রীমন্মহাপ্রভু। রাধা-কৃষ্ণ মিলিত তনু তাঁর, অথচ নিরন্তর বিরহ বেদনার স্ফূর্তি। মহাপ্রভু দেখলেন তাঁর প্রচ্ছন্ন স্বরূপটি প্রকাশ হয়ে পড়ছে, তাই আর শুনতে চাইলেন না, রামানন্দের মুখ চাপা দিলেন নিজ হাতে— "প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল"।

ভগবানের সঙ্গে প্রেমের ক্রমপর্যায়ে শান্ত রস গাঢ় হতে হতে মধুর রসে চরম পরিণতি লাভ করেছে। সম্বন্ধহীন অবস্থা হতে সম্বন্ধ এসেছে এবং উহার গাঢ়তম অবস্থায় প্রেম সম্বন্ধাতীত হয়েছে। রাম ও সীতার প্রেম সম্বন্ধানুরাগ, একটা সম্বন্ধ ভিত্তি করে প্রকটিত। প্রেমই কেবল আছে, সব সম্বন্ধ গেছে ডুবে, এই রাধাভূমির প্রেমের

বৈচিত্র্য শুনতে চান মহাপ্রভু। পরম রসিক উক্ত গীত রামানন্দের মুখে শ্রবণ করে পরিতৃপ্ত হয়েছেন।

শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণে গভীর প্রেম নিয়েই জন্মেছেন। বৃষভানু রাজার নন্দিনী রাধা জন্মান্ধ। অপরূপ সুন্দরী কন্যা, অথচ চক্ষু বোজা। কৃষ্ণের বদন দর্শন না করে অন্য কিছু দেখবেন না—এই প্রতিজ্ঞা করে এসেছেন। মা যশোদা কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে কন্যা দেখতে এসেছেন। কৃষ্ণের স্পর্শ পেয়ে শ্রীরাধা চোখ খুলে প্রথমেই কৃষ্ণ বদন দর্শন করলেন। কন্যার চক্ষু লাভে আনন্দে আত্মহারা হলেন পিতামাতা। শ্রীরাধার প্রেম বিভু, বাড়বার স্থান নেই, তবু সদাই বাড়ে। চরমে উভয়ে একাত্মতা প্রাপ্ত হয়েছেন। এই মিলিত স্বরূপটি মহাপ্রভু। তাঁর এই প্রচ্ছন্ন স্বরূপটি প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই রামানন্দের মুখ ঢাকলেন।

কিন্তু ভক্তের কাছে ভগবান হেরে যান। ধরা দিতে না চাইলেও রামানন্দ প্রেমবলে মহাপ্রভুর স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। তাই বলছেন—

পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুই শ্যাম গোপরূপ ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা ॥

মহাপ্রভু বল্লেন,—তুমি মহাভক্ত, সেজন্য যেখানে সেখানে তোমার ইষ্টমূর্তির দর্শন হয়। রায় রামানন্দ বল্লেন,—তোমার চালাকি ছাড়, আমি জানি তুমি—

রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিছ অবতার ॥

মহাপ্রভু দেখলেন, আর লুকান সম্ভব নয়,—

তবে হাসি প্রভু তারে দেখাল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ ॥

আর বল্লেন,—

গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্র সুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥

অর্থাৎ মহাপ্রভু যে রাধা-কৃষ্ণ মিলিত তনু তা স্পষ্টই উল্লেখ করলেন। আর বল্লেন,—"গুপ্ত রাখিহ কথা না করিহ প্রকাশ।" কিন্তু ভক্তের স্বভাব পরমকরুণামণ্ডিত। তিনি এই মাধুর্যের লীলা স্বরূপ দামোদরকে জানান, তিনি জানান রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে, তাঁর থেকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী জেনেছেন এবং নিজ গ্রন্থে উহা প্রকাশ করেছেন।

এই মধুর সংবাদ ভাগ্যবান যিনি, তিনিই আস্বাদন করেন এবং ইহার শ্রবণে—"সর্ব তত্ত্ব জ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে।
প্রেমভক্তি হয় রাধা-কৃষ্ণের চরণে।" চৈঃ চঃ

সকলের জীবন শ্রীরাধা-কৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভে ধন্য হোক, আনন্দপূর্ণ হোক, এই প্রার্থনা জানাই।

জয় জগদ্বন্ধু! জয় মহাপ্রভু!

———

স্থান :—৪নং গড়পার রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

তাং : ৪ঠা ও ৫ই আগষ্ট, ১৯৬০

শ্রীরূপ শিক্ষা

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অশেষ কৃপাভাজন, চিত্ত একান্ত বৈরাগ্য-প্রবণ, তিন ভাই অমর, সন্তোষ ও বল্লভ। কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ এঁরা। চন্দ্রদ্বীপে এঁদের মাতুলালয়। মহাপ্রভুর দেওয়া এঁদের নাম—সনাতন, রূপ ও অনুপম। অনুপমের পুত্র ও শ্রীরূপের শিষ্য স্বনামধন্য বৈষ্ণবাচার্য জীব গোস্বামী।

বাংলার নবাব তখন হোসেন শাহ। রাজধানী গৌড়ে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর মসজিদ তৈয়ার করাচ্ছেন। ভাল মিস্ত্রীদের কাজে নিয়োগ করেছেন। নবাব রোজ দেখতে আসেন কেমন কাজ হচ্ছে। একদিন কাজের কিছু ত্রুটি দেখে খুব ক্ষিপ্ত হয়ে প্রধান মিস্ত্রীকে ধাক্কা মারেন, ঐ মসজিদের উপর থেকে পড়ে তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। নবাবের সঙ্গে ছিল চাকর হিংগা। নবাব তাকে বল্লেন,—হিংগা! মোরগা যা এখুনি। মোরগা গিয়ে কি করতে হবে তা নবাবকে জিজ্ঞাসা করার মত সাহস হল না তার, সে তখুনি ছুটল মোরগার দিকে।

রূপ-সনাতন ঐ মোরগায় থাকতেন। তারা দেখতে পেলেন একটা অপরিচিত লোক বারংবার তাঁদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করছে, অথচ কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করছে না। রূপ ও সনাতন তাকে ডেকে সব কথা শুনে বল্লেন, এখানে ভাল রাজমিস্ত্রী আছে, তাদের তিন-চার জনকে নিয়ে যাও। হিংগাকে রাজমিস্ত্রী নিয়ে ফিরতে দেখে নবাব কিছুটা বিস্মিত হলেন, খুসীও হলেন। নবাব হিংগাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোকে বলিনি কি জন্যে মোরগা যেতে হবে, কি করে জানলি রাজমিস্ত্রী আনতে হবে? সে তখন রূপ-সনাতনের কথা জানাল। নবাবের কেমন কৌতূহল হল, আর খবর নিয়ে জানলেন রূপ-সনাতন খুব বিদ্বান, বিচক্ষণ ও

সৎ। এদের গুণের পরিচয় পেয়ে নবাব এদের মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। সনাতন হলেন প্রধান মন্ত্রী, সকল ব্যাপারে নবাব তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন। রূপ হলেন রাজস্ব-মন্ত্রী। নবাবের দেওয়া পদবী—দবির খাস (সনাতন) ও সাকর মল্লিক (রূপ)। এদের সততা ও বুদ্ধিমত্তায় রাজ্যের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়।

ইতিপূর্বে সুবুদ্ধি রায় ছিলেন বাংলার শাসন কর্ত্তা। এই হোসেন শাহ সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে কর্মচারী ছিলেন। কাজের কিছু ত্রুটির জন্য সুবুদ্ধি রায় তাকে সজোরে এক বেত্রাঘাত করেন। তাতে পিঠ কেটে একটা বড় ক্ষত চিহ্ন আজও রয়ে গেছে। তৎসত্ত্বেও হোসেনশাহ সুবুদ্ধি রায়কে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন, কারণ তিনি তাকে কাজ শিখিয়েছেন, যার ফলে তার নবাব পদে উন্নতি সম্ভব হয়েছে। একদিন হোসেনশাহের বেগম স্বামীর পিঠের ঐ ক্ষতচিহ্নের কারণ সুবুদ্ধি রায় জেনে বললেন,—এখুনি সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণদণ্ড দিতে হবে, নচেৎ তিনি (বেগম) প্রাণত্যাগ করবেন। নবাব অনেক বোঝালেন, সুবুদ্ধি রায় অন্যায় কিছু করেন নি, তার এত উন্নতির কারণ ঐ সুবুদ্ধি রায়। কিন্তু বেগম কোন কথাই শুনতে চান না, চান সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণনাশ।

এই গভীর সংকটে হোসেনশাহ ডেকে পাঠালেন মন্ত্রী সনাতনকে। রাত্রি তখন গভীর ও ভয়ঙ্কর দুর্যোগপূর্ণ। বাইরে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির বিন্দুমাত্র বিরাম নেই। সেই দুর্যোগের মধ্যেই সনাতন চলেছেন নবাবের নিকট। কোন গৃহস্থের ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। শুনতে পেলেন স্বামী-স্ত্রীর কথা। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করছেন,—এই দুর্যোগের রাতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, কে যায়? স্বামী বললেন,—এই দুর্যোগে চোর-ডাকাত বের হবে না, শিয়াল-কুকুর হবে। স্ত্রী বললেন,—এই ভয়ানক দুর্যোগে শিয়াল-কুকুর বের হবে না, নিশ্চয় কোন ভৃত্য মনিবের আদেশে হুকুম তামিল করতে চলেছে। এই কথা সনাতনের সর্বাঙ্গে যেন চাবুকের আঘাত হানল। একেই ছিলেন বৈরাগ্যপ্রবণ, তার উপর বিধর্মী নবাবের অধীন চাকুরি। গৃহস্থের

ঐ কথা শোনার পর সনাতনের অন্তরে সংসার ত্যাগের সংকল্প সুদৃঢ় হল।

সনাতন হোসেন শাহের সব কথা শুনে বললেন,—সুবুদ্ধি রায়কে প্রাণে না মেরে জাতিচ্যুত করা হোক, ইহা হিন্দুর পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষাও বেশী বেদনাদায়ক। নবাবের স্ত্রী শুনে খুশী হলেন। সুবুদ্ধি রায়ের জাত গেল, কিন্তু প্রাণ বাঁচল। প্রায়শ্চিত্তর জন্য এলেন কাশীতে। কাশীর পণ্ডিতগণ বললেন,—তপ্ত তেলে পুড়ে প্রাণ বিসর্জন ছাড়া কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই। সুবুদ্ধি রায় এই সিদ্ধান্তে অন্তরে কোন সায় পেলেন না। এমন সময় মহাপ্রভু এলেন কাশীধামে। সুবুদ্ধি রায় মহাপ্রভুকে জানালেন নিজের দুঃখের কথা। মহাপ্রভু বললেন,—এযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত হল কৃষ্ণ নাম আশ্রয় করা। বৃন্দাবনে গিয়ে বাস কর এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ কর। সুবুদ্ধি রায় তাই করলেন। পরবর্তীকালে রূপ-সনাতন প্রভৃতি মহাপ্রভুর পরিকরগণ ব্রজে গিয়ে ভগবদ্-ভজনে ব্যাপৃত হলেন, সুবুদ্ধি রায় নিজে অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে তাঁদের প্রতিপালন করেন।

মহাপ্রভুর শ্রীচরণ সান্নিধ্যলাভের জন্য রূপ আগেই সংসার ত্যাগ করলেন। সনাতন চলে যাবেন, এই আশঙ্কায় হোসেন শাহ তাঁকে বন্দী করে রাখলেন। প্রচুর অর্থ উৎকোচ দিয়ে সনাতন মুক্ত হলেন এবং একবস্ত্রে সম্পূর্ণ কর্পদকশূন্য হয়ে মহাপ্রভুর উদ্দেশে চললেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে রূপের মিলন ঘটে প্রয়াগে, সনাতনের সঙ্গে মিলন হয় কাশীধামে। মহাপ্রভু উভয়কে কৃপামৃত দ্বারা অভিষিক্ত ও বিশেষভাবে শক্তি সঞ্চার করে ব্রজে পাঠান। সেখানে লুপ্ত তীর্থ সকল ও কৃষ্ণলীলা স্থল উদ্ধার, কৃষ্ণলীলা-তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা এবং কৃষ্ণ ভজনের আদর্শ স্থাপনের ভার দেন মহাপ্রভু। প্রয়াগে কিছু দিন থেকে শ্রীরূপকে এবং কাশীধামে দুই মাস অবস্থান করে সনাতনকে শিক্ষা দেন। বৃন্দাবনের কল্যাণকর বার্তা কালক্রমে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই খ্যাপন করা, জীবকে ব্রজের ভাবে অনুপ্রাণিত করা

এবং ব্রজের প্রেমভক্তি সর্বসাধারণের বিতরণ করা জগতের দিক হতে ইহাই মহাপ্রভুর কাজ। রূপ-সনাতনাদি পরিকর তাঁর প্রধান সহায়ক।

প্রেমভক্তি রস দান করতে এসেছিলেন মহাপ্রভু। প্রেমভক্তি রসের বিষয়ে শ্রীরূপ গোস্বামীকে তিনি শিক্ষা দেন। ব্রজের প্রেমভক্তি রসলীলার একটি মধুর বার্তা আছে। উহা কালক্রমে নষ্ট হয়ে গেছে। উহার প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন মহাপ্রভু, রাধা গোবিন্দ মিলিত হয়ে। বৃন্দাবন লীলার বার্তা কি এবং অন্য শাস্ত্রের সংবাদ হতে তার পার্থক্য কোথায়, জানা দরকার। অন্যান্য শাস্ত্র বলছেন,—হে ত্রিতাপ-দগ্ধ মানব, জীবন তোমার দুঃখ-ভরা, অশান্তি-দুর্ভোগের শেষ নেই, ভগবানকে ডাক, ভগবানের নিকট পৌঁছালে তোমার দুঃখ জ্বালা সব দূর হবে।

ব্রজের প্রেমভক্তি রসলীলার সংবাদ ভাগবতে। ভাগবত বলছেন,—কলির জীব তুমি, ভগবানকে ডাকার তোমার সামর্থ্য নেই। ভগবানের কাছে পৌঁছবার তোমার ক্ষমতা কোথায়? তোমার ক্ষমতা নেই। সেজন্য ভগবান নেমে এসেছেন গোলোক থেকে ভূলোকে। তিনি ডাকছেন তোমায়, মধুর স্বরে ডাকছেন। সংসারের কর্ম কোলাহল হতে সরে এসে শোন তাঁর ডাক।

অন্যান্য শাস্ত্রে অধিকারী অনধিকারী ভেদ রয়েছে। ভাগবত ধর্মে তা নেই। এখানে সকলেই অধিকারী। কারণ ভগবানকে লাভ করতে যা দরকার তা সবার আছে। কি সেই বস্তু? হৃদয়ের শুদ্ধ ভালবাসা। সকলের হৃদয়েই ভালবাসা আছে। কিন্তু শুদ্ধ ভালবাসা নেই, আছে স্বার্থময় ভালবাসা, নিজ স্ত্রী-পুত্রের প্রতি, দেহ-ইন্দ্রিয় সুখের প্রতি ভালবাসা। এই ভালবাসার মধ্যেই শুদ্ধ ভালবাসা আছে, সেই ভালবাসাই শ্রীভগবানে দিতে হবে। যেমন ময়লা জলের ময়লা ফিলটার করে পৃথক করতে পারলে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায়, সেইরূপ ভালবাসার মধ্যে যে মলিনতা আছে উহা কোন উপায়ে সরাতে পারলেই শুদ্ধ ভালবাসা জাগ্রত হবে। কৃষ্ণ

কথা শ্রবণে, কৃষ্ণনাম গ্রহণে চিত্তের মলিনতা কেটে যাবে, তখন শুদ্ধ ভালবাসা, শ্রীভগবানে প্রেম প্রকাশিত হবে।

নিত্য সিদ্ধ প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়।

অন্যান্য শাস্ত্রের খবর, একটা বিরাট খবর—সাধনা করতে করতে মানুষ ভগবান হয়ে যায়, যেমন ভগবান শঙ্কর। মানুষের মধ্যে এই ক্ষমতা (potentiality) আছে। ব্রহ্মকে যিনি জেনেছেন তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান (ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি)। এর থেকে বড় খবর হতে পারে না। ভাগবত বলেন,—তেমন বিরাট সংবাদ আমার না থাকলেও অত্যন্ত মধুর প্রাণ জুড়ান একটি সংবাদ আমার আছে। ভগবান সাধনা করতে করতে মানুষ হন, ভগবানের সাধনা অর্থাৎ করুণা। ভগবান মানুষ হয়ে এসে মানুষের সঙ্গে প্রেমের লীলা করেন, মানুষের ভালবাসা আস্বাদন করেন। তখন ভগবানে সর্বাতিশায়ী মাধুর্য প্রকটিত হয়—"মাধুর্য ভগবত্তা সার ব্রজে কৈল পরচার"। ভগবান তখন সবচেয়ে মধুর।

ভাগবতের রসময় দেবতা পুনরায় এসেছিলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে ভারতের বিভিন্ন স্থানে, উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে, পায়ে হেঁটে জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়ে নাম-প্রেম বিতরণ করেছেন। মহাপ্রভুর প্রকট লীলা ৪৮ বৎসর, প্রথম ২৪ বৎসর নদীয়া লীলা, শেষ ২৪ বৎসর সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তী নীলাচল লীলা। নীলাচল লীলার প্রথম ৬ বৎসর ভারতের বিভিন্ন স্থান, তীর্থক্ষেত্রে গমন করেন—ইহা মধ্যলীলা বলে বর্ণিত। শেষ ১৮ বৎসর নীলাচল ছেড়ে কোথাও যান নি, ইহা অন্ত্যলীলা।

মহাপ্রভুর সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলার উনবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীরূপের সঙ্গে মহাপ্রভুর প্রয়াগে মিলন প্রসঙ্গ ভক্তিরস বিষয়ে শ্রীরূপের শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। রূপ ভাই অনুপম সহ সংসার ছেড়ে এসেছেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন হতে ফিরছেন। পথে প্রয়াগে রূপের সঙ্গে মিলন হল। বিন্দুমাধব মন্দিরে মহাপ্রভু

এসেছেন। লক্ষ লক্ষ লোক চলেছে সঙ্গে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে সব গড়াগড়ি যাচ্ছে, ক্রন্দন করছে, হাসছে, কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত সব। প্রয়াগের অবস্থা—

গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
মহাপ্রভু ডুবাইলেন কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে॥

অগণিত এই লোকের ভিড় এড়িয়ে দশাশ্বমেধে গিয়ে শ্রীরূপকে দশ দিন শিক্ষা দেন—

লোক ভিড় ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে গিয়া।
রূপকে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া॥

শিক্ষার বিষয়বস্তু কি?

কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত॥

রূপ যদিও মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী শুনতেই বসেছেন, তথাপি মহাপ্রভু বল্লেন,—

প্রভু কহে শোন রূপ ভক্তিরসের লক্ষণ।
সূত্ররূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন॥

রূপকে শুনতে বলার তাৎপর্য এই—অখণ্ড মনোযোগে শোন। সবটা মন দিয়ে শোনা নয় কেবল, সব সত্তা দিয়ে গ্রহণ করতে বলছেন। ভক্তিরসের কথা সবচেয়ে মূল্যবান কথা। ভক্তিরস রসাল বস্তু, পরমানন্দদায়ী মধুর বস্তু। শাস্ত্রে ভগবৎ প্রাপ্তির অন্যান্য যে পথ আছে, সেসব পথ কঠিন, চলা কষ্টকর, ভগবানকে পেলে পরে আনন্দ। কিন্তু ভক্তি-পথটাই মধুর, আনন্দদায়ক। ভক্তিমার্গের সাধকেরা পথ ছেড়ে যেতে চান না। সিদ্ধিলাভ করলেও ভজনপথ ছাড়তে চান না, মাধুর্য হেতু ছাড়তে পারেন না। মহাপ্রভু হরিদাসকে বলছেন—

প্রভু কহে বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধ দেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেন কর॥

ভক্তি জীবের হৃদয়ে আছে, অনাদিকাল হতেই আছে। কিন্তু

ঢাকা পড়ে আছে, কামনা-বাসনায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সামান্য মেঘ যেমন বিরাট সূর্যকে ঢেকে ফেলে, সামান্য বিষয়-বাসনা এই ভক্তিকেও ঢেকে ফেলে। হরিকথা, কৃষ্ণকথার বাতাস যদি লাগে, তবে মেঘ কেটে যাবে, ভক্তি সূর্য প্রকাশিত হবে।

শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়।

ভক্তি পথের আরম্ভ নেই, শেষ নেই। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ পথে আরম্ভ আছে, শেষ আছে। এজন্য ভক্তিকে মহাপ্রভু অকুল সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভক্তিরসের এবার-ওপার নেই, যদিও জগতের সব সমুদ্রের তা আছে। আবার ভক্তিরস-সমুদ্রের গভীরতার শেষ অর্থাৎ তল নেই, যতই ডুববেন, ভক্তিরসের গভীরে যাবেন, ততই মনে হবে তা অনন্ত, নিত্য নবায়মান মাধুর্যে ভরা এই পথ। ভক্তিরসের কথা এজন্য বলে শেষ করা যায় না। এই রসের এমনই বৈচিত্র্য যে যার প্রাপ্তি যত, অভাববোধ তার তত। শ্রীরাধার প্রাপ্তি সবচেয়ে বেশী। তাই তাঁর অভাববোধ সীমাহীন।

জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারিণু
নয়ন না তিরপতি ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

মহাপ্রভু শ্রীরূপকে তাই বলেছেন—

পারাবার শূন্য গম্ভীর ভক্তিরস সিন্ধু।
তোমা চাখাইতে তার কহি একবিন্দু॥

অসীম অনন্ত ভক্তিরসের কথা বলে শেষ করা যায় না। সেজন্য মহাপ্রভু রূপকে অত্যন্ত সংক্ষেপে, সূত্রাকারে ভক্তিরসের কথা বলেছেন। অত্যন্ত সংক্ষেপে সার কথাটুকু বলেছেন।

"সূত্ররূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন"।

ভগবদ্ভক্তি অতি দুর্লভ বস্তু। ভক্তিধন যদি আপনার থাকে, তবে সবই আপনার আছে। আর ভক্তি যদি না থাকে, তবে আপনার সব থেকেও কিছু নেই; জীবন-ভরা দুঃখ শোক অশান্তি। ভক্তি

যাঁর আছে গুরুতর দুঃখও তাঁকে বিচলিত করতে পারে না (ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে , তাঁর প্রাণের শান্তি-আনন্দ ক্ষুণ্ণ করতে পারে না।

মহাপ্রভু প্রথমেই সৃষ্ট জীবনিবহের বিষয় উল্লেখ করলেন। অসংখ্য জীব এই ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করছে। জন্ম ও মৃত্যু যেন দুটি পদক্ষেপ। ৮৪ লক্ষ যোনিতে চলছে এই পরিভ্রমণ। মহাপ্রভু জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেছেন। জীবনে কতটা সুখ-দুঃখ ভোগ হবে, তা স্থির হয় নিজ কর্ম দ্বারা। মানুষের জন্ম মনুষ্যেতর কুলে হতে পারে, যেমন কুবেরের পুত্রদ্বয় নলকুবের ও মণিগ্রীব নারদের অভিশাপে গোকুলে নন্দের আঙ্গিনায় দুটি অর্জুন বৃক্ষ হয়েছিল। পরমধার্মিক রাজা ভরত রাজ্য-আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে বনে গমন করেন, হরিণ শিশুর প্রতি আকর্ষণে হরিণ হয়ে জন্মেছিলেন। যে কুলেই জন্ম হোক, জীবাত্মার পরিবর্তন হয় না। প্রতি জীব-দেহে ইহার অবস্থিতি, অত্যন্ত সূক্ষ্ম ইহার স্বরূপ। মাথার একটি কেশ শত ভাগ করে, তার একটি যদি পুনরায় শত ভাগ করা হয়, সেইরূপ সূক্ষ্ম জীবাত্মার স্বরূপ। জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহ পরিগ্রহ করলেও স্বরূপের কোন পরিবর্তন হয় না।

জীবের স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দুই ভাগ। স্থাবর—গতিশক্তিহীন, বৃক্ষলতা পর্বত প্রভৃতি। জঙ্গম—গমনশীল, মনুষ্য পশু পক্ষী ইত্যাদি। যারা চলে, তাদের দুই ভাগ স্থলচর ও জলচর। এই অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে মানুষের সংখ্যা অতি অল্প। তাদের মধ্যে বেদ মানে, এমন লোকের সংখ্যা খুব অল্প। যারা বেদ মানে, তাদের অর্ধেক বেদানুসারে ধর্মের আচরণ করে, বাকি অর্ধেক কিছুই করে না। যারা বৈদিক-ক্রিয়া আচরণশীল, তাদের কোটিজনার মধ্যে একজন জ্ঞানী। আবার কোটি জ্ঞানীর মধ্যে একজন মুক্ত হন। কোটি মুক্ত মধ্যে একজন কৃষ্ণভক্ত দুর্লভ, থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। একেবারে কামনাশূন্য হলে কৃষ্ণভক্ত শান্ত, এছাড়া সকলেই অশান্ত কারণ

প্রত্যেকের কিছু না কিছু কামনা আছে, তা সে মুক্তির কামনাই হোক বা অন্য কিছু।

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সকলে অশান্ত॥

ভোগেচ্ছা মানুষকে শান্ত হতে দেয় না। শান্ত না হলে ভগবদ্-ভজন বা উপাসনা হয় না (শান্তম্ উপাসতে)। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের ভক্ত বিধানী বিপথগামী হয়ে প্রভুকে ছেড়ে যায় এবং তার অকালমৃত্যু ঘটে। একদিন কয়েকজন ভক্তসহ প্রভু এক জঙ্গলের ধার দিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ একটি শূকর অনেকগুলি বাচ্চাসহ জঙ্গলের মধ্য হতে বেরিয়ে এসে প্রভুর পায়ের উপর গড়াগড়ি দিতে থাকে। প্রভুকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় বল্লেন,—বিধানী মরে ঐ শূকর হয়ে জন্মেছে। যে প্রভুর ভক্ত ছিল, খুব নাম করত, তার এই দশা দেখে সবাই বিস্মিত হল। প্রভু বল্লেন,—ওর অনেক ভোগ বাকি ছিল, শূকর হয়ে জন্মেছে এতে তাড়াতাড়ি ভোগ কেটে যাবে, মনুষ্য হলে বহু জন্ম লাগত ঐ ভোগ শেষ করতে। ভোগ অন্তে পুনরায় ভক্তিভাব নিয়ে জন্মাবে।

জড়ভরত একেবারে কামনাশূন্য ছিল। ডাকাতরা ধরে যখন বলি দেবার জন্য হাড়িকাঠে গলা ঢুকিয়েছে এবং বলি দেবার জন্য খাড়া তুলেছে, তখনও তাঁর দেহ-মনের কোন বিকার নেই, একেবারে নিরুদ্বেগ, সম্পূর্ণ শান্ত, ঈশ্বরে নিত্যযুক্ত।

দুর্লভ এই কৃষ্ণভক্তিলাভের উপায় বলছেন মহাপ্রভু। সকল জীব বিভিন্ন যোনিতে এই ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করছে। তাদের মধ্যে ভাগ্যবান কোন মানব গুরু-কৃষ্ণের করুণা লাভ করে ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥

সকলেই গুরু-কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ করে না। ভাগ্যবান যিনি, তিনিই গুরু-কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ করেন। আগে ভাগ্যবান, পরে

গুরু-কৃষ্ণের প্রসাদ। এমন ভাগ্যবান কে? তিনিই ভাগ্যবান, যিনি সংসারে বহু সম্পদের অধিকারী হয়েও কৃষ্ণভক্তি লাভ হল না বলে মনে করেন তার সবই ব্যর্থ এবং জীবন অধন্য। তিনিই গুরু-কৃষ্ণ করুণা লাভ করে ভক্তির বীজ পান। বীজ পেয়ে তার কাজ হবে মালির মত। মালি যেমন বীজ রোপন করে নিয়মিত জল সেচ করেন, গাছ অঙ্কুরিত হয়ে বাড়তে থাকলেও নিয়মিত জল সেচ চলতে থাকে, সেইরূপ ভক্তিলতার বীজ পেয়ে নিত্য শ্রবণ-কীর্তন নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হবে। তবেই লতা বাড়তে থাকবে। এখন প্রশ্ন হতে পারে—ভাগ্যবান হবার উপায় কি? ভক্তের সঙ্গ প্রভাবে ঐ সৌভাগ্যের উদয় হয়। এখন নিষ্কাম ভক্তের সঙ্গ কি উপায়ে লাভ হবে, তার কিছু স্থিরতা নেই। নদীর প্রবাহে কাঠ ভাসতে ভাসতে কোন কোন কাঠ তীরে এসে লাগে, সেইরূপ হঠাৎ কারও ভাগ্যে ঘটে যায়—'নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে'।

শ্রীগুরুপ্রদত্ত শ্রবণ-কীর্তন সাধনে ভক্তিলতা বাড়তে থাকে। ক্রমে উহা ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করে যায় অর্থাৎ জগতের কোন বিষয়ে উহা ঠেকে যাবে না, ভক্তির বিষয় যে ভগবান তাঁতেই দেহ-মন-প্রাণ ন্যস্ত হবে, লেগে থাকবে, অন্য জাগতিক বিষয় প্রবেশ করবে না সেখানে। ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করে "বিরজা" নদী, যেখানে গুণত্রয় সাম্যাবস্থা এবং উহা প্রাকৃতমল-বিধৌতকারিণী। উহা অতিক্রম করে জ্ঞানীগণের ব্রহ্মলোক, সেখানেও ভক্তিলতা আশ্রয়যোগ্য স্থান পায় না। বিরজা-ব্রহ্মলোকের একপারে ব্রহ্মাণ্ড, অপরপারে বৈকুণ্ঠ বা পরব্যোম। বৈকুণ্ঠের উপরিভাগেই গোলোক-বৃন্দাবন অবস্থিত। তথায় ভক্তিলতা কৃষ্ণচরণ কল্পতরুকে আশ্রয় করে।

উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

গোলোক-বৃন্দাবন আশ্রয় করে ভক্তিলতায় কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-

বাঞ্ছারূপ প্রেমফল বা সেবাভাগ্যলাভ হয়। তখনও এই প্রপঞ্চে থেকে ভক্তিলতায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলার শ্রবণ-কীর্তনাদি-রূপ জল সেচন চলে। পরব্যোম সম্বন্ধ বলা যায়—উহা শ্রীভগবানের ধাম। যেমন মণির জ্যোতি ও মণি, সেইরূপ জ্যোতি ও জ্যোতির্ময় পরমপুরুষ। জ্ঞানমার্গে জ্যোতি দর্শন হয়, ভক্তিতে জ্যোতি-মধ্যবর্তী পুরুষের দর্শন হয়। গোলেক-বৃন্দাবনে পৌঁছে সাধক ভগবানের লীলার সহায়ক ও আস্বাদক হন। সেই লীলা আমরা ভাবতে পারি না। বৃন্দাবন-লীলা শ্রীভগবান এই জগতে প্রকট করায় জীব জানতে পেরেছে।

গোলোকে বিরহ নেই। ভগবানের জন্য ভক্তের বিরহ, বেদনা, ক্রন্দন লীলাকে রসাল করে। বিরহের পর প্রাপ্তিতে মাধুর্য বেশী। গোলোকে কেবল মিলন, তাই বৃন্দাবন লীলা মাধুর্যময় বেশী। ভক্তিলতা কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষ প্রাপ্ত হয়। কল্পবৃক্ষের নিকট যা অভিলাষ করা যায়, তাই পাওয়া যায়। কৃষ্ণের সেবা পুরুষার্থ শিরোমণি। কৃষ্ণকে সেবা-সুখদানে যে চরম আনন্দ ভক্তের লাভ হয়, তা পূর্ণ আনন্দময় ভগবানও পান না। রাসলীলায় গোপীদের কৃষ্ণময় মন, কৃষ্ণকথাময় জীবন, কৃষ্ণময় চেষ্টা, কৃষ্ণময় আত্মা (তন্মনস্কা তদালাপা তদ্বিচেষ্টা তদাত্মিকা) উহাই ভক্তিরসের চরম অবস্থা। মহাপ্রভু ভক্তিরসের কথা বলে, এই পথে সাধকের ভয়ানক দুটি অন্তরায় বা বিঘ্ন যা ঘটতে পারে, এবার সে কথা বলতে শুরু করলেন।

(দুই)

ঈশ্বরের জন্য যাঁর অন্তরে জেগেছে তীব্র লালসা, ঈশ্বরকে না পেয়ে প্রতিমুহূর্ত মনে হয় জীবন ব্যর্থ, দুর্বহ, সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি গুরু-কৃষ্ণ করুণায় ভক্তিযোগ সাধনের বীজ পেয়ে শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধন করে ব্রহ্মাদি দেবগণের দুর্লভ ব্রজের প্রেমভক্তি লাভ করেন।

সাধন-পথে দুটি বড় বিঘ্ন আছে। উহা কঠিন বাধা স্বরূপ হয়ে সাধককে পথভ্রষ্ট করে, সমস্ত সাধনার ফল বিনষ্ট করে। এজন্য ঐ

দুই বাধা কি, তা জানা একান্ত প্রয়োজন, যাতে সাধক উক্ত বিষয়ে সাবধান হতে পারেন।

প্রথম অন্তরায় বৈষ্ণব অপরাধ। মত্ত হস্তী যখন চলে তখন গাছপালা, লতাপাতা সব উপড়ে, ছিঁড়ে, বিনষ্ট করে চলে। সেইরূপ ভক্তি-সাধনার পথে যদি বৈষ্ণব অপরাধ ঘটে উহা ভক্তিলতাকে উপড়ে বা ছিঁড়ে ফেলে, ফলে উহার সব পাতা শুকিয়ে যায় এবং লতাটি মরে যায় অর্থাৎ ভক্তি আর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। বৈষ্ণব কে এবং তার প্রতি কোন্ আচরণ অপরাধ হবে তা, জানতে হবে।

বৈষ্ণব অপরাধ ছয় প্রকার, যথা (১) বৈষ্ণবে তাড়ন (অর্থাৎ প্রহার করা); (২) বৈষ্ণবের নিন্দা; (৩) বৈষ্ণবকে দ্বেষ করা (শত্রুতা করা); (৪) অনভিনন্দন অর্থাৎ বৈষ্ণব গৃহে এলে তাকে অভিনন্দন না করা; (৫) বৈষ্ণবের অপমান এবং (৬) বৈষ্ণবের দর্শন হলে উল্লাস বা আনন্দ না হওয়া। এই সঙ্গে দশটি নামাপরাধ গণ্য করা কর্তব্য, যথা (১) মহতের নিন্দা; (২) বিষ্ণু হতে শিবের গুণ-নামাদি পৃথক করে মানা; (৩) গুরুদেবে অবজ্ঞা; (৪) হরিনাম মাহাত্ম্যে অর্থবাদ অর্থাৎ অতিস্তুতি বলে মনে করা; (৫) বেদ বা বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা; (৬) নামের বলে পাপে প্রবৃত্তি অর্থাৎ এখন পাপ করি, পরে নাম নিলেই পাপমুক্ত হব, এইরূপ মনে করা; (৭) অন্য শুভ ক্রিয়ার (ব্রত, হোমাদি দান) সঙ্গে অপ্রাকৃত ভগবদ্ নামের তুলনা বা একই রূপ ভাবা; (৮) শ্রদ্ধাহীন বা নামশ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে হরিনামের উপদেশ; (৯) প্রকারান্তরে নাম মাহাত্ম্যের অন্য কল্পনা করা এবং (১০) নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করেও নামে অপ্রবৃত্তি।

বৈষ্ণব কে? যিনি বিষ্ণুর উপাসক বা ভক্ত তিনি বৈষ্ণব। ব্যাপক অর্থে সব জীবই বৈষ্ণব, সব জীব ভগবানের সৃষ্ট, তাঁর সন্তান। শিক্ষাষ্টকে মহাপ্রভু বলেছেন,—সব জীবকেই সম্মান দেবে, তার মধ্যে কৃষ্ণ অধিষ্ঠিত আছেন।

উত্তম হৈয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥

রথযাত্রা উপলক্ষ্য করে প্রতি বৎসর বাংলার ভক্তগণ মহাপ্রভুর দর্শনে যেতেন। কুলীনগ্রামের ভক্ত রামানন্দ ও সত্যরাজ খান মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন,—আমরা গৃহস্থ, আমাদের কি উপদেশ করেন? তখন,—

প্রভু কহে কৃষ্ণ সেবা বৈষ্ণব সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন॥

তখন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন,—"কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে।" মহাপ্রভু বল্লেন,—

প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥

পরবর্তী বর্ষে তাঁরা পুনরায় একই কথা জিজ্ঞাসা করায় মহাপ্রভু বল্লেন—

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই সে বৈষ্ণব, ভজ তাঁহার চরণে॥

পরবর্তী বৎসরে আবায় একই কথা জিজ্ঞাসা করায় মহাপ্রভু বলেন—

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥

সাধারণভাবে বলা চলে, মানুষ তথা সর্বজীবের প্রতি আচরণ ভাল না হলে, নৈতিক জীবন সুন্দর না হলে, আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সম্ভবে না। কারও কাছ থেকে সামান্য দুঃখের কারণ উপস্থিত হলে আমরা ক্ষমা করতে পারি না, প্রতিশোধ নেবার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হই, এবং তাকে কিছু কষ্টে না ফেলতে পারলে অন্তরে সুখ পাই না। এটা মনুষ্যোচিত আচরণ নয়। যিনি আচরণে মানুষ হলেন না, তার ভক্তিমার্গে প্রবেশের প্রশ্নই ওঠে না। মহাপ্রভু বলেছেন,—তৃণ হতেও অতি নীচু হবে, বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হবে, বৃক্ষ

কাটলেও কিছু বলে না, যে কেটে বৃক্ষের ক্ষতি করে তাকেও বৃক্ষ ছায়া দেয়, ফল দেয়, নিজে রৌদ্র-বৃষ্টি সহ্য করে অন্যকে সেবা করে, শুকিয়ে মরলেও কারও কাছে জল চায় না, এইরকম হতে হবে।

এইরূপ হৈয়া যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়॥

গীতায় ভগবান ভক্তের লক্ষণ বলতে গিয়ে বলেছেন—তিনি কোন ব্যক্তিকে উদ্বেগ দেন না বা কোন ব্যক্তি হতে উদ্বেগ পান না, হর্ষ-বিষাদ-ভয়-উদ্বেগশূন্য তিনি আমার প্রিয় (যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ)—গীতা ১২।১৫। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের ভক্ত জয়নিতাইদেব। দুই-তিন ঘন্টা সময় লাগত তাঁর প্রসাদ পেতে, স্মরণাবেশে আবিষ্ট হয়ে প্রসাদ গ্রহণ বরতেন। একবার শীতকাল, রাত্রে প্রসাদ পেতে বসেছেন। অন্যান্য সকলে প্রসাদ পেয়ে শুয়ে পড়েছেন। পরদিন ভোরে উঠে সকলে দেখেন জয়নিতাইদেব বিছানায় না শুয়ে মাটিতে ঘুমাচ্ছেন, শীতে শরীর কুঁকড়ে গেছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, এই শীতে মাটিতে শুয়ে কেন? তিনি আঙ্গুল দিয়ে ইশারায় দেখালেন একটা কুকুরকে এবং বল্লেন, অনেক রাতে শুতে এসে দেখি, উনি বিছানায় শুয়ে আছেন। তাই ওনাকে আর উদ্বেগ দিলাম না। শুনলে আমাদের হাসি পায় বা বিস্ময় বোধ হয়, কিন্তু ভক্তদের আচরণ এইরকম—"বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝায়"।

এখন অপরাধের কথায় আসি। বৈষ্ণব স্থানে অপরাধ হলে ভগবানও তাঁকে ক্ষমা করতে পারেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ঈশ্বর ভাবাবেশে একদিবস শ্রীবাস অঙ্গনে বিষ্ণুখট্টায় সাত প্রহর বসেছিলেন। সেই অবস্থায় প্রত্যেক ভক্তকে কৃপা করেন ও অভীষ্ট বর দান করেন। শ্রীবাস বল্লেন, - প্রভু! শচীমাতা এসেছেন, তাঁকে কৃপা করুন। মহাপ্রভু জানালেন,—মাকে কৃপা করা যাবে না, অদ্বৈত প্রভুর স্থানে মায়ের অপরাধ আছে। শুনে অদ্বৈত প্রভু অবাক বিস্ময়ে বল্লেন,—অতি শুদ্ধাত্মা শচীমা, আমার নিকট মার

অপরাধ হতে পারে না। বস্তুতঃ অদ্বৈত প্রভু, যাঁর নিকট অপরাধ, তিনি জানেন না মায়ের অপরাধ। মহাপ্রভুর বড় ভাই বিশ্বরূপ অদ্বৈতপ্রভুর নিকট যাতায়াত করতেন, তারপর সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান, তাঁর সংবাদ আর পাওয়া যায় নি। বড় হয়ে মহাপ্রভু যখন অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেন, তখন মায়ের মনে ভয় হয়, পাছে এই ছেলেও সন্ন্যাসী হয়ে যায়। তাই মা ভাবতেন, অদ্বৈত লোক সুবিধার নয়, সকলের নিকট অদ্বৈত হলেও তাঁর সঙ্গে দ্বৈত অর্থাৎ অন্যরূপ ব্যবহার। এই হল মার অপরাধ। এখন পায়ে ধরে ক্ষমা না চাইলে অপরাধ খণ্ডন হবে না। অদ্বৈত প্রভু শচীমাতাকে চরণ স্পর্শ করতে দেবেন না কিছুতেই। তাহলে শচীমাকে কি কৃপা হবে না? দিনের শেষে কীর্তনের মধ্যে অদ্বৈত প্রভু মূর্ছিত হয়ে পড়েন, তখন শচীমা এসে চরণ স্পর্শ করে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। তারপর মহাপ্রভু কৃপা করেন মাকে।

শ্রীবৃন্দাবনে রূপ গোস্বামী শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভজন-ধ্যান-লীলা স্মরণে ডুবে আছেন। মঞ্জরীভাবে বিভাবিত তাঁর চিত্ত-কায়া। রাধাকুণ্ডের তীরে থেকে একদিন রাধা-কৃষ্ণের জলকেলি লীলা দেখছেন। কৃষ্ণ শ্রীরাধাকে জল মধ্যে ধরণের ইচ্ছা করে ডুব দিয়েছেন, শ্রীরাধা তা অনুমান করে সে স্থান হতে সাঁতার দিয়ে দূরে সরে গেছেন। কৃষ্ণ রাধাকে ধরতে না পেরে জল হতে মুখ তুলে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই পরাভবে জলের মধ্যে অন্যান্য সখিরা হাসছেন। এই লীলা দর্শন করে রূপগোস্বামীও হাসছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে এক খঞ্জ বৈষ্ণব রূপগোস্বামীকে দর্শন করতে এসেছেন। তিনি খোঁড়া, যখন চলেন শরীর এমনভাবে দোলে যে দেখলে লোকে না হেসে থাকতে পারে না। সেজন্য অন্তরে তাঁর খুব দুঃখ, তাই মেশেন না তেমন কারও সঙ্গে। রূপ গোস্বামীর খুব প্রশংসা শুনে, দেখবেন বলে এসেছেন। রাধাকুণ্ডের তীরে উপবিষ্ট ভজননিষ্ঠ শ্রীরূপের ঠিক সামনাসামনি হয়েছেন, ঠিক সেই সময় উপরে বর্ণিত লীলা দর্শন করে তিনি হাসেন। রূপের হাসি দেখে ঐ

খঞ্জ বৈষ্ণব ভাবলেন, তাঁকে দেখেই রূপ গোস্বামী হেসেছেন। মনের ক্ষোভে আর শ্রীরূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না, সেখান থেকেই ফিরে গেলেন। এদিকে রূপ গোস্বামীর লীলা দর্শন বন্ধ হয়ে গেল। তিন দিন অনেক চেষ্টা করেও ধ্যান জমল না, কোন লীলা দর্শন ঘটল না। রূপ খুব ব্যথিত চিত্তে আছেন। সেই সময় হঠাৎ সনাতন গোস্বামী এলেন রূপের নিকট। সনাতন কোথাও একদিনের বেশী অবস্থান করেন না। দাদা সনাতনকে রূপ বল্লেন—তিন দিন কোন লীলা দর্শন হচ্ছে না, এর কারণ কি? সনাতন বললেন—নিশ্চয় কোন বৈষ্ণব স্থানে অপরাধ হয়েছে। রূপ জানালেন, তিনি ঐ স্থান ছেড়ে কোথাও যান নি বা কারও সঙ্গে দেখা করেন নি। সনাতন তখন বললেন, তুমি অপরাধ না করলে কোন বৈষ্ণব হয়তো তোমার অপরাধ নিয়ে গেছেন—এখন উপায়? সনাতন বললেন, সব বৈষ্ণবদের মহোৎসবে নিমন্ত্রণ কর, যদি দেখ কেউ এলেন না তবে জানবে তিনি অপরাধ নিয়ে গেছেন। রূপ গোস্বামী সকলকে নিমন্ত্রণ জানালেন। সেই খঞ্জ বৈষ্ণব এলেন না দেখে রূপ গোস্বামী তাঁর নিকটে গেলেন, চরণ ধরে ক্ষমা চেয়ে বললেন, আপনি মহোৎসবে কেন এলেন না, আমার কি অপরাধ হয়েছে বলুন। তখন সেই খঞ্জ বৈষ্ণব সে দিনের ঘটনা সব জানালেন। রূপ গোস্বামীর নিকট হাসবার কারণ অবগত হয়ে তিনি খুব লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইলেন। রূপের অপরাধ কেটে গেল, পুনরায় লীলাদর্শনে আর বিঘ্ন থাকল না।

শচীমার ক্ষেত্রে দেখা গেল, যাঁর (অদ্বৈতাচার্যের) নিকট অপরাধ তিনি জানেন না যে অপরাধ করেছেন। আর বর্তমান ক্ষেত্রে দেখা গেল যিনি (রূপ গোস্বামী) অপরাধ করেছেন তিনি জানেন না তাঁর অপরাধ। কি ভয়ানক সূক্ষ্ম অপরাধের বিচার, ভাবলে বিস্ময়াভিভূত হতে হয়। অপরাধ বিচারের এই দুই চরম প্রান্তের মধ্যবর্তী কত শত সহস্র প্রকার অপরাধ নিয়ত ঘটে, আমাদের তার ইয়ত্তা নেই। এই দুই অপরাধ বিচারের নিরিখে আমাদের বিচার করলে আমাদের কৃষ্ণপ্রেম লাভের আশা সুদূরপরাহত। তবে, "জগন্নিবাস তব প্রণামে"

(ভাগবত) জগতের সকল জীবের মধ্যেই ভগবান আছেন জেনে সকলকে প্রণতি জানালে এবং সকলের থেকে আমি অতি নীচু (তৃণাদপি সুনীচেন—চৈঃ চঃ) এই ভাবনার বশবর্তী হয়ে চললে, অনেক অপরাধ এড়ান যায়।

সাধন পথের দ্বিতীয় অন্তরায়—সাধকের অন্তরে উদ্ভূত নানারকমের দুর্বাসনা, ভুক্তি-মুক্তি-লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা। আমি বড় সাধক, বহু বড়লোক শিষ্য হলে খুব লাভ, বহু লোক আমায় ভক্তি করবে, পূজা করবে এবং বিরাট মঠ-মন্দিরের অধ্যক্ষ ও বহু শিষ্য হবে ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা, সাধকের অন্তরে জাগ্রত হওয়া স্বাবাবিক। মহাপ্রভু বললেন, এগুলি ভক্তিলতার অঙ্গে উপশাখার মত। উপশাখা বা পরগাছা অন্য গাছকে অবলম্বন করে বাঁচে, সেই গাছ হতে রস সংগ্রহ করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। লাভ-পূজাদি এমনই উপশাখা যে নিজেরা পুষ্ট হয় এবং মূল গাছের পুষ্টি রুদ্ধ হয়। তখন জল সেচনাদি করলেও মূলগাছের কোন বৃদ্ধি হবে না, উপশাখাগুলি বাড়িতে থাকবে। লাভ-প্রতিষ্ঠাদি দুর্বাসনা নিয়ে সাধক যদি নিষ্ঠার সঙ্গে ভজন করেন, তবে ঐ দুর্বাসনাগুলির বৃদ্ধি হবে, মূল ভক্তিলতা আর বাড়বে না। তাই বলেছেন—

কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীবহিংসন।
লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেক জল পেয়ে উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হয় মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥

সেজন্য সাধককে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে কোন দুর্বাসনা মনে স্থান না পায়। প্রতিষ্ঠার দিকে যার মন ধাবিত হয়, প্রতিষ্ঠা তার সাধনা বিনষ্ট করে। আর যিনি প্রতিষ্ঠার দিকে ফিরে তাকান না, প্রতিষ্ঠা তাঁর পিছু পিছু চলে।

উড়িষ্যায় রেমুনাতে পরমমোহন শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের সেবা আছে। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী রেমুনায় এসেছেন। গোপীনাথের সেবার

পারিপাট্য দেখে চমৎকৃত হলেন। ইচ্ছা হল সেবা ও ভোগের বিস্তারিত জানার, নিজের শ্রীগোপাল বিগ্রহের সেইমত সেবা ও ভোগের ব্যবস্থা করবেন। রাত্রে অমৃতকেলি নামে অপূর্ব স্বাদ-গন্ধযুক্ত ক্ষীরভোগ হয় গোপীনাথজীর। শ্রীমাধবেন্দ্রর মনে হল,—

অযাচক ক্ষীর প্রসাদ অল্প যদি পাই।
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই॥

মনের এই ইচ্ছাতে নিজেকে অপরাধী মনে হল। অযাচক বৃত্তি তাঁর, অযাচিত কিছু পেলে খান, নাহলে উপবাস করেন। সেক্ষেত্রে, মনে কোন বাসনা জাগা তাঁর ভাবনায় অনুচিত।

অযাচিত বৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান নইলে উপবাস॥

নিজেকে অপরাধী জ্ঞান করে শ্রীমাধবেন্দ্রজী মন্দির ছেড়ে গ্রামের শূন্য হাটে একান্তে বসে নাম কীর্তনে রত হলেন। এদিকে রাত্রের ভোগের পর পূজারী ভোগ সরিয়ে ঠাকুরকে শয়ান দিয়ে মন্দির বন্ধ করে শুয়েছেন। রোজ বারখানা ক্ষীর ভোগ দেওয়া হয় মাটির পাত্রে। পূজারী স্বপ্নে দেখছেন, শ্রীগোপীনাথ তাকে বলছেন,—পূজারি! শীঘ্র উঠে দরজা খোল, মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য একখানা ক্ষীর ধড়ার আঁচলে ঢেকে রেখেছি, আমার মায়ায় তা তুমি জানতে পারনি। গ্রামের হাটে গিয়ে ঐ ক্ষীর মাধবেন্দ্র পুরীকে দাও। পূজারী সেই রাত্রে মন্দিরের দরজা খুলে গোপীনাথজীর ধড়ার আঁচলে ঢাকা সেই ক্ষীর পেলেন। তখুনি হাটে গিয়ে মাধবেন্দ্র পুরীকে খোঁজ করে সেই ক্ষীর দিলেন এবং সব ঘটনা বল্লেন—

ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী।
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী॥

ক্ষীর খেতেই মাধবেন্দ্রজীর প্রেমাবেশ হল। মাটির পাত্র ধুয়ে টুকরা করে আঁচলে বেঁধে নিলেন। মাধবেন্দ্র পুরী মনে বিচার করলেন, ভোর হলেই গোপীনাথের ক্ষীরচুরির ঘটনা জানাজানি হবে, লোকজন

ভক্তি পূজা প্রণাবে তাঁকে বিব্রত করে তুলবে। এইভয়ে সেখান থেকে গোপীনাথজীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে চলে গেলেন। মাধবেন্দ্র প্রতিষ্ঠা না চাইলেও, তাঁর প্রতিষ্ঠা হতে দেরী হল না।

প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যায় পলাইয়া।
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাজ লৈয়া॥

এই দুই অন্তরায় মুক্ত হতে পারলে সাধকের সাধনার ফল প্রাপ্তিতে বা প্রেমভক্তিলাভে বিলম্ব হয় না! এজন্য বৈষ্ণব অপরাধ বিষয়ে সাবধান হয়ে এবং প্রতিদিন উপশাখাগুলি ছেদন অর্থাৎ ভোগেচ্ছা, মোক্ষেচ্ছা, লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা, নানাপ্রকার নিষিদ্ধ আচরণ, অহং-ভাব প্রকাশক কুতর্কাদি সর্বতোভাবে বর্জন করতে হবে। আমি কৃষ্ণের দাস, তিনি কৃপা করে যেটুকু সেবা আমাকে দিয়ে করাবেন, সেইটুকুই আমি করতে পারি। আমি তাঁর চরণে পাদুকার মত, তিনি কৃপা করে চরণে স্থান দিলে সেবা করতে পারি। চন্দ্রের নিজস্ব আলো নেই, সূর্যের আলোয় যেমন সে আলোকিত, সেইরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্তভায় আমার শক্তি, বিযুক্ত হলে আমি কিছুই নয়, এভাবে নিজের অহং ভাব বর্জন করতে হবে, বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দিলেই বিপদ।

সাধকের সাধন পথে অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ হতে পারে। উহাদের চমৎকারিত্ব আছে সাধারণের নিকট খ্যাতিলাভে। ঐসব সিদ্ধি, সমাধি বা ব্রহ্মানন্দ ততক্ষণই মূল্যবান মনে হবে যে পর্য্যন্ত প্রেমভক্তির স্পর্শলাভ না ঘটে। এই প্রেম-ই জীবনে একমাত্র প্রয়োজন। মহাপ্রভু নিজের সম্বন্ধে বলেছেন,—"কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন"। ভগবান কৃষ্ণ প্রয়োজন, তা বলেননি। কৃষ্ণকে পেলেও পাওয়া হয় না, যদি না প্রেম থাকে। কংস, শিশুপাল, দুর্যোধন কৃষ্ণকে পেয়েছে, কিন্তু প্রেম না থাকায় কৃষ্ণের অমৃতময় মাধুর্য বিন্দুমাত্র অনুভব হয় নি। প্রেম নেই কৃষ্ণ আছেন খুবই দুর্ভাগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রেম আছে কৃষ্ণ নেই যদি হয় তা ভয়ানক বেদনাদায়ক নয় কি? কৃষ্ণ মথুরায় গমন করলে গোপিকা-

গণের বিরহবেদনা কি অসহ্য কষ্টদায়ক হয়নি? প্রেম বস্তু ক্ষুধার মত, কৃষ্ণের জন্য ক্ষুধা, ঐকান্তিক লালসা কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য। লৌকিকে ক্ষুধা আছে খাবার নেই, খুবই কষ্টদায়ক। এই অবস্থা সম্ভব, কিন্তু প্রেম আছে কৃষ্ণ নেই ইহা সম্ভব নয়। বৈষ্ণব আচার্যগণ প্রকাশ করেছেন, প্রেমের তিনটি গুণ। উহা "কৃষ্ণাকর্ষী", কৃষ্ণ যেখানেই থাকুন, প্রেম তাঁকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে। উহা "শুভদা", সকল প্রকার শুভ আনয়ন করে জীবনে এবং উহা "ক্লেশ-নাশী", যদি কারও জীবনে দুঃখ বেদনা উপস্থিত হয় প্রেম তা হরণ করে, জানতে দেয় না। মাথুর বিরহে গোপীগণের বাইরে কৃষ্ণ হারানোর বেদনা ছিল, কিন্তু অন্তরভরা ছিল কৃষ্ণপ্রাপ্তির আনন্দ, বিষামৃতে একত্রমিলন।

সর্বত্র স্বাধীন হলেও ভগবান ভক্তের প্রেমাধীন। প্রেম-ভালবাসায় ভগবানকে যিনি আহ্লাদিত করেন, আনন্দ দেন, তিনিই হ্লাদিনী শক্তি। এই শক্তি তাঁর নিজেরই, সেজন্য ইঁহার বশ্যতায় তাঁর স্বাধীনতার হানি হয় না। প্রেমভক্তি মার্গের সব ভক্তই হ্লাদিনীর অনুগত বা আশ্রিত। ভক্তের সঙ্গে যুক্ততায় ভগবানের ভগবত্ব ও মাধুর্য। মা যেমন ছেলেকে জন্ম দেন, ছেলেও জন্ম দেয় মাকে। সন্তান না হওয়া পর্যন্ত তিনি মা হতে পারেন না। তার মাতৃত্ব নির্ভর করছে সন্তানের জন্মের উপর। সেইরূপ ভগবানের ভগবত্ব নির্ভর করছে ভক্তের সঙ্গে যুক্ততায়। ভক্ত না থাকলে তিনি ভগবান থাকেন না, ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত হন। গীতায় ভগবান বল্লেন—আমি সর্বভূতে সমান, আমার কেউ দ্বেষের পাত্র নেই বা প্রিয় নেই (সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়।—গীতা ৯/২৯)। একটু পরে আবার বলছেন,—যে আমার ভক্ত সে আমার প্রিয় (যঃ মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ—গীতা-১২/১৪)। বাতাস সর্বত্র সমান, ইহা শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রচণ্ড গরমে যখন গলদঘর্ম হচ্ছেন তখন যিনি পাখার নীচে বসলেন, তার শরীর জুড়িয়ে গেল। সকলেই সমান, কেহ প্রিয়-অপ্রিয় নেই—ইহা ব্রহ্মস্বরূপের কথা,

ভক্তের প্রতি যেখানে প্রিয়ত্ব আছে যা অভক্তে নেই—তা ভগবৎ-স্বরূপের কথা।

ভক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—এক সাধন ভক্তি, অপর রাগানুগা (রাগ মার্গের ভক্তি); এক জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, অপর কেবলা রতি। সাধন ভক্তি বা জ্ঞানমিশ্রায় ভগবানে ঐশ্বর্যের বোধ, গৌরব বোধ থাকে, সেখানে একান্ত আপনার বলে বোধটা সঙ্কুচিত হয়। ঐশ্বর্যের বোধ নিজেকে ছোট ও ভগবান বড় মনে করায়, প্রীতির আদান-প্রদান বিঘ্নিত হয়, সহজ-সুন্দর হয় না। বসুদেব-দেবকী কংস বধের পর কৃষ্ণের বিরাট শক্তির প্রকাশ দেখে তাঁকে নিজের পুত্র বলে ভাবতে পারছেন না। ভগবত্তার বোধ এসে পুত্রকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে, তাঁরা পুত্র কৃষ্ণের প্রণাম নিতে পারলেন না। ব্রজে গোবর্ধন গিরি ধারণ ও বহু অসুর বধ দেখেও কৃষ্ণকে নিজের পুত্র, সখা বা প্রিয়তম ছাড়া ভাবতে পারেন না ব্রজের জন। মৃৎভক্ষণ লীলায় মা যশোদা বিশ্বরূপ দেখলেন, গীতায় অর্জুনকেও বিশ্বরূপ দেখালেন। বিরাট ঐশ্বর্য দেখে অর্জুন হারিয়ে ফেলল সখাকে, ভীত হয়ে কৃষ্ণকে ঠাট্টা করার জন্য ক্ষমা চাইতে ও বার বার প্রণাম করতে লাগল। বিশ্বরূপ দেখে মা যশোদার পুত্র স্নেহ উদ্বেলিত হল, হারিয়ে গেল না। মা ভাবলেন, যা দেখছি সব নিশ্চয় কোন অসুরের মায়া। কৃষ্ণের মঙ্গল চিন্তায় তিনি আরও অভিভূত হয়ে পড়লেন। মা প্রয়োজনে কৃষ্ণকে শাসন করেন, বন্ধন করেন। কৃষ্ণকে ভাবেন হীন, ছোট এবং তাঁর উপর একান্ত নির্ভরশীল। ব্রজে কেবলা রতি।

প্রেম বা ভক্তি যদি পাতলা হয়, তবে তার মধ্যে অন্য ভাবনা, ঐশ্বর্যের বোধ ইত্যাদি ঢুকে পড়ে। যেমন জলের ঘনত্ব কম অর্থাৎ পাতলা, তার মধ্যে হাত ঢোকান যায়। কাঠের ঘনত্ব বেশী, এজন্য তাতে হাত ঢোকান যায় না, কিন্তু পেরেক ঢোকান যায়। লোহার ঘনত্ব আরও বেশী তাতে পেরেক ঢোকান যায় না। চরমতম গাঢ় প্রেমভক্তি ব্রজের গোপিকাগণের। কৃষ্ণের ভগবত্তার ভাবনা একটুও

স্থান পায় না সেখানে। ভগবান সর্বতোভাবে বশীভূত হন এই ভক্তির। এমন কি তাঁদের ভৎর্সনাও মধুর লাগে।

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন॥

এই কেবলা রতি বা প্রেমভক্তি লাভের একমাত্র উপায় কৃষ্ণের জন্য ঐকান্তিক লালসা। এই ভক্তি কেনবার বা পাবার উপায়ই লালসা—লৌল্যমপি মূল্যং একলং। কৃষ্ণের জন্য লালসা তো জাগে না, জগতের ভোগ্যবস্তুর প্রতিই আমাদের যত লালসা। লালসা যাদের আছে তাদের সঙ্গেই কেবল ঐ লালসা জাগবে। কিন্তু কৃষ্ণের আপন যাঁরা, সেই ব্রজজনের সঙ্গ তো সম্ভব নয়। সঙ্গ না হলেও হবে, তাঁদের প্রসঙ্গেও সঙ্গ হবে একটু দেরীতে। সুতরাং তাঁদের প্রসঙ্গ করুন, তাঁদের কথা শুনুন। ভগবানকে যাঁরা একান্তভাবে ভালবেসেছিলেন, তাঁদের কথা শুনতে শুনতে তাঁদের ভালবাসার আবেশ লেগে যাবে চিত্তে। ভাগবত ভরা তাঁদের কথা। নিরন্তর শ্রবণ করুন, তবেই জাগবে লালসা। ভাগবতীয় কথা জীবনের সার করুন। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের নির্দেশ—"ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত সার কর অবিরত"।

প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন। প্রেম পঞ্চম ও পরম পুরুষার্থ। অন্য যে চারি পুরুষার্থের কথা শাস্ত্রে আছে, যেমন ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ তাহা প্রেমের নিকট তৃণতুল্য, অকিঞ্চিৎকর মাত্র। সাধনভক্তি হতে শুদ্ধাভক্তি বা প্রেমভক্তি লাভ হতে পারে, যদি ঐ ভক্তিলাভের বাসনা জাগে। কিন্তু ভুক্তি-মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি সাধকের হৃদয়ে থাকে, তবে সাধন ব্যর্থ হয়, প্রেম ফল দানে সমর্থ হয় না।

"ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম নাহি উপজয়"॥

শ্রবণ-কীর্তনাদি বা ইন্দ্রিয় প্রেরণা সাধ্য ভক্তিকে সাধন ভক্তি বলে। সাধন ভক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলে, রুচির উদয় হয়। তখন কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম ভিন্ন অন্য কিছু আর ভাল লাগে না।

শ্রবণাদির ফলে যদি কৃষ্ণে রতি আরও গাঢ় হয়, তখন তা প্রেম নামে কথিত হয়। ভজনানুসারে প্রেম ক্রমে গাঢ় হয়ে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব প্রভৃতি অবস্থার উদয় করে।

সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয়॥
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥

মহাপ্রভু শ্রীরূপের নিকট ভক্তিরসের সাধনপথের দিগ্‌দর্শন করলেন। ভক্তিরসের কথা বলে শেষ করা যায় না। সারাজীবন ধরে শুনলেও শেষ হবে না। শ্রীরূপকে সামান্যভাবে ভক্তিরসের লক্ষণ বললেন এবং নিরন্তর তা অন্তরে ভাবনা করতে বললেন। তাহলে কৃষ্ণপ্রেম জাগ্রত হবে অন্তরে।

এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্‌দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণ কৃপায় অজ্ঞ যায় রসসিন্ধুপারে।

শ্রীভগবানের কৃপা বাতাস তো বইছে, আপনার হৃদয় দুয়ার খুলে দিন, তবে কৃপা বাতাসে অন্তর ভরে যাবে।

যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো প্রভু,
দ্বার ভেঙ্গে তুমি আসিও ফিরিয়া যেও না কভু।—রবীন্দ্রনাথ

সকলের মধ্যে প্রেম আছে, তবে প্রেম শুদ্ধ নয়। বিষয়, ইন্দ্রিয় সুখ-লালসায় ঐ প্রেম ঢাকা আছে। ভাগবত নিরন্তর শ্রবণ-কীর্তনে হৃদয়ের সকল মালিন্য চলে যাবে, কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হবে। হীন, অজ্ঞ ব্যক্তিও কৃষ্ণ কৃপায় রসসিন্ধুর পারে যায়। এই ভরসায় বুক বেঁধে সকলে সাধন পথে অগ্রসর হন, নিরপরাধে শ্রবণ কীর্তন পরায়ণ হন। চরম কল্যাণ নেমে আসবে আপনার জীবনে সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

জয় জগদ্বন্ধু! জয় মহাপ্রভু!

———

স্থান : বার্ণপুর

তাং : ১৯শে মার্চ, ১৯৬১

নাম মাহাত্ম্য

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সংকীর্তন কলৌ পরম উপায়॥

শ্রীভগবান-লাভই জীবনের চরম উদ্দেশ্য। শ্রীভগবৎসান্নিধ্যলাভের তরে শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন যুগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপায় নির্দেশ করেছেন।

কৃতে যৎ ধ্যায়তে বিষ্ণু ত্রেতায়াং যজতে মখৈ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কালৌ তৎ হরিকীর্তনাৎ॥

—অর্থাৎ সত্যযুগে চিত্ত সংযম পূর্বক ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে সেবা-পরিচর্যা-দান এবং কলিতে কেবল হরিনাম সংকীর্তনই শ্রেষ্ঠ উপায়।

সংকীর্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধনা।
সেই তো সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥

পূর্ব-পূর্ব যুগের সাধন-ক্ষমতা এই কলিযুগের জীবের নেই। চিত্ত যেখানে সদাই চঞ্চল, যেখানে ধ্যান সম্ভব নয়। যজ্ঞের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা যেখানে দুষ্কর এবং তপস্যা ও কঠোর ব্রহ্মচর্যের অভাবে মন্ত্র-উচ্চারণ-শুদ্ধি একরূপ অসম্ভব যেখানে, যজ্ঞ-সম্পাদন কিরূপে সম্ভব? দানের জন্য সম্পদ অধিকাংশের নেই, অভাবের তাড়নায় সবাই প্রায় জর্জরিত, সেখানে দান-সেবা-পরিচর্যার মনও নেই, সামর্থ্যও নেই। এহেন কলিযুগের মানুষের জন্য হরিনাম শ্রবণ-কীর্তনই শ্রেষ্ঠতম উপায়—'কলৌ পরম উপায়'।

শাস্ত্রকারগণ বলেছেন, ভগবানের শক্তি, ভগবানের নামে আছে। ভগবান ও তাঁর নাম অভিন্ন। ভগবান যখন লীলায় আসেন, নিজের সব পার্ষদ, পরিকরদের নিয়ে আসেন। লীলার শেষে তাঁদের

সকলকে পুনরায় স্বধামে নিয়ে যান। সকলে যখন চলে গেলেন তখন তাঁর কাজ করবে কে? ভগবান প্রতিনিধি স্বরূপ নামকে রেখে যান। রামচন্দ্র চলে গেলেন, প্রতিনিধি স্বরূপ রইলেন তাঁর নাম। কৃষ্ণচন্দ্র চলে গেছেন, আছেন তাঁর নাম। নাম করবেন ভগবানের সকল কাজ, সেজন্য নামকে সকল শক্তি বিভাগ দিয়েছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার শেষ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-উচ্চারিত শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোক—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি—
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনিনানুরাগ ঃ॥

—অর্থাৎ ভগবান নিজের বহু নামের প্রচার করেছেন, সেই নামে নিজ শক্তি সকল অর্পণ করেছেন, নাম স্মরণে সময়ের নিয়ম কিছু করেন নি। হে ভগবান্; তোমার এইপ্রকার কৃপা, কিন্তু আমার দুর্দৈব ঐ নামে অনুরাগ জন্মাল না।

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়॥
সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ। চৈঃ চঃ

মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন, রুচি বিভিন্ন। ভগবানের দুই-একটি নাম থাকলে তাতে সকলের হয়তো অনুরাগ জন্মাত না, সেজন্য ভগবান কৃপা করে অনেক নাম প্রচার করেছেন। সেই নামে তাঁর সর্বশক্তি অর্পণ করেছেন। নামের যদি নামী ভগবানের শক্তি নেবার যোগ্যতা থাকে, তবেই দেবার সার্থকতা। ভগবান সাধারণভাবে শক্তি দেননি, তাঁর সকল শক্তি ভাগ ভাগ করে দিয়েছেন। বস্তুর শক্তি নামের গ্রহণ করার ক্ষমতা এ জগতে আমরা দেখতে পাই না। জল আমাদের তৃষ্ণা দূর করে, কিন্তু 'জল' শব্দ উচ্চারণে তৃষ্ণা বাড়বে

বই কমবে না। শব্দের ক্ষমতা নেই বস্তুর গুণ গ্রহণ করার অথবা বহন করার। জগতের সকল বস্তু ও তার নাম সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য।

নাম থাকায় আমাদের সুবিধা হয়েছে অনেক বিষয়ে। নাম বস্তুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শব্দ না থাকলে আমাদের অসুবিধার অন্ত থাকতো না। সামান্য একটু জলের জন্য, সেই জলের নিকটে গিয়ে দেখাতে হোত। শব্দ বা বাক্-শক্তিস রস্বতী রূপা, আর বস্তু লক্ষ্মীরূপা। বস্তু না থাকলে আমরা বাঁচি না। শব্দ না থাকলে মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি কিছুই থাকত না, মানুষ পশুর অধম হয়ে যেত, পশুরও ভাষা আছে।

বস্তু ও শব্দের (নামের) এই পার্থক্য যেন দুই সমান্তরাল রেখার মত। নিজ পার্থক্য বজায় রেখে চলে সর্বদা। কখনও মেলে না। গণিতশাস্ত্র বলে, সমান্তরলে রেখাও মিলে যায় যদি অসীমে যায়। ঈশ্বর অসীম ও অনন্ত, তাই ঈশ্বর ও ঈশ্বরবাদী শব্দ মিলে গেছে। চিনি উচ্চারণ করলে জিহ্বায় মিষ্ট স্বাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করলে তাঁর মাধুর্য আস্বাদিত হয়! ঈশ্বর বাচক শব্দ ও বস্তুতে কোন তফাৎ নেই। উভয়েতে সমান রসের স্থিতি।

দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম, নাম, দেহ স্বরূপ বিভেদ॥

"দেহদেহিভিদাচাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে কচিৎ"—কৌর্ম্মে। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মশায় বলেছেন.—

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥

রামচন্দ্রের সব শক্তি তাঁর নামে আছে! সাগর বন্ধন করেছিলেন তিনি। এখন আমাদের সাগর কে বন্ধন করবেন? দুস্তর ভবসাগর আমাদের প্রত্যেকের সামনে। রামচন্দ্র নেই, তাঁর প্রতিনিধি "রাম-নাম" আছেন। একান্তভাবে আশ্রয় করুন ঐ নাম, তিনিই দেবেন আপনার ভবসাগর বন্ধন করে। রামচন্দ্রের সাগর-

বন্ধনে গাছ-পাথর-বানরের সাহায্য লেগেছিল, কিন্তু নাম অন্য কিছু বা কারও অপেক্ষা করেন না।

অপরাধের জন্য মহর্ষি গৌতমের স্ত্রী অহল্যা পাষাণ হয়েছিলেন ভগবান রামচন্দ্রের স্পর্শে তিনি উদ্ধার প্রাপ্ত হন। সদা অপরাধ-প্রবণ-চিত্ত আমাদের, আমরাও অহল্যা হয়ে আছি। রামচন্দ্র নেই কে উদ্ধার করবেন আমাদের? "হল্যা" অর্থ চাষের যোগ্য, "অহল্যা" অর্থ চাষের অযোগ্য। কঠিন পাষাণ সম আমাদের হৃদয়, যেখানে সাধন-ভজনের কোন চাষ চলে না। আমাদের উপায় কি, কিসে উদ্ধার পাব আমরা। "রাম-নাম" আছেন ভাবনা কি? নিরন্তর রাম-নাম গ্রহণে ভয়ানক দস্যু রত্নাকর যেমন ঋষি বাল্মীকি হয়েছিলেন, রাম নামাশ্রয়ে আমরাও অনায়াসে উদ্ধার প্রাপ্ত হব।

শ্রীরামচন্দ্রের সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য কীর্তি রাবণবধ ও সীতা উদ্ধার। রামচন্দ্র নেই, এখন আমাদের জীবনে রাবণ বধ করে সীতা উদ্ধার করবেন কে? দুর্দৈব রূপ রাবণ আমাদের ভক্তি-রূপিণী সীতাকে হরণ করেছে। জীব কৃষ্ণদাস, ভক্তি তার মধ্যে চিরকাল আছে,—"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়"। দুর্দৈব বশে ভক্তি হারিয়েছি, ফলে সংসারের মায়া-মোহে মুগ্ধ হয়েও অশেষ দুঃখ যাতনা ভোগ করতে হচ্ছে। এখন উপায়? রাম নাম আছেন, নামই করবেন তাঁর কাজ। নাম আশ্রয় করুন, তবে সকল দুর্দৈব বিনাশ প্রাপ্ত হবে এবং ভক্তিলাভ হবে।

অবতারের সব শক্তি তাঁর নামে আছে, "সর্ব শক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ"। শ্রীকৃষ্ণলীলায় কালিয় নাগের মোক্ষণ একটি প্রধান কাজ। সেই সঙ্গে লীলাস্থল কালিয়হ্রদ নামে যমুনার অংশটি বিষমুক্ত করা। এখন আমাদের অন্তরের কালিয় মোক্ষণ এবং হৃদয়যমুনা কৃষ্ণলীলার উপযোগী হবে কিরূপে? কৃষ্ণনাম আছেন। কালিয়ের শতেক ফণা, উহা জীব-চিত্তের অসংখ্য কামনা-বাসনার প্রতীক। বাসনার জন্য জীবের চিত্ত অশান্ত। অশান্ত

বলেই জীবনে তার নেই কোন স্বস্তি, সুখ বা আনন্দ। হৃদয় শ্রীভগবানের প্রতি উন্মুক্ত হলেই শান্তি ও আনন্দময় হয়ে ওঠে জীবন। বিষয় বাসনার বিষে হৃদয় কৃষ্ণলীলার অযোগ্য হয়ে আছে। কৃষ্ণের কাজ এখন কৃষ্ণ নামই কোরবেন। কালিয়কে ভগবান নাশ করেন নি, তার মস্তকে চরণ-চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন। কৃষ্ণনাম আশ্রয়ে সকল কামনা-বাসনা ভগবদ্‌মুখী হবে, হৃদয় কৃষ্ণময় হয়ে, কৃষ্ণলীলার যোগ্য হবে। "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম"। মহাপ্রভুর অন্তরটি কেমন দেখুন, তিনি বলেছেন,—

"অন্যের হৃদয় মন মোর মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করি জানি ॥"

কাম-ক্রোধ প্রভৃতিকে বিনাশের চেষ্টা না করে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করলেই মঙ্গল, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মশায় এই উপদেশ দিয়েছেন প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায়,—

কৃষ্ণ সেবা কামার্পণে ক্রোধ কৃষ্ণদ্বেষী জনে
লোভ সাধু সঙ্গে হরিকথা।

চিত্তের যে সকল বৃত্তি বহির্মুখ, তাকে অন্তর্মুখী ও কৃষ্ণপরায়ণ করে তোলাই সাধনার লক্ষ্য। কৃষ্ণনাম আমাদের পরম সম্বল। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলেছেন—"অহোরাত্র কৃষ্ণ কৃষ্ণ আবাহন করিও, কৃষ্ণ কৃষ্ণ অর্চিও, ডাকিও, কাঁদিও, গাইও, জপিও, সেবিও, বাসিও, আপন করিও" (প্রেমের বাণী)।

শ্রীকৃষ্ণ পুতনা মোক্ষণ করেছিলেন। মহা পাপীয়সী রাক্ষসীকে বৈকুণ্ঠে ধাত্রীগতি দান করেছিলেন। পূত অর্থ পবিত্র। পূতনা অর্থ পবিত্র নয়। কমবেশী আমরা সকলেই পূতনা। ভোগাচ্ছন্ন চিত্ত আমাদের। ভোগাচ্ছন্নতা ভগবদ্‌ভাব বিনাশ করতে চায়। পূতনা রাক্ষুসী এসেছিল কৃষ্ণকে বিনাশ করতে। অশেষ করুণাময় ভগবান তাকে ধাত্রীগতি দান করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এখন নেই, তাঁর নামই আমাদের পূতনা হেন ভোগাচ্ছন্ন চিত্তের সকল মালিন্য দূর করে দুর্লভ কৃষ্ণ সেবা ভাগ্য দান করবে।

কলিযুগে নাম-ই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। কলিতে অন্নগত প্রাণ, অন্নের জন্য অধিকাংশ মানুষকে দিবারাত্র পরিশ্রম করতে হয়। সকলেরই সময়াভাব। অন্যান্য পূজা-তপস্যায় কালাকাল, তিথি ক্ষণ ইত্যাদি নির্দিষ্ট আছে। অশেষ করুণাময় ভগবান নাম সাধনের কোন নির্দিষ্ট সময় করেন নি। অর্থাৎ সকল সময়ই সময়।

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নেই সর্বসিদ্ধি হয়॥

একটি লীলার মধ্য দিয়ে মহাপ্রভু এই তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করে মাতৃ আজ্ঞায় নীলাচলে আছেন। পুরীতে রাধাকান্ত মঠে থাকেন। গোপাল নামে একটি বালক মহাপ্রভুকে খুব ভালবাসে ও প্রত্যহ আসে।

মহাপ্রভু খুব স্নেহ করেন গোপালকে। একদিন মহাপ্রভু শৌচে গেছেন। গোপাল দেখতে পেল মহাপ্রভু দাঁত দিয়ে জিহ্বা কামড়ে রয়েছেন। গোপাল মহাপ্রভু এলে জিজ্ঞাসা করল,—বাহ্যকৃত্যের সময় কেন জিহ্বা দাঁত দিয়ে কামড়ে বসেছিলেন? মহাপ্রভু বল্লেন,—জিহ্বা আমার বশে নেই, দিবারাত্র কৃষ্ণনাম করে, শৌচ-কালে অশুচি অবস্থা মনে করে জিহ্বা যাতে পবিত্র কৃষ্ণনাম করতে না পারে সেজন্য কামড়ে বসেছিলাম। গোপাল তাই শুনে বল্ল,—প্রভু! সেই সময় নাম-বিহীন অবস্থায় যদি প্রাণত্যাগ হত, তাহলে কি ভয়ানক দুর্দৈব ঘটত। মহাপ্রভু বল্লেন,—গোপাল! তুমি ঠিকই বলেছ। কলিতে আয়ুর কোন স্থিরতা নেই, নাম ছাড়া প্রাণ ত্যাগ হলে মহা অনর্থ ঘটত। শুচি, অশুচি অবস্থায় নাম গ্রহণ কর্তব্য। তারপর থেকে মহাপ্রভু গোপালকে গুরু বলে ডাকতেন। এই তত্ত্ব মহাপ্রভু ভালভাবে জানলেও ভক্তের মহিমা প্রকাশ ও লীলার মধ্য দিয়ে জগৎকে শিক্ষা দানের জন্য এইরূপই ঘটিয়েছেন। সকল সময়ের নাম গ্রহণ মহাপ্রভুর শিক্ষা —"নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন।"

নাম গ্রহণে অন্তর্জগত ও বহির্জগত উভয়ই পবিত্র হয়। ঘরের দুয়ারে যদি দীপ জ্বেলে রাখা হয়, তবে ঘরের ভিতর ও বাহির

উভয়ই আলোকিত হয়। আমাদের অন্তরের ভাব প্রকাশ করতে পারি জিহ্বা দ্বারা। জিহ্বা আমাদের অন্তর ও বাহিরের দুয়ার স্বরূপ। কণ্ঠে নামের আলো যদি জ্বলে অর্থাৎ জিহ্বায় নাম গ্রহণ করা হয়, তবে উহা অন্তর ও বাহির শুচি করবে। সাধারণ প্রদীপ বেশী হাওয়ায়, ঝড়ে নিভে যেতে পারে, কিন্তু নামের প্রদীপ 'মণিদীপ' কখনও নিভে যায় না। ভক্ত তুলসীদাস ইহাই বলেছেন,—

রাম নাম মণি দীপ ধরু দেহ-দেহলি দুয়ার।
তুলসী ভিতর বাহিরহু যো চাহসি উজিয়ার॥

হরিনামের শক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর লিখেছেন—হরিনাম "স্বকীয় পরকীয় উদ্ধার সাধন, অপিচ চতুর্দ্দশ ভুবনের মহামাঙ্গল্য বিধান করে। জপ-ধ্যানে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, অপরের কোন মঙ্গল হয় না। হরিনাম কীর্তনে স্থাবর জঙ্গম সকলের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়।" নাম-সাধক পরমভক্ত হরিদাসকে মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন—

পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম।
ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন॥

হরিদাস ঠাকুর উত্তর দিয়েছেন,—

হরিদাস কহে, প্রভু সে কৃপা তোমার।
স্থাবর জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার॥
তুমি যে করিয়াছ এই উচ্চ সংকীর্তন।
স্থাবর জঙ্গমে সেই হয়েত শ্রবণ॥
শুনিয়াই জঙ্গমের সংসার হয় ক্ষয়।
স্থাবরের শব্দ লাগি প্রতিধ্বনি হয়॥
প্রতিধ্বনি নহে, সেই করয়ে কীর্তন।
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন॥

হরিনাম সংকীর্তন সকল জীবের মহা কল্যাণ সাধন করে। হরিনাম চতুর্দ্দশ ভুবনের মহা মাঙ্গল্য বিধান করে। পুকুরের জলে একটা ঢিল পড়লে উহার তরঙ্গ সর্বদিকে বিস্তৃত হয়। সেইরূপ

হরিনাম সংকীর্তন উর্দ্ধ, অধঃ দশদিক ব্যাপ্ত হয়। উর্দ্ধে সাত ও অধঃ দেশে সাত ভুবনের প্রভূত মঙ্গল বিধান করে।

নাম সাধন বিনা অন্য সাধন কলিযুগে তেমন ফলদান করে না। কিন্তু ঐ সাধনের সঙ্গে হরিনাম যদি গ্রহণ করা হয় তবে তা প্রভূত ফলদান করে। এই অর্থেই প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর লিখেছেন "সমগ্র প্রয়োগ ও সাধনের ফলদান করে"। সংখ্যার ডান দিকে শূন্য দিলে উহা দশ গুণ করে বেড়ে যায়, যেমন ১০ হয় ১০০, ১০০ হয় ১০০০। কিন্তু সংখ্যায় আদি সংখ্যা যদি না থাকে তবে শূন্যের আর কোন মূল্য নেই। এই কলিতে অন্য সাধনের সঙ্গে যদি হরিনাম আশ্রয় করা হয়, তবে তাহা দশ গুণ বেশী ফল দেয়। কিন্তু নাম ছাড়া অন্য সাধন এ যুগে ফলদানে ব্যর্থ হয়। কলিযুগের অশেষ দোষ, কিন্তু একটি মহৎ গুণ যে হরিনাম প্রচারিত হয়েছে। এজন্য অন্য যুগের বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও সাধকেরা কলিযুগে জন্ম নিতে আগ্রহী। হরিনাম যুক্ত সাধন প্রভূত ফলদান করবে এই কারণে।

ধন্য ধন্য কলিযুগ সর্বযুগ সার।
হরিনাম সংকীর্তন যাহাতে প্রচার॥

নামের অপার মাহাত্ম্য সর্বত্র কীর্তিত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেছেন,—

একবার কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে।
জীবের সাধ্য নাই তত পাপ করে॥

এত মাহাত্ম্য নামের, অথচ নাম করে ফল পাই না কেন?—এ প্রশ্ন অনেকের। এর কারণ মহাপ্রভু বলেছেন,—অপরাধ আছয়ে প্রচুর। অন্যত্র অপরাধ ঘটলে নাম তা খণ্ডন করে, কিন্তু নামের নিকট অপরাধ হলে নাম আর তাকে কৃপা করেন না। সেজন্য "নাম অপরাধ" বিষয়ে বিশেষ সচেতন হতে হবে সাধককে, যেন কোন প্রকারেই নামাপরাধ না ঘটে।

নামাপরাধ দশ প্রকারের, যথা—(১) মহতের নিন্দা, ভক্ত-বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠব্যক্তির নিন্দা করলে নাম আর কৃপা করেন না অর্থাৎ নাম কোন

ফল দেন না। (২) বিষ্ণু হইতে শিবের গুণ-নামাদি পৃথক করে মানা; ঈশ্বর স্বরূপে ভেদ বুদ্ধি আনলে নাম কৃপা করেন না। (৩) গুরুদেবে অবজ্ঞা—ভগবান বলেছেন "আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ" —আমাকে আচার্য বলে জানবে। মর্ত্ত্য বুদ্ধি আরোপ করে কখনও অবজ্ঞা করবে না।

মহিমায় গুরু কৃষ্ণ এক করি জান।
গুরু আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি মান।

তাঁকে শ্রীভগবানের প্রিয়তম জ্ঞানে শ্রদ্ধা-ভক্তি করবে। তাঁকে অবজ্ঞা করলে নাম আর কৃপা করবে না তোমায়। (৪) বেদ বা বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা করলে নামাপরাধ হবে, সেক্ষেত্রে নাম আশ্রয় করলেও ফল কিছু পাওয়া যাবে না। (৫) হরিনাম মাহাত্ম্য শুনে যদি কেউ মনে করে বাড়িয়ে বলা হয়েছে বা বেশী স্তুতি করা হয়েছে, তাহলে নামাপরাধ হবে। ইহা নাম মাহাত্ম্যে অর্থবাদ—ইহা বর্জন করতে হবে এবং ভাবতে হবে নাম-মাহাত্ম্য এতই তা বলা সকলের পক্ষে সাধ্যাতীত। তুলসীদাস বলেছেন—রাম না শকহি নাম গুণ গাই, রামচন্দ্রেরও শক্তি নেই নাম-মাহাত্ম্য বলার। (৬) প্রকারান্তরে নাম-মাহাত্ম্য শুনে অল্প মনে করলে অপরাধ হবে। বস্তুতঃ নামের শক্তি এতই যে বলতে গেলে কম হয়ে যাবে। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলেছেন—"নাম মাহাত্ম্য লেখনীর অসাধ্য, গুরুমুখে শ্রোতব্য"। (৭) নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি, নামে সকল পাপ নাশ করে এই ভরসায় যদি কেউ পাপে প্রবৃত্ত হয়, নাম তাকে কৃপা করেন না। (৮) অন্য শুভক্রিয়া, যথা যজ্ঞ, দান, ব্রত—এসবের সঙ্গে নামের তুলনা করলে অপরাধ হবে। (৯) নামে শ্রদ্ধাবিহীন, বিমুখ ও শ্রবণে রুচিহীনকে হরিনামের উপদেশ দিলে নামাপরাধ হবে। (১০) নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করেও যদি নামে অপ্রবৃত্তি থাকে, তবে নাম আর কৃপা করেন না তাকে। মহাপ্রভু বলেছেন,—"নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন"।

প্রাকৃত জিহ্বা দুদিন পরেই বিনাশ প্রাপ্ত হবে। সেই জিহ্বার

সদ্ব্যবহার দ্বারা অপ্রাকৃত ঈশ্বর স্বরূপের সান্নিধ্যলাভ সম্ভব, নিতান্ত মূল্যহীন বস্তু দিয়ে অমূল্য সম্পদ লাভ, খুবই বুদ্ধির পরিচায়ক। ভাগবত তাঁদের সুমেধা অর্থাৎ অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলেছেন। "যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ" —অর্থাৎ সুবুদ্ধিগণ সংকীর্তন যজ্ঞে কৃষ্ণ আরাধনা করেন। এ হেন জিহ্বা সম্পদ পেয়ে সে হরিনাম করল না, তাকে ধিক, তার জিহ্বা ভেক (ব্যাঙ) জিহ্বা সম। ব্যাঙের ডাকে কারও উপকার হয় না, কেবল সাপ ব্যাঙের অবস্থিতি জেনে তাকে গ্রাস করে। সেইরূপ বৃথা বাক্য ব্যয়ে আয়ু শেষ হয় এবং কাল এসে তাকে গ্রাস অর্থাৎ মৃত্যু কবলিত করে। অসংখ্য প্রাণী আছে, যারা কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না। শব্দ উচ্চারণের ক্ষমতা পেয়ে মানুষ যদি হরিনাম না করে, তবে তার জীবনের সবই ব্যর্থ।

কেবল কলি কেন, অন্য যুগেও নামের শক্তি অসীম। রাম নামের শক্তিতেই দস্যু রত্নাকর মহর্ষি বাল্মিকী। রাজা দশরথ তখনও পুত্রহীন। একদিন রাত্রিকালে চলেছেন বন্যজন্তু শিকার মানসে। অন্ধকারে কোথাও কিছু দেখা যায় না। রাজা জানতেন শব্দভেদী বাণের প্রয়োগ। বনের মধ্যে জলাশয়ে শব্দ শুনে মনে হল হরিণ জলপান করছে। ছুঁড়লেন তীর শব্দ লক্ষ্য করে। বিদ্ধ হল তরুণ তাপস বালক, আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল। ছুটে এলেন রাজা, একি সর্বনাশ করলেন কার! এসে ধরে তুললেন বালককে, অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধু নিজ পরিচয় জানিয়ে বল্ল, আমার পিতা-মাতা দুজনেই অন্ধ, এই বনে থাকেন, আমার অভাবে তাঁদের আর বাঁচার কোন সম্বল রইল না। আমার সংবাদটা তাঁদের দয়া করে দেবেন। রাজা অতি কষ্টে তার মর্মস্থানে বিদ্ধ তীরটি তুললেন, সিন্ধুও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। মৃত পুত্রকে নিয়ে রাজা এলেন অন্ধমুনির কুটিরে।

পুত্রের জন্য আকুল হয়ে অপেক্ষা করছেন তাঁরা। পায়ের শব্দ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—কে পুত্র এলি, আজ অত দেরী কেন, কোন বিপদ হয়নি তো, কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? শোকাভিভূত রাজা

দশরথ তখন বললেন,—না, মুনিবর, আমি রাজা দশরথ, মৃগ ভ্রমে শব্দ-ভেদী বাণে আপনার পুত্রকে বিনাশ করেছি। পুত্রের জন্য গভীর শোকে আচ্ছন্ন পিতামাতা উভয়েই প্রাণ ত্যাগ করলেন। মৃত্যুর পূর্বে রাজা দশরথকে এই বলে অভিশাপ দিলেন, যে ভয়ানক পুত্রশোকে আমরা মৃত্যুমুখে নীত হয়েছি, সেইরূপ তীব্র পুত্রশোকে তোমার মৃত্যু হবে। ঋষির বাক্যে রাজার পুত্রলাভের ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

তিনটি নিষ্পাপ প্রাণ তাঁর জন্য বিনষ্ট হল, এতে রাজা দশরথের অন্তরে তীব্র অনুশোচনা এল। মন এত অশান্ত যে কিছুই ভাল লাগছে না, রাজ্যে ফিরে যেতেও চাইছে না তাঁর বিষাদিত অন্তর। স্থির করলেন শ্রীগুরু বশিষ্টদেবের নিকট যাবেন, যদি প্রায়শ্চিত্ত করে প্রাণে শান্তি আসে। বশিষ্ঠদেব গৃহে নেই। পুত্র বামদেব রাজার আগমনের কারণ জেনে প্রায়শ্চিত্ত করালেন। রাজার অশান্ত চিত্তে শান্তি ফিরে এল, তিনি রাজ্যে ফিরে গেলেন। বশিষ্ঠদেব ফিরলে পুত্র বামদেব জানালেন রাজার সব বৃত্তান্ত। বশিষ্টদেব জানতে চাইলেন, কি প্রায়শ্চিত্ত করান হয়েছে। বামদেব জানালেন, তিন বার 'রাম নাম' উচ্চারণ করিয়ে প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন করেছেন। শুনে বশিষ্ঠদেব ভয়ানক চটে গেলেন এবং বললেন, —তিন বার কেন রাম নাম, একবার নয় কেন? নামে অবিশ্বাস! তুমি আমার পুত্র হবার যোগ্য নয়, চণ্ডাল হও। 'রাম' নামের এতই মাহাত্ম্য যে 'রা' উচ্চারণ করতেই সব পাপ চলে যায় এবং 'ম' বলে মুখ বন্ধ করলে আর পাপ প্রবেশ করতে পারে না। পিতার অভিশাপে বামদেব অত্যন্ত বিষণ্ন হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তখন বশিষ্ঠদেব বললেন, —আমার বাক্য মিথ্যা হবে না, তোমার চণ্ডাল কুলে জন্ম হবে। তবে যে রাম নামের এত মাহাত্ম্য, সেই রামচন্দ্র লীলায় আসবেন, তুমি তাঁর দর্শন ও সখ্যত্ব লাভ করবে। বামদেব গুহক চণ্ডাল হয়েছিলেন পরজন্মে।

হরিনাম যিনি যতটুকুই করুন তা ব্যর্থ হয় না। ভাল বীজ

খারাপ জায়গায় কঠিন পাহাড়ের উপর পড়লে অনেক সময় অঙ্কুরিত হয় না, বীজ শুকিয়ে যায়। হরিনামের বীজ কঠিন পাষাণ সম হৃদয়ে পড়লেও শুকিয়ে যায় না, সেখানে অপেক্ষা করতে থাকে। পাহাড়ে শেওলা হলে সেখানে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। সেইরূপ অত্যন্ত কঠিন ভক্তিহীন হৃদয়ে যদি মহৎ কৃপার পরশ লাগে, তবে হরিনামের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে তাকে প্রেমিক সাধকে রূপান্তরিত করে।

শ্রীভগবান শত্রুকেও পরমাগতি দান করেন। শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণে বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাঁকে প্রভুত নিন্দা-গালি দিতে দিতে তাঁর হস্তেই নিহত হয়ে মুক্তিলাভ করল। নাম ও নামী অভিন্ন, "দেহ দেহী নাম-নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ" !

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রস বিগ্রহঃ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ পদ্মপুরাণ

—অর্থাৎ নাম ও নামীর অভিন্নতা বশতঃ চৈতন্যরসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার নামও চিন্তামণি-স্বরূপ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য ও মুক্তস্বভাব।

কৃষ্ণনাম যদি অশ্রদ্ধার সঙ্গে, ঠাট্টা বিদ্রূপচ্ছলে গ্রহণ করা হয় বা নাম নিয়ে তাঁকে গালি দিলেও মুক্তি হবে। শ্রীভগবানে বিদ্বেষভাব কাম্য নহে। শ্রীভগবানে প্রীতিসম্পন্ন ভক্ত শ্রীভগবানের অফুরন্ত আনন্দরস মাধুর্য আস্বাদন করেন, মুক্তি তার তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

কলিতে মানুষের পরমায়ু, নানা রোগে ভগ্ন স্বাস্থ্য, অন্নচিন্তায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, সেসব কারণে মন স্বভাবতঃই চঞ্চল। এমত অবস্থায় হরিনামই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, হরিনাম ছাড়া আর পথ নেই, ইহা বুঝাতে দৃঢ়তার সঙ্গে তিনবার বলা হয়েছে গতি নাই, নিরন্তর হরিনাম গ্রহণ করুন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

একান্ত নামাশ্রয়ীর দীক্ষাদি বিধানেরও প্রয়োজন হয় না। নাম

স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং সকল সাধন-ফল দানে সমর্থ। ইহাতে কোন জাতিবিচার বা অধিকারী-অনধিকারীর প্রশ্ন নেই।

দীক্ষা পুরশ্চর্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে॥

যে নামটি যার ভাল লাগে তিনি সেই নাম-ই গ্রহণ করুন, তাতে কোন লোকসান নেই। মানুষের রুচি বিভিন্ন, এক নাম সকলের নিকট আদরনীয় না হতে পারে। কৃপা করে ভগবান বহু নাম দান করেছেন। হরি, কৃষ্ণ, রাম, রাঘব, কেশব, গোপাল, গোবিন্দ, কালী, তারা, দুর্গা – যে নামটি প্রিয় মনে হবে সেই নামটি আশ্রয় করুন। নিরন্তর নাম গ্রহণে সকল কল্যাণ নেমে আসবে আমাদের জীবনে।

নামের এত মাহাত্ম্য শাস্ত্র ব্যক্ত করেছেন যে শুনে বিশ্বাস করা কঠিন, যেমন "একবার কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে, জীবের সাধ্য নাহি তত পাপ করে"। আর বিশ্বাস যদি না হয়, তবে নামাপরাধ হবে, নাম আর কৃপা করবেন না বা ফল দেবেন না। এ এক কঠিন সমস্যা। কেন বিশ্বাস হয় না? আমাদের সুকৃতি, পুণ্য অতি অল্প, সেজন্য শুনেও বিশ্বাস হয় না—"স্বল্পপুণ্যতাম্ রাজন বিশ্বাসং নৈব কুরুতে"। বিশ্বাস হলে অসম্ভবও সম্ভব হয়।

গঙ্গা স্নানের পুণ্য যোগ, এই যোগে গঙ্গায় স্নান করলে মানুষ পবিত্র হয়ে কৈলাসে যাবে। স্নানের জন্য গঙ্গার ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম। বিশ্বাস না হলে এতলোক গঙ্গা স্নান করতে আসবে কেন? পার্বতী অবাক হয়ে হরকে প্রশ্ন করলেন,—এত লোক গঙ্গাস্নান করছে, এরা সবাই কি কৈলাসে যাবে। হর বললেন, —না, দুই-একজন কৈলাসে আসবে। পার্বতী বললেন,—এই যোগে স্নান করলে কৈলাসবাসের কথা। হর বললেন, এই শাস্ত্র-বিধানে দুই একজন ছাড়া কারও বিশ্বাস নেই। পার্বতী বললেন, – যদি বিশ্বাস না থাকে, তবে এত লোক স্নান করতে আসবে কেন? হর বললেন,—ঠিক বিশ্বাস এদের নেই, দৃঢ় নয় কোমল বিশ্বাস, তাই কোন কাজ হয় না, ইচ্ছা হয় পরীক্ষা করে দেখ।

হরিদ্বার গঙ্গার তীর, স্নানার্থীর খুব ভিড়। সেথানে ঘাটের অল্প দূরে শিব মড়ার বেশ, পার্বতী সত্ত বিধবা অসহায় রমনীর বেশ ধরেছেন। শিবের মড়া দেহ কাপড়ে ঢাকা, পার্বতী করুণস্বরে পাশে বসে কাঁদছেন। অনেকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করছে,—মা! কি করতে হবে? পার্বতী বললেন,—মৃত স্বামীর সৎকার করতে হবে, তবে একেবারে পাপহীন পবিত্র না হলে স্বামীকে স্পর্শ করতে পারবে না। শুনে সকলে ফিরে যায়। এইভাবে বহু লোক এল এবং গেল। তারপর এল এক উন্মাদপ্রায় ব্যক্তি। সে যথারীতি জিজ্ঞাসা করল, কি করণীয়। সব শুনে বল্ল,—মা! কোন চিন্তা নেই, আমি তোমার স্বামীর সৎকার করে দেব। এই এখুনি আমি আসছি গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে। তখন হর-পার্বতী অন্তর্দ্ধান করলেন। হর বললেন, এই একজনই কৈলাসে যাবে।

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে লেখা হতে জানা যায়—বর্তমান সময়ে এক যুগসন্ধিক্ষণ চলছে। একটা যুগের শেষ ও পরবর্তী যুগের আরম্ভের মধ্যবর্তী কাল। অত্যন্ত দুঃসময়। ধর্ম-সংস্কৃতি-নৈতিক মূল্যবোধ সব কিছুর উপর আঘাত আসবে এবং ঐ সকল বিপর্যস্ত হবে। মহাপ্রলয় হবে না। খণ্ড খণ্ড প্রলয় নিয়তই হতে থাকবে। পৃথিবীর সর্বত্র এই ধ্বংসের তাণ্ডব পরিদৃষ্ট হবে। এই আঘাত এড়াবার অন্য কোন উপায় নেই। এই যুগসন্ধির আঘাত হতে রক্ষার একমাত্র উপায় প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর নির্দেশ করেছেন--"রক্ষা হরিনাম।" প্রভু বলেছেন,—"হরিনাম লও ভাই আর অন্য গতি নেই, হের প্রলয় এল প্রায়।" "যদি মহা কীর্তন রটে তবে সৃষ্টি রক্ষা ঘটে। অনন্য গতি রে সংকীর্ত্তন উদ্ধারণ।" নামের মাহাত্ম্য বলে শেষ করা যায় না, বলাও যায় না।

ব্রহ্মার মানসপুত্র নারদ। বীণা যন্ত্র যোগে সদাই হরিনাম, হরিগুণ কীর্তন করেন। একদিন মনে হল, নাম করি' কিন্তু নামের মাহাত্ম্য ঠিক জানি না, জানতে হবে। গেলেন ব্রহ্মার নিকট। ব্রহ্মা

বল্লেন,—নামের মাহাত্ম্য আমি ঠিক বলতে পারব না। শিব সদাই নাম করেন, তিনি হয়তো বলতে পারবেন, তুমি বরং তাঁর কাছে যাও। নারদ শিব ঠাকুরের নিকট এসে প্রার্থনা জানালেন নাম মাহাত্ম্য শ্রবণের। শিব ঠাকুর বল্লেন,—নাম করি, তার কারণ, নাম অত্যন্ত ভাল লাগে, তবে নামের মাহাত্ম্য যে কি, তা ঠিক বলতে পারব না, বলতে গেলেই কম হবে। তুমি বরং যাঁর নাম সেই শ্রীহরির নিকট যাও, তিনি-ই ঠিক বলতে পারবেন।

নারদ এলেন বৈকুণ্ঠে। ভগবান শ্রীহরি বল্লেন, নারদ! নাম-মাহাত্ম্য তোমায় বলব, তার আগে তুমি একবার যমের বাড়ী থেকে ঘুরে এস। নারদ এলেন যমপুরীতে। যমরাজ তাঁকে দেখে অবাক। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে বল্লেন,—ঠাকুর আপনার মত কেউ তো আসে না এখানে, তা যখন এসেছেন, বলুন কি প্রয়োজন, আপনার জন্য কি করতে পারি? নারদ ঠাকুর বল্লেন,—বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির নিকট গিছলাম নামমাহাত্ম্য শোনার জন্য, তিনি পাঠালেন এখানে, তাই এসেছি, নিশ্চয় নাম মাহাত্ম্য কিছু জানেন, তাই শোনান। যমরাজ বল্লেন,—ঠাকুর! আপনি তো জানেন যত পাপীতাপী নিয়ে আমার কারবার, আমি কি করে জানব নাম মাহাত্ম্য? কিছুই আমি জানি না বা বলতে পারব না। নারদ বল্লেন,—তবে বৈকুণ্ঠে ফিরে যাই। যমরাজ বল্লেন,—আপনার মত ভক্তের পদার্পণ এখানে কখনই পড়ে না। যখন এসেছেন, যাবার আগে আমার গৃহের চারদিকে একটু চরণস্পর্শ দিয়ে যান। তাতে আমার গৃহের কল্যাণ হবে। তখন নারদ ঠাকুর বীণা যন্ত্রে হরিনাম করতে করতে যমের বাড়ীর চারপাশ প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। গৃহের দক্ষিণ দিকে এলে যমরাজ বল্লেন, ঠাকুর! আপনার ঐ নাম এখন বন্ধ করুন, ভয়ানক পাপীতাপী সব থাকে এদিকে, আপনার শ্রীমুখের হরিনাম শুনে পাপ মুক্ত হয়ে দিব্য দেহ ধারণ করে সব উর্দ্ধলোকে চলে যাচ্ছে। সব মুক্ত হয়ে গেলে আমার কারবার নষ্ট হয়ে যাবে। নারদ ঠাকুর তা দর্শন করে আরও উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করতে

লাগলেন। যত দূর সেই ধ্বনি পৌঁছল, সকল পাপী-তাপী উদ্ধার প্রাপ্ত হয়ে দিব্য দেহে সব উর্দ্ধলোকে যাচ্ছে, দেখতে পেলেন।

নারদ ঠাকুর বৈকুণ্ঠে ফিরে এলেন। ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন,—নাম মাহাত্ম্য শুনতে চাইলাম, আপনি পাঠালেন যমপুরীতে। যমরাজ বল্লেন, তিনি নাম মাহাত্ম্য কিছুই জানেন না। তবে কেন সেখানে পাঠালেন আমাকে? ভগবান বললেন,—নারদ! কোন্ আলোর কতটা অন্ধকার দূর করার শক্তি, জানতে হলে দিনদুপুরে সেই আলো জ্বেলে বোঝা যাবে না কিছু, অন্ধকার রাত্রেই তা জ্বেলে দেখতে হবে। সেইরূপ, পাপ বিনাশের মূলে কি শক্তি, নামের কি মাহাত্ম্য তা বৈকুণ্ঠে তোমায় দেখান যাবে না। তুমি যমের গৃহে গিয়ে নামের মাহাত্ম্য কিছু দেখেছ, নাম কানে প্রবেশ করা মাত্র মহা মহা পাপী পাপ-মুক্ত হয়ে যাচ্ছে, দিব্য দেহ ধারণ করে সব উন্নত লোকে গমন করছে, যমের ওখানে না গেলে নামের এই মাহাত্ম্য দেখতে পেতে না। সামনে আসছে কলিযুগ, তখন পাপে ছেয়ে যাবে চারিদিক। তখন দেখতে পাবে নামের কি মহা মাহাত্ম্য! নাম মাহাত্ম্য সব যুগেই আছে, তবে কলিযুগে উহার প্রকাশ, অভিব্যক্তি সর্বাতিশায়ী।

কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার॥ চৈঃ চঃ

কলিযুগ-পাবন-অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, সকলকেই নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন। কুলীনগ্রামের ভক্ত রামানন্দ ও সত্যরাজ খান প্রশ্ন করেন, আমরা গৃহী আমাদের জন্য কি উপদেশ করেন? মহাপ্রভু বললেন,—

প্রভু কহে, কৃষ্ণ-সেবা বৈষ্ণব-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ-নাম সংকীর্ত্তন॥

কাশীধামের মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন,—আপনি সন্ন্যাসী হয়ে বেদান্ত শ্রবণ না করে ভাবুকের মত নাম নিয়ে নৃত্য গীত করেন কেন? মহাপ্রভু অত্যন্ত দৈন্যসহকারে বললেন,—

আমি মূর্খ, এই হেতু গুরু বললেন, তোমার বেদান্তে অধিকার নেই, কৃষ্ণমন্ত্র জপ কর।

মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হয় সংসার-মোচন।
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্ব মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম॥ (চৈঃ চঃ আদি-৭ম)

মহাপ্রভুর সান্নিধ্য ও কৃপা প্রভাবে সন্ন্যাসীগণের অন্তর ফিরে গেল। তখন তাঁরাও কৃষ্ণনাম-পরায়ণ হলেন।

সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ॥

বর্তমান যুগে অন্ন-সমস্যা, নানা অভাব অভিযোগ, রোগ শোক, আকস্মিক বিপদ-আপদে সকল মানুষ অল্পবিস্তর প্রপীড়িত। শান্তি নেই জীবনে কারও, তাই আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনা হৃদয় স্পর্শ করে না। ভীতি-বিড়ম্বিত এই যুগের সম্বন্ধে প্রভু জগদ্বন্ধু বলেছেন—অন্নভয়, দারিদ্র্যভয়, রাজভয়, প্রহারভয়, চৌরভয় প্রভৃতি জনজীবনে প্রকট হয়ে দেখা দেবে। তবে কৃষ্ণনাম, হরিনাম আশ্রয় যাঁরা করবেন, তাঁরাই কেবল রক্ষা পাবেন। অন্নাভাব, দারিদ্র্য হতে মুক্ত হতে অন্যান্য যুগে মানুষ যজ্ঞ করতেন। এই যুগে নাম যজ্ঞই একমাত্র যজ্ঞ। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলেছেন,—"সংকীর্তন তমঃ বিনাশন"; "করতালনে শস্যবর্দ্ধন" অর্থাৎ করতাল সহযোগে নাম কীর্তনে শস্যবর্দ্ধিত হবে; "চতুর্দ্দশ মর্দ্দলনে ফলবর্দ্ধন" অর্থাৎ চৌদ্দ মৃদঙ্গ সহ কীর্তনে ফলের উৎপাদন বর্দ্ধিত হবে; "নগর কীর্তনে ধান্যবর্দ্ধন" অর্থাৎ নগর সংকীর্তনে ধান্যের উৎপাদন বাড়বে। "কৃষ্ণনামে শ্রীবৃদ্ধি হয়"; "কৃষ্ণনামে ব্যাধিবিনাশ হয়"। প্রভুর অনেক ভবিষ্যৎ বাক্য অসম্ভব বলে সকলের মনে হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে উহা সত্যে

পরিণত হতে দেখা গেছে। তাই বিশ্বাস করে নাম সাধনে নিষ্ঠার সঙ্গে লেগে যান।

জীবের দুঃখে কাতর হয়ে হরিনাম গ্রহণের জন্য কি ভয়ানক আর্ত্তি জানিয়েছেন প্রভু জগদ্বন্ধু,—

"হায়! মানুষ হরিনাম করে না! সংসারী লোকেরই হরিনামে বেশী অধিকার।"

"তোমরা হরিনাম করে আমাকে তোমাদের সঙ্গে মিশায়ে লও। আমি হরিনামের, এ ভিন্ন আর কারো নাই।"

"তোরা মানুষ না হলে, হরিনাম না করলে, আমি আর ঘর থেকে বের হব না।"

"আমি কি তোদের কেউ নই? আমি কি ভেসেই যাব? আমায় কি হরিনাম দিয়ে কেউ রক্ষা করবে না? হায়! কেউ তো আমার কথা শুনে না। হরিনাম করে না।"

"আমার শপথ, তোমরা সবাই হরিনাম কর। হরিনামের মঙ্গল হউক। তোমাদেরও মঙ্গল হউক। তা'হলেই আমার উদ্দেশ্য ও ভবধামের লীলা শেষ হয়।" ইত্যাদি।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলেছেন,—

নাম সংকীর্তন হৈতে সর্বানর্থ নাশ।
সর্ব শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সর্বশেষ পরিচ্ছেদে শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে কৃষ্ণনাম সংকীর্তনের মহা মাহাত্ম্যের উল্লেখ করেছেন—

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপনং শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-
বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্ সর্বাত্মস্নপনং
পরংবিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥

কৃষ্ণনাম সংকীর্তন চিত্তদর্পণটি মার্জন করে। চিত্ত অজ্ঞান—তমে আচ্ছন্ন, বিষয়-বাসনা, ভোগবাসনাই সেখানে প্রতিভাত হয়, ঈশ্বর

ভাবনা, ঈশ্বরের জন্য লালসা জাগে না। চিত্তের বিষয়-মালিন্য কিসে যাবে?—কৃষ্ণনাম সংকীর্তনে। চিত্তদর্পণের মার্জনই ভজন।

সংসারে নানান অশান্তি দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা যেন দাবাগ্নির মত। বনে দাবাগ্নি যখন লাগে, তখন চারিদিকে ভয়ানক আগুন সব গ্রাস করতে থাকে, কোন প্রাণী রক্ষা পায় না। ভয়ানক অশান্তি দুঃখ আমাদের জীবন গ্রাস করেছে, তা থেকে রক্ষার উপায়, ঐ ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপনের উপায়, কৃষ্ণনাম সংকীর্তন।

সংসারে বিপদ আপদ অমঙ্গল এড়িয়ে চলতে চাই সবাই। জীবন-যাত্রাপথ সহজ, সুন্দর, নিরাপদ হউক ইহাই সকলে কামনা করি। কিন্তু ঝড় ঝঞ্ঝাট সংসারে লেগেই আছে, কিসে মঙ্গল হবে জানতে চাই সবাই। মহাপ্রভু বলেছেন—কৃষ্ণনাম সংকীর্তনই মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণ করবে।

অবিদ্যা-আচ্ছন্ন জীব মায়ার কবলে পড়ে অশেষ দুঃখ অশান্তি ভোগ করে। পরাবিদ্যা জীবনে শাশ্বত শান্তি দান করে। নাম সংকীর্তন বিদ্যাবধূর জীবন স্বরূপ। সংকীর্তন জীবনের সার করুন।

আনন্দ সকলেই চায়। দুঃখ বিষাদ কারও কাম্য নয়। দিবারাত্র চেষ্টা করেও জীবন থেকে বিষাদ তাড়ান যায় না, আনন্দের মুখ দেখা যায় না। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় সাগরের জল বর্দ্ধিত হয়, নাম সংকীর্তনে আমাদের জীবনের আনন্দসমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে উঠবে।

প্রচণ্ড গরমে ঘর্মাক্ত কলেবর। কষ্টের শেষ নেই। তখন শীতল জলে স্নান করলে যেমন সমস্ত শরীর জুড়িয়ে যায়, তেমনি আমাদের সন্তপ্ত জীবনে আমাদের সর্ব সত্তার শীতলতা দান করে কৃষ্ণনাম সংকীর্তন। এই কৃষ্ণনাম সংকীর্তন সর্বোপরি জয়যুক্ত হউন।

নামের এই যে মহা মাধুর্যের কথা বলেছেন মহাপ্রভু, উহার আস্বাদন হয় সিদ্ধ অবস্থায়। সাধক অবস্থায় উহা অনর্থের নিবৃত্তি করে। কৃষ্ণমাধুর্য পূর্ণরূপেই কৃষ্ণনামে আছে। তবে কেন এই মধুমাখা কৃষ্ণনামে জীবের রুচি হয় না? মিছরি মুখে দিলে মিষ্ট লাগার

কথা। কিন্তু পিত্ত-দোষ যাদের, তাদের মুখে উহা তিক্ত মনে হবে। ঐ মিছরি চুষতে চুষতেই পিত্তদোষ কেটে যাবে, তখন উহা মিষ্ট লাগবে। নাম সংকীর্তন করতে করতে আমাদের সকল অপরাধ, অজ্ঞানাদি দোষ দূর হবে, সকল অনর্থের নিবৃত্তি হবে, তখন আস্বাদিত হবে নামের মাধুর্য। তখন নাম এতই মধুর লাগবে যে নাম ছাড়তে ইচ্ছা হবে না। মনে হবে—"না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি চায়"।

কৃষ্ণ নামে যে আনন্দ সিন্ধু আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খদ্যোতক সম ॥ চৈঃ চঃ

শ্রীরূপগোস্বামী কৃত 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে শ্রীরাধার কৃষ্ণ নাম মাধুর্যের আস্বাদনের একটি শ্লোক মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়। সব ভক্তদের নিয়ে এসেছেন শোনাবার জন্য। রূপকে শ্লোকটি পড়তে বলছেন—

প্রভু কহে, পড় রূপ নাটকের শ্লোক।
যে শ্লোক শুনিলে লোকের খণ্ডে দুঃখ শোক ॥

শ্লোকটি এই—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রেতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্
চেতঃ প্রাঙ্গনসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিম্
নো জানে জনয়িতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

শ্রীরাধা বলছেন সখিকে—কৃষ্ণ এই বর্ণ দুইটি কত অমৃত দিয়ে উৎপন্ন তাহা জানি না, যখন উহা মুখে উচ্চারিত হয়, তখন নটীর মত মুখে নৃত্য করে এবং বহু মুখ লাভের জন্য রতি বিস্তার করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তখন অর্ব্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়; যখন চিত্তপ্রাঙ্গনে সঙ্গিনী হয় অর্থাৎ উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।

কৃষ্ণ মাধুর্য অমৃতের সিন্ধু, উহা পূর্ণরূপে বিরাজমান কৃষ্ণনামে। ইহা মধুর হতেও মধুর, সর্ববিধ মঙ্গলদায়ী, চিদানন্দ স্বরূপ।

মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম,(স্কান্দে)

অর্থাৎ হে শৌনক! যিনি মধুর হতেও মধুর, সর্ববিধ মঙ্গলের মঙ্গলদায়ক, সকল বেদলতিকার সর্বোত্তম ফল, চিদানন্দস্বরূপ, সেই কৃষ্ণনাম শ্রদ্ধাসহকারে কিম্বা অবহেলা পূর্ব্বক একবার মাত্র কীর্তিত হলে নরমাত্রকে পরিত্রাণ করে থাকে।

নাম মাহাত্ম্যের প্রসঙ্গে নামের মূর্ত-বিগ্রহ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের উক্তি—

কেহ বলে নাম হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়।
কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥
হরিদাস কহে নামের এ দুই ফল নয়।
নাম ফলে কৃষ্ণ পদে প্রেম উপজয়॥

বর্তমানে ভয়ানক এক ধ্বংসের আবর্তের মধ্য দিয়ে চলেছে জগৎবাসী। এই যুগেয় বিষময় ফল ও ধ্বংসের হাত হতে রক্ষার জন্য "হরিনাম" একান্তভাবে আশ্রয় করুন, জীবনের প্রধান ব্রত করুন, পরমকল্যাণ ও পরমানন্দ আপনার জীবনের সঙ্গী হবে, সে বিষয়ে সংশয় নেই।

জয় জগদ্বন্ধু! জয় মহাপ্রভু!

———

স্থান :—বার্ণপুর, বক্তৃতার দিন ৮-৩-৬১ হতে ১৪-৩-৬১
এবং ১. ৯. ৬১—২. ৯. ৬১ অমৃত বাজার পত্রিকা

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

(১)

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্—গীতা

ভক্তিশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত। ভাগবতের প্রতিপাদ্য দেবতা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীভগবানকে লাভ করার বহু পথ আছে, প্রধান পথ তিনটি—জ্ঞান মার্গ, যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গ। এক একটি মার্গ অবলম্বন করে বহু পথের ও মতের সৃষ্টি হয়েছে। আবার যে কোন দুটি বা তিনটি মার্গের কিছু কিছু মিশ্রণ ঘটেও নানা পথ হয়েছে, যেমন জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, যোগমিশ্রা জ্ঞান ইত্যাদি।

ভাগবত ভক্তিমার্গের কথা বলেছেন। ভক্তি পথের দুটি প্রধান ধারা—বৈধী ভক্তি বা সাধনভক্তি এবং রাগাত্মিকা ও রাগানুগা ভক্তি। ভগবান লাভ জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, তিনি পরমদেবতা, তাঁকে না পাওয়া পর্যন্ত সংসারের দুঃখ কষ্ট দূর হয় না, জীবনে শান্তি পাওয়া যায় না। তাঁকে ভুলে থাকলেই দুঃখ পেতে হবে। শাস্ত্রের এই সকল কথা শুনে অনেকে সাধনে ব্রতী হয়। এদের স্বতঃই শ্রীভগবানে কোন অনুরাগ নেই। দুঃখ-মুক্তি সুখলাভ, কামনার পূর্তিই প্রধান লক্ষ্য। তাঁদের অবস্থা—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়ায়॥ চৈঃ চঃ

শাস্ত্রের এইরূপ আশ্বাস বাক্যে যারা সাধন ভজনে তৎপর হন, তারা বৈধী ভক্ত। প্রচলিত কথা, মানুষ কর্মফলে দুঃখ পায়। ইহার কারণও মায়া। মায়ার প্রভাবে জীব অজ্ঞানতা বশে নানা দুষ্কর্ম

করে। ফলে ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করতে হয়। সংসারের দুঃখ মোচনের জন্য ভগবানকে ডাকা কর্তব্য। শাস্ত্র সকল এই কর্তব্যের কথা নির্দেশ করেছেন। শাস্ত্রের উপদেশ, সাধু ও গুরুজনের বাক্যে ভজনের চেষ্টা বৈধী ভক্তি।

রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায়॥ চৈঃ চঃ

শ্রীভগবানে স্বাভাবিক অনুরাগ নেই। ভজন করতে করতে অনুরাগ জন্মে। দীক্ষা গ্রহণ, গুরুসেবা, সাধুসঙ্গ, নাম সংকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, কৃষ্ণতীর্থে বাস, নববিধা ভক্তি যথা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন, পরিচর্যা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই ভক্তির প্রধান অঙ্গ।

সাধন ভক্তিতে ভগবানকে মনে হয় বিরাট, মহতো মহীয়ান এবং নিজেকে অতি ক্ষুদ্র ও হীন। ঐশ্বর্যের বোধ ভগবানের প্রতি সম্ভ্রম জাগায়, তিনি আমার পরম প্রভু, এই ভাব সদাই বর্তমান থাকে। ভগবানকে আপনজন বলে ভাবতে পারে না ভক্ত। সেজন্য ভগবান এই ভক্তির বশীভূত হন না।

রাগমার্গের ভক্তি রাগাত্মিক ও রাগানুগা। রাগাত্মিকা ভক্ত স্বভাবতঃ কৃষ্ণে উন্মুখ, শ্রীকৃষ্ণে তাঁদের গাঢ় অনুরাগ ও পরম আবিষ্টতা, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে তাঁদের প্রবল তন্ময়তা। শ্রীকৃষ্ণে তাঁদের অনুরাগের পিছনে কোন হেতু বা উদ্দেশ্য নেই। তাঁদের সমস্ত মন-প্রাণ-দেহ কৃষ্ণে সমর্পিত। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অপর কিছু তাঁরা জানেন না বা ভাবতে পারেন না। কৃষ্ণ তাঁদের একান্ত আপন জন, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। কৃষ্ণকে সেবা সুখ দান তাঁদের সত্তার একমাত্র কাজ, দিবারাত্র এই ভাবনাতে তন্ময়। এজন্য কোন দুঃখ কষ্ট তাঁরা অতি আগ্রহে আনন্দপূর্ণ অন্তরে বরণ করে নেন। রাগাত্মিকা ভক্তের প্রধান হচ্ছেন ব্রজবাসীজন। ভগবান তাঁদের একান্ত আপন বলে, কোন সংকোচ বোধ নেই। ভগবানকে তাঁরা নিজেদের সমান বা অত্যন্ত ছোট-হীন বা প্রাণাধিক প্রিয় বলে মনে করেন। ব্রজের ভক্তগণের মধ্যে সখ্য,

বাৎসল্য ও মধুর রসের সর্বাতিশায়ী চমৎকারিত্ব। তাঁদের শুদ্ধ প্রেমে ভগবান সর্বতোভাবে তাঁদের অধীন হন।

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ রতি॥
আপনারে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন॥ চৈঃ চঃ

বাৎসল্য রসের মায়েদের প্রতি তাঁর ভাব—

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥ চৈঃ চঃ

সখ্য-রসাবিষ্ট সখাগণের প্রতি ভাব—

সখা শুদ্ধ-সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড়লোক তুমি আমি সম॥ চৈঃ চঃ

মধুর-রসবিষ্ট ব্রজাঙ্গনাগণ কত প্রিয় ভগবানের—

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥ চৈঃ চঃ

মধুর রসের ভক্তগণের দুই প্রকার ভাব পরিলক্ষিত হয়—এক স্বকীয়া ও অপর পরকীয়া। স্বকীয়ায় কৃষ্ণকে নিজ পতিজ্ঞান করেন। আর পরকীয়ায় কৃষ্ণকে উপপতি বলে জানেন। স্বকীয়ারা বিধি অনুসারে বিবাহিতা, পাতিব্রত্য ধর্মে অবিচলিতা। পরকীয়ায় গাঢ় অনুরাগে আত্ম-সমর্পণ যাঁদের, ইহলোক-পরলোক-ধর্মাধর্ম উপেক্ষা করে তাঁরা কৃষ্ণে অনুরাগিনী, যেমন ব্রজদেবীগণ। রুক্মিনী, সত্যভামাদি স্বকীয়া।

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া পরকীয়া ভেদ দ্বিবিধ সংস্থান॥
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥

শ্রীরাধিকার প্রেম চরম উৎকর্ষতাপ্রাপ্ত এবং মদীয়তাময় মধু-স্নেহ-প্রযুক্ত ঐশ্বর্যগন্ধহীন এবং সর্বোত্তম। শ্রীরাধার প্রেমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বতোভাবে বশীভূত। তিনি বলেন—

শ্রীরাধার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥

এই সব ভক্তের নিকট ভগবান একেবারে অধীন হয়ে যান, তাঁদের জন্ম ভগবান সবই করেন, এমন কি তাঁদের দাসত্ব পর্যন্ত।

জলন্ত অনল কৃষ্ণ ভক্ত লাগি যায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥ চৈঃ চঃ

এই ভক্তির অপরাপর নাম শুদ্ধাভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি, কেবলা রতি, প্রেমভক্তি। এই ভক্তিই ভাগবতের প্রাণ। এই ভক্তি অত্যন্ত দুর্লভ। এই প্রেমভক্তি ভগবান সহসা দান করেন না।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥

এই ভক্তিই গৌরহরি-স্বরূপে সর্বজীবে দান করেছিলেন। এই ভক্তির কথা জগৎজীবকে জানাতে ভাগবত প্রকটিত হয়েছেন।

রাগাত্মিকা ভক্ত ব্রজবাসীজনের আনুগত্যে যাঁরা ভজন করেন, তাঁদের ভক্তি রাগানুগা।

রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসীজনে।
তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে॥ চৈঃ চঃ
ব্রজলোকের কোন ভাব লৈয়া যেই ভজে।
ভাব যোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণে পায় ব্রজে॥ চৈঃ চঃ

রাগানুগা ভজনের দুই অঙ্গ—বাহ্য ও অন্তর। বাহে শ্রবণ-কীর্তন, শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-লীলার শ্রবণ ও কীর্তন। অন্তরে রাগাত্মিকা কোন ভক্তের অনুগত হয়ে মানসে কৃষ্ণ-সেবা। মনে নিজ সিদ্ধ দেহ অর্থাৎ গোপীদেহ বা মঞ্জরী দেহ ভাবনা করে সখীর আনুগত্যে কৃষ্ণসেবার আনুকূল্য বিধান। বাৎসল্য রসে মা যশোদার অনুগত হয়ে মায়ের অভিপ্রেত গোপন সেবা করণীয়। মধুর রসে ব্রজগোপিকার অনুগত

হয়ে তাঁদের কৃষ্ণ সেবার অনুকূলে সেবা করণীয় অন্তরে, মানস ভাবনায়। রাগানুগার—

বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্য সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥ চৈঃ চঃ
গোপী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্যের জ্ঞানে।
ভজিলে নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥

পরম করুণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানব-দেহ ধারণ করে ধরায় এসেছিলেন এবং আপন স্বরূপশক্তি ব্রজগোপীগণের সঙ্গে প্রেমের লীলা করেছিলেন, এহেন লীলা করেন যা শুনলেই চিত্ত ভগবৎ পরায়ণ হবে। বিষয় ভোগমুখী চিত্ত ঈশ্বরমুখী—

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং তনুমাশ্রিত।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥

ভাঃ ১০।৩৩।৩৭

গোপীর প্রেমসম্পদে চিত্ত লুব্ধ হবে। নিরন্তর শ্রবণে চিত্তের সকল ভোগবাসনা দূর হয়ে যাবে। শ্রবণ-মঙ্গলম্—এই লীলা।

আজিহ শুনিল না যেহ শুনিতে শুনিতে সেই,
কি অদ্ভুৎ চৈতন্য চরিত॥
কৃষ্ণে উপজীবে প্রীত জানিবে রসের রীত
জানিলেই বড় হবে হিত॥

এই প্রেমভক্তি লাভের একমাত্র উপায় লালসা (লৌল্যমপি মুল্যং একলম্)। লালসা জাগে সঙ্গে। ক্ষণকালের সঙ্গও সর্বার্থ-সাধক—"লব মাত্র সাধু সঙ্গে সর্ব সিদ্ধি হয়"। ব্রজের পরিকরগণের সঙ্গ পাবার কোন উপায় নেই আমাদের। ভাগবত বলেছেন, প্রসঙ্গেও হবে, মানস সঙ্গ হবে। বসন্ত রোগ খুব ছোঁয়াচে। এক

অঞ্চলে বসন্ত দেখা দিয়েছে, অন্য অঞ্চলে বসে যদি বসন্তের বিষয় আলোচনাও করেন, তবে বসন্ত হবে না। কিন্তু ভগবদ্ ভক্তের প্রসঙ্গে, তাঁদের কথা আলোচনা করলে আপনার চিত্ত নির্মল হবে, তাঁদের ভক্তিভাব আপনার মধ্যে সঞ্চারিত হবে। লালসা যদি একবার জাগে, তবে জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। সকল ধর্মকর্ম পরিত্যাগ করে শ্রীভগবানে একান্ত শরণাগতি জাগায়। "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"– গীতা-১৮/৬৬। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর বলেছেন—"ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত সার কর অবিরত।" ভাগবত ধর্ম অবলম্বন করুন, ভাগবতকে জীবনের সার করুন। নিরন্তর ভাগবত শ্রবণ করুন। গোপীগণ দেহধর্ম, কুলধর্ম, সমাজধর্ম, পাতিব্রত্য ধর্ম সকলই ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছিলেন, অথবা একান্ত শরণাগতির ফলে তাঁদের সকল ধর্ম পরিত্যক্ত হয়েছিল। নিরন্তর তাঁদের কথা শ্রবণে, স্মরণে তাঁদের ভাব আপনার মধ্যেও সঞ্চারিত হবে। তাঁদের প্রেম সম্পদের জন্য অন্তরে জাগবে লালসা। লোভ জাগলেই প্রাপ্তি। জগতে দেখা যায়, লালসা বস্তু-প্রাপ্তির সহায়ক হয় না। কোন বস্তুর জন্য লালসা হলে সেই বস্তু এসে হাজির হয় না। অর্থের জন্য যদি খুব লালসা জাগে আপনার, তাতে অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে না। কিন্তু, অপ্রাকৃত ভগবদ্-প্রেম, ভক্তি লাভের উপায়ই হচ্ছে লালসা। এই প্রেম কোটি জন্মের সুকৃতি থাকলেও পাওয়া যাবে না (জন্মকোটি সুকৃতৈর্ন লভ্যতে)॥ তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেছেন—

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম সর্ব ত্যজি সেই কৃষ্ণ ভজয়॥

ভক্তদের কথায় ভাগবত পূর্ণ। ভক্তের কথা, কৃষ্ণ-কথা নিরন্তর শ্রবণ করুন। শুনলেই কল্যাণ-"মঙ্গলম্"। আর কিছু করার প্রয়োজন হবে না। কৃষ্ণ কথা অমৃত মধুর, হৃদি-কর্ণ-রসায়ন। "না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি চায়"।

ভাগবত ধর্ম কৃষ্ণ কৃপার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। জগৎ জীবকে প্রেম-ভক্তি-দান দাতা-শিরোমণি শ্রীভগবানের করুণার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। মর জগতে অমৃত পুরুষের আবির্ভাব পরম করুণার বার্তা বহন করে এনেছে। হে পুরুষোত্তম! তোমার শুভ জন্ম-কথা, জন্ম জয়ন্তী জয়যুক্ত হোক, সার্থক হোক জগৎবাসীর জীবন, শান্তি পরমানন্দে পূর্ণ হোক সকলের জীবনে তোমার করুণার স্পর্শে।

ভাগবত শাস্ত্রকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—এক ভক্তামৃত, অপর কৃষ্ণামৃত। ভাগবতের মোট বারটি স্কন্ধ এবং প্রতি স্কন্ধে অনেকগুলি করে অধ্যায়। যদিও ভাগবতের প্রাণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই গ্রন্থের নায়ক এবং ভাগবত তাঁর কথাই বলতে বসেছেন, তথাপি গ্রন্থের তিন ভাগ অন্তে দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। প্রথম নয়টি স্কন্ধে ভক্ত-চরিতসুধা বর্ণনা করা হয়েছে। নারদ, প্রহ্লাদ, অম্বরীশ, রন্তিদেব, ধ্রুব, রাজা ভরত প্রভৃতির মহান চরিত কথা। দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ লীলা বর্ণনায় বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা লীলার কথা। একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের শেষ উপদেশ, লীলার উপসংহার, নারদ-বসুদেব এবং বসুদেব-উদ্ধব সংবাদে ভাগবত ধর্ম কথন। দ্বাদশ স্কন্ধে মগধ রাজবংশ বর্ণন, কলিধর্ম, পরীক্ষিতের মুক্তিলাভ ও ঋষি সমীপে সূতের সমস্ত পুরাণের পরিচয় প্রদান।

(২)

শুদ্ধাভক্তি বা অহৈতুকী ভক্তিই ভাগবতের প্রাণ। ভাগবত এই ভক্তির কথাই শুনিয়েছেন ভক্তগণের মাধ্যমে। এই ভক্তির চরম প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় ব্রজের পরিকরগণের মধ্যে। একমাত্র ধ্রুবের ভক্তি ছিল সকাম, তবে উহা কেন ভাগবতে স্থান পেয়েছে? পিতৃরাজ্যলাভের উদ্দেশ্যেই ধ্রুব শ্রীহরির ভজন আরম্ভ করেন। সাধনান্তে শ্রীহরির কৃপা ও দর্শন লাভ করে ধ্রুবের চিত্তে শুদ্ধাভক্তির উদয় হয়। শ্রীহরি বর দিতে চাইলে ধ্রুব বল্লেন—

স্থানাভিলাষী তপসী স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং
স্বামিন্। কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥

—হে প্রভো! কাচ খুঁজতে গিয়ে যদি কেউ দিব্যরত্ন পায়, সে যেমন আর কাচ চায় না, সেইরূপ স্থান (রাজ্য) প্রাপ্তির জন্য তপস্যা করতে এসে দেবমুনীন্দ্রগণের অপ্রাপ্য তোমাকে পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি, আমি আর বর প্রার্থনা করি না।

ধ্রুবের ভক্তি মালিন্য শূন্য হয়েছে, শুদ্ধাভক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে বলেই ভাগবতে স্থান পেয়েছে। সকাম ভক্ত নিষ্কাম হয়, ইহা আমাদের সকলের পক্ষে খুব ভরসার কথা। বাসনা কামনার অন্ত নেই আমাদের, বাসনা-কামনা নিয়েই সাধন পথে চলতে হবে, কৃষ্ণ-কৃপায় বিষয় বাসনা-রূপ মালিন্য দূরে যাবে এবং শুদ্ধাভক্তির উদয় হবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

কৃষ্ণ কহে আমা ভজে মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ॥
আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥

ভক্তামৃত অর্থাৎ ভক্তগণের চরিত্র মাধুর্য শ্রবণে যদি ইচ্ছা জাগে জানতে, যাঁকে ভক্তি করে, ভালবেসে এঁরা এত মহৎ, ও উদার হয়েছেন, না জানি সেই দেবতাটি কত মহৎ, ঔদার্যপূর্ণ এবং পরম কারুণিক। ভক্তগণের পরম দেবতা সেই শ্রীকৃষ্ণের কথা জানবার ও শোনবার ইচ্ছা জাগলেই কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হবে। নয়টি স্কন্ধব্যাপী ভক্তগণের বিরাট বিজ্ঞাপন উপস্থাপন করে ভাগবত আমাদের আকৃষ্ট করেছেন গ্রন্থের নায়কটিকে জানবার; দশম স্কন্ধের প্রারম্ভে তাঁর শুভ আবির্ভাবের সূচনা। ইহা শ্রীগ্রন্থের এক পরম বৈশিষ্ট্য।

"শ্রবণ মঙ্গলম্", শুনলেই কল্যাণ এই দাবি একমাত্র ভাগবত শাস্ত্রের। অপরাপর শাস্ত্র সকল প্রধানতঃ বিধি-নিষেধের নির্দেশ

দিয়েছেন। বিধি যা আমাদের করণীয় এবং নিষেধ যা করণীয় নয়। কি কর্তব্য ও কি অকর্তব্য তা জানলেই হবে না। তা নিজ জীবনে পালন করতে হবে, তবেই কল্যাণ হবে। আর জেনে যদি তা পালন না করি, তবে না জানার চাইতে অন্যায় ও ক্ষতিকারক হবে। না-জেনে অন্যায় করলে তত পাপ নয়, জেনে অন্যায় করলে যত পাপ। ডাক্তার যে ব্যবস্থা-পত্র (Prescription) দিয়েছেন, তা কেবল জেনে লাভ নেই, মুখস্থ করলে রোগ সারবে না, তদনুসারে আপনাকে চলতে হবে, ঔষধ খেতে হবে, তবেই রোগ সারবে, মঙ্গল হবে। ভবরোগী আমরা, শাস্ত্রের কথা জেনে লাভ হবে না, জীবনে রূপায়িত করতে হবে, তবেই কল্যাণ। একমাত্র ভাগবত শাস্ত্র-কথা, কৃষ্ণ-কথা শ্রবণে কল্যাণ। কৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য, লীলা-মাধুর্য বেণু-মাধুর্য ও প্রেম-মাধুর্যের নিরন্তর শ্রবণে চিত্ত কৃষ্ণে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, ভোগ-বাসনা বিষয়-বাসনা তিরোহিত হয়। সকল শাস্ত্র কৃষ্ণকেই সম্বন্ধ করেছেন, কৃষ্ণই সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতা, স্বয়ং ভগবান। তাঁকে প্রাপ্তির উপায় ভক্তি এবং প্রাপ্তি কৃষ্ণপ্রেম, প্রেম-সুখভোগই মুখ্য প্রয়োজন জীবের, ভবক্ষয় বা দুঃখনিবৃত্তি নয়।

বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম তিন মহা ধন ॥
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ।
তাঁর জ্ঞানে আনুসঙ্গে যায় মায়াবন্ধ ॥
গৌণ মুখ্য বৃত্তি কি অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥ চৈঃ চঃ

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম অর্থাৎ লীলাকথা জানতে হবে, তত্ত্বতঃ জানতে হবে। দ্বাপরের অন্তিম পর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। ভগবান মনুষ্যদেহ ধারণ করে এই জগতে আসেন, এই সংবাদ অত্যন্ত স্পষ্ট করে শ্রীগীতা শাস্ত্র গ্রন্থে নিজ মুখে উল্লেখ করেছেন। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমে অর্জুনের একটি সাধারণ প্রশ্নের উত্তরে জগতে তাঁর শুভ আবির্ভাবের তত্ত্বটি ব্যক্ত হয়েছে। ভগবান অর্জুনকে বল্লেন,

তোমায় যে অব্যয় যোগের কথা বল্লাম, তা অতি প্রাচীন। উহা পূর্বে আমি বিবস্বানকে বলেছিলাম, বিবস্বান তাঁর পুত্র মনুকে এবং মনু স্বীয় পুত্র ইক্ষাকুকে উহা বলেন। এইরূপে রাজর্ষি পরম্পরায় উহা চলে আসছিল। কালবশে সেই যোগ নষ্ট হয়ে গেছে, লোকে ভুলে গেছে।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্ট পরন্তপ ॥

এই যোগ অতি উত্তম গুহ্য তত্ত্ব। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, সখা, বন্ধু, তাই তোমায় আবার বল্লাম। ভগবানের এই কথায় অর্জুনের সংশয় হল এবং তাতে ভালই হল। এক অতি নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান আমরা পেয়ে গেলাম। অর্জুন বল্লেন—তোমার জন্ম হল সেদিন আর মনু ইক্ষাকুর জন্ম কত কাল পূর্বে। তুমি তাদের একথা বলেছিলে, তা কেমনে বিশ্বাস করব। উত্তরে ভগবান জানালেন অর্জুনকে, তোমার ও আমার বহু জন্ম বিগত হয়েছে। তুমি তা ভুলে গেছ কিন্তু আমি তা ভুলিনি। এতে বোঝা গেল, অর্জুনের চৈতন্য আবৃত, ভগবানের অনাবৃত। কথার উত্তর দিয়েও ভগবান বক্তব্য শেষ করেন নি। তিনি বল্লেন,—আমি অজ, জন্মহীন, অবিনশ্বর ও সর্বভূতের ঈশ্বর অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামী-শ্বরোহপি সন্-গীতঃ ৪/৬)। এই জগতের নিয়ন্তা ও চালক ভগবান, নিয়ন্ত্রিত জগতে কেমন করে তিনি আসবেন? অব্যয় অপরিনামী যিনি, সতত পরিবর্তনশীল এই জগতে কেমন করে তিনি চলবেন? যিনি সেনাধ্যক্ষ, সাধারণ সৈনিকের সঙ্গে তিনি একত্র হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে চলতে পারেন না। ভগবানের এই জগতে আসা ও জগতের মধ্যে চলা এক ভয়ানক রহস্যজনক ব্যাপার। ভগবান নিজে এই রহস্য উদ্‌ঘাটন না করলে বুদ্ধি দিয়ে কখনই তা জানা সম্ভব হোত না।

ভগবান বল্লেন,—যদিও আমি জন্মরহিত ও অপরিণামী, সতত পরিবর্তনশীল এই জগতে আমার চলা সম্ভব নয়, তথাপি আমার জন্ম ও জগতে বিচরণ সম্ভব হয় অতি কৌশলে, স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত

হয়ে আত্মমায়া অবলম্বনে (প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া —গীতা : ৪/৬)। আমি যুগে যুগে আসি। যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের ভয়ানক বিস্তার ঘটে, তখন সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃত-কারীদের বিনাশ পূর্বক ধর্ম সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হই।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ গীতাঃ ৪/৮

মনুষ্যদেহ ধারণ করে যখন আসি, সাধারণ লোক আমার পরমভাব বুঝতে পারে না। আমাকে জাগতিক অপরাপর লোকের মত মনে করে অবজ্ঞা করে (অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ —গীতাঃ ৯/১১)। আমি কিন্তু অপরিবর্তনীয় থাকি এবং আমার যা প্রয়োজন সবই নিয়ে আসি আমার চিন্ময় ধাম হতে। জড় জগতের কিছুই তাঁর চিন্ময় সত্তার গ্রহণযোগ্য নয়। গীতায় সূত্ররূপে যা ব্যক্ত করেছেন, শ্রীভাগবতে তা বিস্তার করেছেন। তাঁর জন্ম ও কর্ম অর্থাৎ জাগতিক সব লীলা দিব্য, অপ্রাকৃত মাধুর্যমণ্ডিত। প্রাকৃত জনের জন্ম হয় কর্মফলে, শ্রীভগবানের আগমন স্বেচ্ছায়, ভক্তের প্রার্থনায়, জগতের হিতার্থে। জগৎজীব সংসারে আসে সুখ-দুঃখ ভোগ করতে, ভগবান আসেন আনন্দ আস্বাদন করতে, অফুরন্ত আনন্দপূর্ণ তাঁর সত্তা, পূর্ণানন্দময় তিনি। নিজেকে নিজে আস্বাদন করেন, আত্মাস্বাদনই তাঁর লীলা। সীতাকে হারিয়ে শ্রীরামচন্দ্র যে বনে বনে বিলাপ করে ফিরছেন, তা দুঃখে নয়, নিজের আনন্দে, লীলারস আস্বাদনে। এই রহস্য যিনি তত্ত্বতঃ জানেন, উপলব্ধি করেন, তিনি জন্ম-মৃত্যুর পারে চলে যান, সুখ-দুঃখপূর্ণ মরণধর্মী এই সংসারে তাঁকে আর ফিরে আসতে হয় না, শ্রীভগবানের অমৃতলোকে তাঁর চিরস্থিতি।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ গীতাঃ ৪/৯

(৩)

শ্রীভগবান জগতে আসেন এবং ভক্তগণের সেবা-পূজা গ্রহণ করেন। এজন্য শ্রদ্ধায় তাঁর শ্রীমূর্তির সেবা ও বিবিধ উপচারে পূজা ভোগ প্রদান, শ্রীভগবানকে প্রাপ্তির উপায় হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কিন্তু জগতে যে সকল বস্তু আমরা চর্মচক্ষে দেখতে পাই, তা সবই জড়। শ্রীভগবান চিন্ময়, এজন্য তিনি সর্বভূতে বর্তমান থাকলেও আমরা দেখতে পাই না। জড় ও চিন্ময়ের ব্যবধান অলঙ্ঘনীয়। জড় বস্তুর সামর্থ্য নেই চিন্ময় বস্তুকে স্পর্শ করার, চিন্ময় বস্তুর উপায় নেই জড় বস্তু গ্রহণ করার। "যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" – অর্থাৎ বাক্য, মন সেই চিন্ময় স্বরূপের সন্ধান না পেয়ে ফিরে আসে।

শ্রীভগবানকে আমরা ধ্যান করি, পূজা করি, ফুল-ফল-জল প্রদান করি, তবে কি তা তাঁর কাছে পৌঁছয় না? আমাদের এই সকল চেষ্টা সবই কি ব্যর্থ? না, তা নয়। এই জড় জগতে একটি মাত্র বস্তু আছে, যা জড় নয়, যা চিন্ময় ও জড়ের বিশাল ব্যবধানকে ঘুচিয়ে দিতে সমর্থ, যার স্পর্শে জড় বস্তু চিন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, যেমন কয়লা আগুনে পুড়ে আগুন হয়ে যায়। সে বস্তু শ্রীভগবানে নির্মল ভক্তি, যথার্থ প্রীতি, গাঢ় অনুরাগ। গীতা শাস্ত্র-গ্রন্থে ভগবান অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন অর্জুনকে—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ৯/২৬

—যিনি পত্র, পুষ্প, ফল, জল ভক্তি-সহকারে আমাকে প্রদান করেন, সেই শুদ্ধচিত্ত ভক্তের ভক্তি-প্রদত্ত বস্তু আমি গ্রহণ করি।

তেল কখনই জলে ডোবে না, কিন্তু যদি পাথর-খণ্ডে ভাল করে তেল মাখিয়ে জলে দেওয়া হয়, পাথরের সঙ্গে লেগে তেলও ডুবে যায়। সেইরূপ জগতের জড় বস্তু ভক্তি-মাখান হলে, ভগবান ঐ ভক্তিটুকু নিতে গিয়ে ঐ বস্তুও গ্রহণ করেন। এইখানেই পূজা, ধ্যান,

জপ প্রভৃতি ভগবদ্ সান্নিধ্যলাভের প্রয়াসগুলির সার্থকতা। বিবিধ উপচারে আড়ম্বরের সঙ্গে পূজা অর্থহীন হবে, যদি সেখানে প্রেম না থাকে।

নানোপচারকৃতপূজনমার্তবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখাবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতোনন্নু ভক্ষ্যপেয়ে॥ চৈঃ চঃ মধ্য-৮

—যে পর্যন্ত তীব্র ক্ষুধা ও পিপাসা জঠরে থাকে, সেই পর্যন্ত খাদ্য ও পেয় সুখের কারণ হয়। সেইরূপ বিবিধ উপচারকৃত পূজা ছাড়াই প্রেমদ্বারা ভক্তহৃদয় সুখে দ্রবীভূত হয়।

প্রেমই হচ্ছে শ্রীভগবানের জন্য ক্ষুধা। এই ক্ষুধা জাগলেই ভগবদ্-প্রাপ্তি হবে, তাতে কোন সংশয় নেই। জাগতিক বস্তুর জন্য ক্ষুধা বা লালসা জাগলে সেই বস্তু পাওয়া যায় না। যদি সন্দেশের জন্য আপনার লালসা জাগে তবে সন্দেশ এসে হাজির হবে না। কিন্তু ভগবানের জন্য লালসা যদি জাগে, প্রেম জাগে, ভগবান যেখানেই থাকুন, ঐ প্রেমই ভগবানকে টেনে আনবে। আর প্রেম যদি না থাকে, তবে ভগবানকে সামনে পেলেও তাঁর আনন্দ-মাধুর্য কিছু ভোগ হবে না, যেমন কংস-শিশুপাল-দুর্যোধন কৃষ্ণকে নিকটে পেয়েও কিছু পায় না।

শ্রীভগবানে প্রেম-প্রীতি-ভক্তির উপাসনা নিত্যকাল আছে। বেদেও তার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যয়ে। প্রাচীনেরা এই ধারাকে সাত্বত ধারা বলে উল্লেখ করেছেন। উহা একটা পূর্ণ বা চরম রূপ পরিগ্রহ করে দ্বাপর ও কলির যুগ-সন্ধিক্ষণে ভাগবত ধর্মে, শ্রীভাগবতের আবির্ভাবে, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কেন্দ্র করে।

কলিযুগের শুরুতে শ্রীভাগবত প্রকটিত হয়েছেন। জ্যোতিষীর গণনা অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলায় অবস্থান কালে কলি এসে গেছে। ধরা পৃষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শ থাকায় কলি নেমে আসেনি, শূন্য দেশে জ্যোতিষ্কের মত অবস্থান করছিল। শ্রীকৃষ্ণ নিজ ধামে

গমন করলে কলি নেমে আসে এবং আপন কলুষ প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়।

অর্জুনের পৌত্র ও অভিমন্যুর পুত্র পরমভাগবত রাজা পরীক্ষিতের রাজত্বকাল। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের তখন শেষ। কুরু-পাণ্ডব বংশের একমাত্র বংশধর তিনি তখন মাতৃগর্ভে। পাণ্ডবদের নির্বংশ করার ইচ্ছায় দ্রোণপুত্র অশ্বত্থমা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেন তাঁর প্রতি। মাতা উত্তরার আকুল ক্রন্দন ও সকরুণ প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। মাতৃগর্ভে থেকে শ্রীকৃষ্ণের মধুর রূপ দেখেছিলেন তিনি। জন্মাবার পর প্রতিটি মানুষকে পরীক্ষা করে দেখতেন, সেই অপরূপ রূপের মানুষটি কিনা। তাই নাম হয়েছে পরীক্ষিৎ।

অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষে দিগ্বিজয়ে যাত্রা করে রাজা পরীক্ষিৎ একস্থানে দেখতে পেলেন, রাজবেশ ধারণ করে এক শূদ্র একটি একপদ বৃষ এবং ক্রন্দনরতা একটি গাভীকে পদাঘাতে পীড়ন করছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই শূদ্রকে বধ করতে উদ্যত হলেন। সে রাজার চরণে পড়ে প্রাণভিক্ষা চাইল। রাজা সেই শূদ্রের পরিচয় 'কলি' জেনে তাকে বল্লেন,—শরণাগত বলে তোকে বধ করলাম না, তুই এখুনি আমার এরাজ্য পরিত্যাগ কর। কলি অত্যন্ত অনুনয় সহকারে সামান্য একটু স্থান চাইল, কেবলমাত্র যেখানে সে অবস্থান করবে। রাজা তার সনির্বন্ধ প্রার্থনায় চারটি স্থান দিলেন—দ্যুতক্রীড়া, সুরাপান, প্রাণি-হিংসা ও স্ত্রীসঙ্গ। কলি রাজাকে কিছুটা দয়ার্দ্র দেখে অত্যন্ত কাতর-ভাবে আর কিছু স্থানের জন্য বারংবার প্রার্থনা জানালে, রাজা তাকে আর ছ'টি স্থান দেন, যেমন সুবর্ণ, মিথ্যা, গর্ব, কাম, হিংসা ও বৈরীতা। কলি খুসী হয়ে চলে গেল।

তখন একপদী বৃষ ও গাভীটিকে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা কে? বৃষের প্রতি লক্ষ্য করে বল্লেন,—আপনার আর তিনটি পদ কি করে নষ্ট হল? বৃষ বল্লেন,—আপনি নিজে বিচার করে দেখুন কার জন্য আমাদের এই ক্লেশ। যোগীরা বলেন, আত্মাই

আত্মার বন্ধু আবার আত্মাই আত্মার শত্রু ("আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ"—গীতাঃ ৬/৫) দৈবজ্ঞ বলেন, গ্রহের প্রভাবই জীবের সুখদুঃখের কারণ। মীমাংসক কর্মকেই কারণরূপে নির্দেশ করেন। আর নাস্তিকের মতে স্বভাবই জীবের সুখ-দুঃখের হেতু। বৃষের মুখে এই অদ্ভুত বাক্য শুনে রাজা পরীক্ষিৎ খুব বিস্মিত হলেন। সমাহিত চিত্তে ভাবনা করে রাজা জানতে পারলেন, বৃষটি হচ্ছেন স্বয়ং ধর্ম এবং গাভীটি পৃথিবী। সত্যযুগে ধর্মের চারি পদ, ত্রেতায় তিন, দ্বাপরে দুই এবং কলিতে মাত্র একপদ অবশিষ্ট আছে। ধর্ম ভগ্ন-পদ হলেও যাঁর প্রভাবে চারিপদবিশিষ্টের ন্যায় বর্তমান থেকে লোকের সুখ ও কল্যাণ বিধান করতেন, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহলোক ত্যাগ করে গেছেন। সর্বত্র কলির পাপদৃষ্টি পড়েছে, অধর্মে আচ্ছন্ন হচ্ছে। রাজারা উচ্ছৃঙ্খল, আসুরিক ভাবাপন্ন, ক্রুরকর্মা ও প্রজাপীড়ক হয়ে উঠছে। তাঁদের অধর্মাচরণে পৃথিবী বেদনার্ত। পৃথিবীর এক নাম সর্বংসহা, পৃথিবীর বক্ষে বহু প্রকারের অত্যাচার অবিচার ঘটে, তিনি সবই সহ্য করেন। সেই রাজগণের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তাই পৃথিবী দুঃখিতা ও রোদনপরায়ণা। রাজা পরীক্ষিৎ ধর্মের একপদের সঙ্গে তপঃ, শৌচ ও দয়া যুক্ত করে দিলেন। উভয়কে আশ্বাস প্রদান করে তিনি চলে গেলেন।

রাজা পরীক্ষিতের রাজত্বের অন্তিম পর্ব। একদিন এই পরম ধার্মিক রাজা এক অশুভ ক্ষণে মহতের অবমাননা করে বসলেন। মৃগয়ায় বেরিয়েছিলেন রাজা। ঘুরতে ঘুরতে ভয়ানক তৃষ্ণার্ত হন। জলের খোঁজ করতে করতে এক ঋষির আশ্রমে এসে উপস্থিত হন। দেখলেন জটাজুট-সমন্বিত ও মৃগচর্মাবৃত এক ঋষি বসে আছেন। ঋষিবরকে লক্ষ্য করে রাজা আকুল কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে জল চাইলেন। ঋষিবর যেমন বসেছিলেন তেমনি রইলেন, বিন্দুমাত্র নড়লেন না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আচ্ছন্ন-বুদ্ধি রাজার মনে হল ঋষিবর তাঁকে উপেক্ষা করলেন, তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না। তখন ক্রোধাবেশে

রাজা নিকটে একটি মৃত সর্প দেখে উহা ঋষির গলায় জড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন। তথাপি ঋষিবরের কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। তাঁর নেত্র নিমীলিত, ইন্দ্রিয় বাহ্যবিষয়-নিবৃত্ত এবং আত্মা তুরীয় পদে লীন ছিল। রাজা দেখেও তা দেখলেন না বা জানালেন না। না জেনে এক মহা অপরাধ করে বসলেন। রাজ্যে ফিরে যাবার কালে মনে হয় কাজটা খুব খারাপ করেছেন, ঋষিবর হয়তো ধ্যানস্থ ছিলেন, তাঁর কথা শুনতে পান নি। এই কথা মনে হতে অন্তরে ভয়ানক অনুশোচনা এল।

ঋষি শমীক রাজার আগমন, জল-প্রার্থনা, গলদেশে মৃত-সর্প স্থাপন কিছুই জানেন না। তাঁর পুত্র বালক শৃঙ্গী তখন অন্যত্র অন্যান্য বালকগণের সঙ্গে খেলায় রত ছিল। তাঁর এক সহচর সংবাদ দিল,—'রাজা পরীক্ষিৎ তোমার পিতার গলদেশে মৃত সর্প অর্পণ করে ঘোর অপমান করেছেন'। শৃঙ্গী ইহা শুনে বল্ল,- রাজা প্রজাগণের রক্ষক, তার এরূপ অধর্ম-প্রবৃত্তি। ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়গণকে গৃহরক্ষায় নিযুক্ত করেছেন, ভৃত্য যদি প্রভুর অপমান করে, তবে দ্বাররক্ষক কুকুর হতে তার প্রভেদ কি? উৎপথগামী ব্যক্তিগণের শাস্তিদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করেছেন বলেই কি রাজা মর্যাদা লঙ্ঘন করেছেন? বেশ আমিই তাকে শাসন করছি। এই বলে ক্রোধে আরক্ত-নেত্র শৃঙ্গী কৌশিকী নদীর জলে আচমন করে অভিসম্পাত দিলেন (কৌশিক্যাপ উপস্পৃশ্য বাগ্বজ্রং বিসসর্জ হ)—'যে কুলাঙ্গার মর্যাদা লঙ্ঘন করে পিতার অপমান করেছে, আমার আজ্ঞায় মহাসর্প তক্ষক আজ হতে সপ্তম দিনে তাকে দংশন করবে।'

অতঃপর শৃঙ্গী আশ্রমে এসে পিতার গলায় মৃতসর্প দেখে উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে লাগল। শমীক বাহ্যজ্ঞান লাভ করে কণ্ঠের মৃতসর্প ফেলে দিলেন এবং পুত্রকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বালক সকল ঘটনা পিতাকে জানালে পর ঋষিবর পুত্রকে মোটেই সমর্থন করলেন না (নাত্মজমভ্যনন্দৎ)। তাকে তিরস্কার করে

বল্লেন,—অল্প অপরাধে গুরুদণ্ড দিয়ে তুমি মহাপাপে লিপ্ত হয়েছ, রাজা সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ, নরদেব, তাঁকে সাধারণ মানুষের ন্যায় ভাবা অনুচিত। রাজার প্রতাপে প্রজাগণ রক্ষিত হয়ে নির্ভয়ে সুখসমৃদ্ধি ভোগ করে। এখন সংসার দস্যুবহুল হবে. একে অন্যের পশু, স্ত্রী, অর্থ অপহরণ করবে, সদাচার ও আশ্রমধর্ম নষ্ট হবে। এখন এই সকল পাপ আমাদিগকে স্পর্শ করবে। রাজা পরীক্ষিৎ ধর্মসহকারে প্রজাপালন করেন (ধর্মপালো নরপতিঃ), মহাযশস্বী ও পরমভাগবত (সাক্ষান্মহাভাগবতঃ)। তিনি ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে যা করে ফেলেছেন, সেজন্য তাঁকে শাপ দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। হে সর্বান্তর্যামী ভগবন, এই নির্বোধ বালক নিরপরাধ সজ্জনের যে অনিষ্ট করেছে তা ক্ষমা করুন। রাজা ফিরে তোমার অভিশাপ দিলে তোমার প্রায়শ্চিত্ত করতে হত, কিন্তু মহাভাগবত রাজা তা করবেন না।

ঋষিবর শমীকের চরিত্র কি মহান্। নিজ পুত্রের অন্যায়ই কেবল তাঁর চোখে পড়ল, সেজন্য তিনি খুবই ব্যথিত হলেন। রাজা যে অন্যায় করেছেন, তাঁকে অপমান করেছেন, সেকথা তাঁর মনের কোণেও স্থান পায়নি। যথার্থ সাধুদের প্রকৃতিই এইরূপ। তাঁরা অপরের দ্বারা অনুষ্ঠিত ইষ্ট বা অনিষ্টে সুখলাভ বা দুঃখভোগ করেন না। কারণ আত্মা সুখ-দুঃখাদি গুণের অতীত।

প্রায়শঃ সাধবো লোকে পরৈর্দ্বন্দ্বেযু যোজিতাঃ।
ন ব্যথন্তি ন হৃষ্যন্তি যত আত্মাহ গুণাশ্রয়ঃ ॥ ভাঃ ১০/১৮/৫০

মহারাজ পরীক্ষিৎ নিজকৃত গর্হিত কাজের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে নিজালয়ে ফিরলেন। দুরাচারী অনার্য্যের মত আমি নিরপরাধ ঋষির অপমান করেছি, নিশ্চয় অচিরে আমার মহাবিপদ ঘটবে, প্রার্থনা করি বিপদ যেন অপরাধী আমাকেই আক্রমণ করে, পুত্রাদিকে স্পর্শ না করে, আমার রাজ্য-সৈন্য-সুসমৃদ্ধ ধনভাণ্ডার ব্রহ্মকোপানলে দগ্ধ হোক, তাহলে দেবতা-গো-ব্রাহ্মণের প্রতি এরূপ আচরণ পুনরায় ঘটবে না। রাজা যখন এরূপ চিন্তা করছেন, সেই সময় শমীক মুনি

প্রেরিত এক শিষ্যের নিকট হতে জানলেন ব্রহ্মশাপের কথা। মুনির পুত্র শৃঙ্গীর শাপে মৃত্যুরূপী তক্ষক সাত দিন শেষে তাঁকে সংহার করবে।

রাজা এই অভিশাপ বরণ করে নিলেন। মনে হল তাঁর, দেবদেব নারায়ণের কৃপাই ব্রহ্মশাপের রূপ ধরে এসেছে, তাঁর প্রায়শ্চিত্তের জন্য অপরাধ ক্ষালনের জন্য। তখন ইহলোক-পরলোক উভয়ই তাঁর নিকট অত্যন্ত হেয় মনে হল। শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবাই সমস্ত পুরুষার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে তিনি অনুভব করলেন। শান্তমতি রাজা স্বীয় পুত্র জনমেজয়ের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে গঙ্গার দক্ষিণ কূলে প্রায়োপবেশন করলেন। স্বর্গে দেবতাগণ আনন্দহৃদয়ে তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি করলেন এবং দুন্দুভি বেজে উঠেছিল। বিষয়াসক্তি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতঃ রাজা অনন্য মনে কৃষ্ণ পাদপদ্ম চিন্তা করতে লাগলেন। জগৎপাবন মহানুভব মুনিগণ সশিষ্য সেখানে রাজদর্শনার্থ সমাগত হলেন। তীর্থগমনচ্ছলে সাধুগণ প্রায়ই তীর্থসকলকে এইরূপে পবিত্র করে থাকেন (প্রায়েণ তীর্থাভিগমাপদেশৈঃ স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তি সন্তঃ)। অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, দেবল, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, অগস্ত্য, দ্বৈপায়ন, ভগবান নারদ ও অন্যান্য বহু দেবর্ষি, মহর্ষি ও রাজর্ষিবৃন্দ তথায় আগমন করলেন। রাজা করজোড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার এই প্রায়োপবেশন উচিত হয়েছে তো ? সকলে একবাক্যে সমর্থন জানালে রাজা বল্লেন, আমার কি সৌভাগ্য, আমার ন্যায় দুরাচারী রাজকুলে ব্রাহ্মণগণ হয়তো পাদপ্রক্ষালন করতেন না। কিন্তু আজ তাঁরা স্বয়ং উপস্থিত হয়ে আমার কার্য অনুমোদন করলেন। রাজবংশে আমার ন্যায় ধন্য কে আছে ? আমি পাপী ও সংসার আসক্ত ছিলাম। শ্রীহরি কৃপা করে ব্রহ্মশাপ প্রদান করে আমায় অনুগ্রহ করেছেন। আমার চিত্ত সকল বিষয় ত্যাগ করে হরিপাদপদ্মে আসক্ত হয়েছে। আপনারা আশীর্বাদ করুন যেন অনন্তপুরুষে আসক্তি আরও বর্দ্ধিত হয়

এবং জন্মে জন্মে হরিচরণসেবী সজ্জনগণের সঙ্গ লাভ হয় (পুনশ্চ ভূয়াদ্ভগবত্যনন্তে রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ তদাশ্রয়েষু)। মহর্ষিগণ পরীক্ষিতের সৎকার্যের জন্য বহু প্রশংসা করলেন এবং পুণ্যশ্লোক শ্রীহরির মনোহর গুণগান করতে লাগলেন। অপর মুনিগণকে উদ্দেশ্য করে বল্লেন,— যে পর্যন্ত এই ভগবদ্ভক্ত রাজা নিজ কলেবর ত্যাগ করে মায়ার অতীত শোকদুঃখহীন শ্রেষ্ঠ গতি লাভ না করেন, আসুন ততদিন আমরা এখানে অবস্থান করি।

মহর্ষিগণের পরম উদার অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করে রাজা সকলের উদ্দেশে প্রণত হলেন এবং বল্লেন, আমাকে অনুগ্রহ করার জন্যই আপনারা চতুর্দিক হতে সমাগত হয়েছেন, অপরের উপকারই আপনাদের ঐহিক-পারত্রিক সকল কর্মের উদ্দেশ্য (পরানুগ্রহমাত্মশীলম্)। স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনারা কোন কার্যেই প্রবৃত্ত হন না। এখন কৃপা করে বলুন, আসন্ন মৃত্যুদশাগ্রস্ত ব্যক্তির কোন কার্য পবিত্র-বোধে করনীয়। তখন মুনিগণের মধ্যে কেহ যজ্ঞ, কেহ তপস্যা, কেহ যোগ বা দানকেই পবিত্র কর্ম বলে উল্লেখ করলেন। এইরূপ মতভেদ হওয়ায় তাঁদের মধ্যে বিতর্ক দেখা দিল। সেই সময় ব্যাসনন্দন শুকদেব যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর অবধূতের বেশ, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ হেতু সদাই পরিতুষ্ট, বালকগণ উন্মত্ত ভেবে তাঁকে ঘিরে কৌতুক করছিল, তাঁর বয়স ষোড়শ বৎসর মাত্র, অতি কোমল গাত্র, উন্নত নাসা, চক্ষু দুটি বিশাল ও মনোহর, সুন্দর বদন, অতি শোভন ভ্রূদ্বয়, বিস্তৃত বক্ষ, দিগম্বর বেশ, আজানুলম্বিত বাহু, শ্যামবর্ণ, হাস্যময় বদন এবং তাঁর শরীর হতে শ্রীহরির ন্যায় দিব্য আভা বিকীর্ণ হচ্ছিল। ঋষিগণ তাঁর অসাধারণ লক্ষণ দর্শন করে আসন হতে উঠে সম্বর্দ্ধনা করলেন। রাজা পরীক্ষিৎ মস্তক ভূলুণ্ঠিত করে তাঁকে পূজা করলেন। গ্রহ-নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র যেমন শোভা পান, সেই ব্রহ্মর্ষি-রাজর্ষি-দেবর্ষিগণের সভায় মহাতেজস্বী পরমভাগবত শুকদেব সেইরূপ শোভা প্রাপ্ত হলেন।

তখন রাজা পরীক্ষিৎ তাঁর নিকটে আগমন করে মস্তক ভূমিতে লুণ্ঠিত করে বারংবার প্রণত হয়ে করযোড়ে বল্লেন, আমরা নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয় হয়েও সাধুগণের উপাস্য হয়েছি, কারণ আপনি কৃপা করে অতিথি হয়ে আমাদের পবিত্র করলেন (কৃপয়াতিথিরূপেণ ভবদ্ভিস্তীর্থকাঃ কৃতাঃ)। আপনাদের স্মরণেই গৃহাশ্রম পবিত্র হয়, দর্শন-পাদস্পর্শের কথা আর কি বলব? মহাযোগী আপনি, আপনার দর্শনেই মহাপাতক বিদূরিত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের অত্যন্ত ভালবাসতেন, তাঁদের প্রীতি ও প্রসন্নতার জন্যই কি তিনি আপনাকে এখানে প্রেরণ করেছেন। আপনার দর্শন অতি দুর্লভ। শুনেছি গাভী দোহনে যেটুকু সময়ের প্রয়োজন তার বেশী সময় আপনি গৃহীদের আশ্রমে অবস্থান করেন না। নতুবা আমার এই দুঃসময়ে আপনার দর্শন কেন পেলাম? আপনি যোগীগণেরও গুরু (যোগীনাং পরমং গুরুম্)। আপনি কৃপা করে বলুন মুমূর্ষু ও মুমুক্ষু ব্যক্তির কিসে সিদ্ধি লাভ হবে, শ্রবণ-জপ-স্মরণ-ভজন কি করা উচিত, কোন্ কর্ম তাদের কর্তব্য এবং কি অকর্তব্য? এখনই আমার এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন, আমি ঘোর সংশয়ে আছি। রাজা পরীক্ষিতের এই মধুর সম্ভাষণ ও প্রশ্নে প্রীত হয়ে সর্বধর্মজ্ঞ ভগবান ব্যাসনন্দন শুকদেব উত্তর দিতে আরম্ভ করলেন (প্রত্যভাষত ধর্মজ্ঞো ভগবান্ বাদরায়নিঃ)।

শ্রীশুকদেব বল্লেন, যিনি অভয় চাহেন ও মুক্তিকামনা করেন, তাঁর সর্বাত্ম ভগবান শ্রীহরির স্মরণ, নাম শ্রবণ ও কীর্তন একান্ত কর্তব্য। অন্তকালে নারায়ণ-চরণ স্মরণই পরম ও চরম লাভ। যে মুনিগণ নির্গুণ ব্রহ্ম ভাবনা করেন, তাঁরাও হরিগুণ শ্রবণ ও কীর্তনে আনন্দলাভ করেন (নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ)। যদিও নির্গুণ ব্রহ্মে আমি মগ্ন, তথাপি সমস্ত বেদের সহিত তুলনীয় শ্রীভাগবত পুরাণ-বর্ণিত শ্রীভগবানের পুণ্যচরিত-লীলায় আকৃষ্ট রয়েছি। আপনি বিষ্ণুভক্ত, আপনার নিকট পবিত্র ভাগবত পুরাণ কীর্তন করব। উহা শ্রবণে সকল বিষয় ও ইন্দ্রিয়সুখ বাসনা তিরোহিত

হবে এবং শ্রীহরিতে নৈষ্ঠিকী রতি ও চিত্ত সর্বতোভাবে সমাহিত হবে। সম্পূর্ণ ভাগবত শ্রবণান্তে সপ্তম দিবসে রাজা পরীক্ষিৎ ভগবান শুকদেবের অনুমতি নিয়ে বাক্য-সংযম ও কামনামুক্ত করতঃ শ্রীকৃষ্ণে সমাহিত চিত্ত হলেন। তখন কামরূপী তক্ষক ব্রাহ্মণের বেশ ধরে সেখানে গিয়ে রাজাকে দংশন করায় সর্বলোকের সমক্ষে ভস্মভূত রাজার দেহ ভস্মীভূত হল। তখন দেবগণের দুন্দুভি, গন্ধর্ব-অপ্সরাগণের গীত উত্থিত হল এবং সাধুবাদ প্রদান করতে করতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করলেন (ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি বিবুধাঃ সাধুবাদিনঃ)।

(৪)

রাজর্ষি পরীক্ষিত মৃত্যুর হাত ধরে মৃত্যুহীন লোকে চলে গেছেন। তার কিছুকাল পরের সংবাদ। বিষ্ণুক্ষেত্র নৈমিষারণ্যের চির নিস্তব্ধতা দূরে যাচ্ছে ঊষার আগমনে অন্ধকার রাত্রির মত। সারা ভারতের ঋষিগণ ক্রমে সমবেত হচ্ছেন এখানে। বহু বর্ষ ব্যাপী এক যজ্ঞের অনুষ্ঠানের তরে। কলির পাপদৃষ্টিতে এবং দ্রুত প্রভাব বিস্তারে শঙ্কিত হয়েছেন তাঁরা। ভারতের ধর্ম বুঝি লুপ্ত হয়ে যাবে। ষাট হাজার ঋষির সমাবেশ, অভূতপূর্ব প্রয়াস। একদিবস ঊষাকালে রোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবা সুতমুনির শুভাগমন হল সেখানে। তিনি রাজা পরীক্ষিতের সভায় ভাগবদ্বক্তা শ্রীশুকদেবের শিষ্য। ঋষিগণের পক্ষ হতে তাঁকে অভিনন্দন জানান হল। যজ্ঞের ব্যবস্থাপক শৌণকাদি ঋষিগণ তাঁকে বল্লেন,—হে নিষ্পাপ (অনঘ)! তুমি সমগ্র পুরাণ-ইতিহাস-ধর্মশাস্ত্র আয়ত্ত করেছ, সকল শাস্ত্রের সার স্বরূপ মানবের একান্ত কল্যাণকর যা নির্দ্ধারণ করেছ, তা আমাদের নিকট প্রকাশ কর, কারণ কলিতে প্রায় সকলেই অল্পায়ু, অলস, অল্পবুদ্ধি, পুণ্যহীন ও রোগাদি দ্বারা উপদ্রুত। ভগবান লীলাচ্ছলে ব্রহ্মাদি দেহ ধারণ করে যে যে লীলা করেছিলেন এবং স্বেচ্ছায় যে যে অবতার গ্রহণ করেছিলেন, তাও আমাদের নিকট কীর্তন কর। বিশেষতঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব-দেবকীর ঘরে জন্ম নিয়ে যে সকল অলৌকিক

কর্ম বলরাম সহ সম্পাদন করেছিলেন যা প্রতি পদে অমৃত মধুর, যার শ্রবণে অজ্ঞান বিদূরিত হয়, তা সবিস্তারে বল যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু পদে পদে)। আর একটি প্রশ্ন, ধর্মের একমাত্র রক্ষক ব্রহ্মণ্যদেব যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এতদিন প্রকটলীলায় ছিলেন, তিনি নিজধামে গমন করেছেন, ধর্ম এক্ষণে কার শরণাপন্ন, তার উত্তর দাও।

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্মবর্ম্মণি
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্মঃ কং শরণং গতঃ॥ (ভাঃ ১।১।২৩)

ঋষিগণের বাক্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে আনন্দচিত্তে সূত বল্লেন—আপনারা অতি উত্তম প্রশ্ন করেছেন। শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তিই জীবের পরমধর্ম। ভগবৎ কথায় রতি না হলে কেবল ক্রিয়ানুষ্ঠান বৃথা শ্রম মাত্র। তাঁর নামগুণের শ্রবণ কীর্তন, তাঁর পূজা ধ্যান, তাঁর ভক্তের সেবা ও ভক্তিগ্রন্থ পাঠ হতে শ্রীভগবানে নৈষ্ঠিকী ভক্তি জন্মে, তখন হৃদয়বিহারী শ্রীহরি তার সকল পাপ হরণ করেন। তখন তিনি অনুভব করেন—

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখা
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ।
বাসুদেব পরং জ্ঞানং বাসুদেবপরন্তপঃ
বাসুদেবপর ধর্মো বাসুদেব পরা গতিঃ॥ (ভাঃ ১।১।২৮)

—অর্থাৎ সকল বেদের তাৎপর্য বাসুদেব, যজ্ঞের চরম গতি বাসুদেব, যোগের পরম প্রতিপাদ্য বাসুদেব, সকল কর্মের অন্তিম-লভ্য বাসুদেব। জ্ঞানের সিদ্ধি বাসুদেব, তপস্যার লক্ষ্য বাসুদেব। জ্ঞানের সিদ্ধি অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বিষয় একমাত্র বাসুদেব, বাসুদেব ভিন্ন অন্য গতি নেই।

শ্রীগীতায় ভগবান বলেছেন,—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ৭/১৯

—অর্থাৎ জ্ঞানী ভক্ত বহু জন্মের পর "বাসুদেবই সমস্ত" এইরূপ জ্ঞানলাভ করে আমাকেই প্রাপ্ত হন, এইরূপ মহাত্মা অতি দুর্লভ।

মহামতি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস স্ত্রী শূদ্রজাতি নিন্দিত দ্বিজগণের যাদের বেদ শ্রবণে অধিকার নেই, যজ্ঞাদি মঙ্গলকর্মের অনধিকারী, তাদের কল্যাণের নিমিত্ত কৃপা করে মহাভারত প্রণয়ন করেন।

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্ ॥ ভাঃ ১।৪।২৫)

তাহাতেও মহর্ষির চিত্তে সন্তোষলাভ না হওয়ায় তখন মনে হয়েছিল—

কিন্বা ভাগবতা ধর্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ।
প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ ॥ ভাঃ ১/৪/৩

—অথবা যে ধর্ম শ্রীভগবানের প্রিয় ও পরমহংসপ্রীতিপ্রদ সেই ভাগবতধর্ম বিশেষরূপে মহাভারতে কীর্তন করা হয় নি, তজ্জন্যই কি চিত্তের এই অবসাদ? তখন গুরুরূপী দেবর্ষি নারদ এসে জানালেন বাসুদেবের নির্মল চরিতকথা (যশো ভগবতোঽমলম্) বিশেষভাবে বর্ণনা করনি, এজন্য এই অপ্রসন্নতা।

তখন নারদ কৃপায় ব্যাসদেব সূত্ররূপে ভাগবত পেয়ে দুশ্চর সাধনার পর ভাগবত প্রাপ্ত হলেন। উহা জগতে প্রচারের জন্য পরমহংসগণেরও বরণীয় বিদেহমুক্ত পুত্র শ্রীশুকদেবকে প্রাপ্ত হলেন এবং ভাগবত শিক্ষা করালেন। তিনি মৃত্যু-কবলিত মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন কালে সকল বিদ্বৎপরিষদের সামনে ভাগবত কীর্তন করেন। অজ্ঞানতা বশতঃ নিয়ত সংসার চক্রে পরিভ্রমণশীল সংসারী জীবের প্রতি করুণাবশতঃ সমস্ত বেদের সারভূত অধ্যাত্মদীপ-স্বরূপ অসাধারণ প্রভাবশালী এই অদ্বিতীয় পুরাণ-রহস্য শ্রীশুকদেব প্রকাশ করেন (স্বানুভাবমখিল শ্রুতিসারমেকমধ্যাত্মদীপমতিতি তীর্ষমাং)।

শ্রীসূত বল্লেন,—বেদকল্প বৃক্ষের সুপরিণত গলিত ফল এই

শ্রীভাগবত শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখনিসৃত বলে অমৃত রসমধুর (নিগমকল্পতরোগলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতসংযুতম্)। সেই শ্রীশুকদেব আমার গুরুদেব, তাঁর শ্রীচরণে শরণাগত হয়ে, শ্রীকৃষ্ণ-দেবী সরস্বতী-ব্যাসদেবকে প্রণাম করে, সেই ভাগবত পুরাণ কথা আপনাদের প্রশ্নের উত্তরে আমি কীর্তন করব। মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট যখন গুরুদেব শ্রীভাগবত কীর্তন করেন, সেই সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম, সাতদিন নিরন্তর আমিও শুনেছি, শুধু তাই নয় শ্রীগুরু করুণায় সকল কথাই আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এতদিন ধর্ম শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে ছিলেন, তাঁর স্বধাম গমনে অভিন্ন-স্বরূপ শ্রীভাগবত, ধর্মের আশ্রয় হলেন। কলির ঘোর অন্ধকারে অজ্ঞানান্ধ জীবকে ভাগবত সূর্য আলো দেখাবেন।

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥

—কলির আরম্ভ হওয়া মাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম ও জ্ঞানাদির সহিত নিজ ধামে গমন করলে সংসার তিমিরাবৃত ও জীবগণের জ্ঞানদৃষ্টি লুপ্তপ্রায় হয়, সেজন্য এই পুরাণ সূর্য ভাগবত উদিত হয়েছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পরিকর পরমভাগবত শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীভাগবতের সম্বন্ধে বলেছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ পরিবর্তিত"। লীলা-পুরুষোত্তমরূপে যিনি ছিলেন তিনিই রূপান্তরিত হয়েছেন ভাগবতরূপে। ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ অবয়বরূপে কল্পিত ও পূজিত হন একই মন্ত্রে। ভাগবতের প্রথম দুই স্কন্ধ শ্রীভগবানের দুই চরণ, তৃতীয় ও চতুর্থ দুই উরুদেশ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দুই পার্শ্বদেশ, সপ্তম ও অষ্টম দুই বাহু, নবম হৃদয়, দশম শ্রীমুখের মঞ্জু হাস্য, একাদশ কপাল ও দ্বাদশ মস্তক।

ভাগবতের ভাষণ মহারাজ পরীক্ষিৎকে উদ্দেশ্য করে। সেখানে যাঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁরা প্রধানতঃ দেবর্ষি, রাজর্ষি, মহর্ষি, মুনি-ঋষিগণ। সংসারী লোকও হয়তো আছেন। পরমহংসগণের

আদরনীয় এই শাস্ত্র-গ্রন্থ বিশেষ করে সংসারী ব্যক্তিদের জন্য। সংসারী কারা? যারা স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়ে পরিবারবদ্ধ জীবন যাপন করেছেন, সংসার-জীবন যাদের ভাল লাগছে না, অথচ ছেড়েও যেতে পারছেন না। যারা একান্তভাবে চাইছেন মুক্তি, সংসার ছেড়ে যেতে, অথচ নানা কারণে পারছেন না ছেড়ে যেতে, তারাই সংসারী। তাদের প্রতি করুণা করেই ভাগবত ধর্ম প্রকাশিত হয়েছেন (সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং)।

সব শাস্ত্রই ঈশ্বর-সান্নিধ্যলাভের উপায়ের কথা বলেছেন—ধ্যান-ধারণা, যাগ-যজ্ঞ, দান পরিচর্যা, মন নিয়ম সমাধি ইত্যাদি। শাস্ত্রে অধিকারী-অনধিকারী প্রশ্নও রয়েছে। ব্রাহ্মণ না হলে যাগ-যজ্ঞ করা যাবে না, যম-নিয়মাদিতে সিদ্ধ না হলে কুম্ভক-সমাধি হবে না। অধিকারভেদ কিছু অযৌক্তিক নয়। যে মাধ্যমিক পাশ করেনি, সে কলেজে পড়ার যোগ্য হয় না। ভাগবত ধর্মে শ্রীভগবান লাভের অযোগ্য কেউ নেই, সকলেই যোগ্য। কারণ শ্রীভগবানকে লাভ করার জন্য যে সম্পদ দরকার, তা সকলের আছে। কি সেই বস্তু যা সকলের আছে এবং যদ্দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়? তা হচ্ছে, হৃদয়ের শুদ্ধ ভালবাসা। সেই শুদ্ধ ভালবাসা শ্রীভগবানে অর্পিত হলেই ভগবানকে পাওয়া যায়। ইহাই ভাগবতের মূল বার্তা। ভালবাসা হয়তো আছে সকলের, কিন্তু তা শুদ্ধ নয়, তা স্বার্থময় ভালবাসা, বিষয়ের প্রতি ভালবাসা, ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্য বাসনা। ভালবাসার মধ্য হতে এই সকল মালিন্য দূর করতে হবে, তবেই শুদ্ধ ভালবাসার উদয় হবে। শ্রীভগবানের নাম-রূপ-লীলা শ্রবণ ও কীর্তন, ভক্তের প্রতি ভগবানের করুণার কথা শ্রবণাদির ফলে চিত্ত-দর্পণের মালিন্য দূরে যায়। 'মার্জন হয় ভজন সাধুসঙ্গ অনুক্ষণ' —শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়। চিত্ত দর্পণের মার্জন চাই, তার উপায় শ্রবণ-কীর্তন। তবেই শুদ্ধ প্রেমের উদয় হবে। এই প্রেম সকল জীবের মধ্যেই আছে, ঢাকা পড়ে আছে, ঢাকাটা সরালেই তা প্রকাশিত হবে।

নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥

ভাগবতের আর এক বৈশিষ্ট্য, উহাতে অধ্যাত্ম দর্শনের সার এবং উপন্যাস সাহিত্যের একত্র সমাবেশ। বেদান্ত দর্শনের সূত্রসকলের ব্যাখ্যা ব্যাসদেব নিজেই করেছেন, উহাই ভাগবত। সমস্ত বেদের সার উহাতে সন্নিবিষ্ট। মানব-মানবীর প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা উপন্যাসের উপজীব্য। ভাগবতে শ্রীভগবান ও তাঁর পরিকরগণ মানব-মানবীরূপে ধরায় এসেছেন, তাঁদের প্রগাঢ় প্রেম-ভালবাসা ভাগবতের প্রধান বিষয়বস্তু। এজন্য, ভাগবত অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শনশাস্ত্র হয়েও রস-সাহিত্যের সামগ্রী হয়েছে। দার্শনিক ও সাহিত্য-রসের রসিকের মধ্যে প্রবল বিরোধ। সাহিত্য-রসিক দর্শন-শাস্ত্র পড়েন না, তাতে কোন রস পান না। আবার দার্শনিক মনে করেন—সাহিত্য হাল্কা রসের পরিবেশক, দার্শনিক বা চিন্তাশীল ব্যক্তির পড়বার যোগ্য নয়। ভাগবত উভয়কে ডেকেছেন (রসিকা ভুবি ভাবুকা) উভয়ের রুচি অনুসারে দর্শনের তত্ত্ব ও সাহিত্যের রস আস্বাদনের জন্য। জগতে এহেন গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নেই।

ভাগবত ভগবানের অপার করুণার সংবাদ দিয়েছেন। তাঁর ব্রহ্মস্বরূপে করুণার কোন প্রকাশ নেই। এজন্য ব্রহ্ম নিরপেক্ষ, নির্বিকার, কারও উপর নির্ভরশীল নন। কিন্তু ভগবানের করুণা করার পাত্র চাই, ভক্ত চাই, ভক্তের উপর নির্ভরশীল তিনি। ভক্ত না থাকলে ভগবান থাকতে পারেন না। পিতা পুত্রের জন্ম দেয়, পুত্রও পিতার জন্ম দেয় , যতক্ষণ সন্তান না হচ্ছে তিনি পিতা হতে পারছেন না। ভগবান যে কত করুণাময়, সেই সংবাদ দিতেই এসেছেন ভাগবত। করুণা করতে করতে তিনি মানুষ হয়ে যান, আপনার-আমার ঘরের মানুষ। মানুষ হয়ে মানুষের সঙ্গে প্রেম-প্রীতির লীলা করেন, মানুষের ভালবাসা গ্রহণ করেন। অনন্ত বিশ্বের ঈশ্বর, তাঁর এই মানবলীলা সবচেয়ে মধুর। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত উল্লেখ করেছেন—"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা।" এই মধুরতমের

সংবাদ দিয়েছেন ভাগবত। গীতাদি শাস্ত্র বিরাট এক সংবাদ পরিবেশন করেছেন, মানুষ সাধনা করতে করতে ভগবদ্-তুল্য হয়ে যান (মদ্ভাবমাগতা) জীব ব্রহ্মই হয়ে যায় (জীব ব্রহ্মৈব নাপর—শঙ্করাচার্য)। বিরাট এই সংবাদে আমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়, বিস্ময় জাগে। ভাগবতের সংবাদ আমাদের খুব প্রাণস্পর্শী, খুব মধুর, আমাদের আকর্ষণ করে। সাধনা করে ব্রহ্ম হব, এটা যেন ভয়ানক দূরের বিষয়। কিন্তু ভাগবতের ভগবান যেন আমার ঘরের ঠাকুর, আমার প্রাণপ্রিয়। এজন্য, ভাগবত ধর্মের আবেদন সার্বজনীন। মন-প্রাণ দিয়ে একটু ভালবাসলেই যে তিনি আমার কাছে আসেন, আমার আপন জন হয়ে যান। আমার ভালবাসা তাঁরও যে চাই, তাই তিনি এসেছিলেন, আসেন। "তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছ নীচে ; আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে"—রবীন্দ্রনাথ।

সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এসেছিলেন, ভাগবতের সঙ্গে জীবের পরিচয় করাতে (দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত), কলির জীবকে শ্রীভাগতের শুদ্ধাভক্তি, ব্রজের প্রেমভক্তি দান করতে। পাত্র বা অপাত্র, যোগ্য বা অযোগ্য বিচার না করে দান করেছেন।

পাত্রাপাত্র বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাহা পায় তাহা করে প্রেমদান॥ চৈঃ চঃ

মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদগণের কৃপায় শ্রীভাগবতের রসমাধুর্যে অবগাহনের পথ সুগম হয়েছে। সপার্ষদ ও সপরিকর শ্রীনিতাই গৌর প্রভু জগদ্বন্ধুর শরণাগত হয়ে শ্রীভাগবত আস্বাদনে আমরা প্রয়াসী হব।

(৫)

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রচারিত প্রেমভক্তি-ধর্মের মেরুদণ্ড হচ্ছে শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধ। ইহার ভাব, ভাষা, তাত্ত্বিক উপস্থাপনা ও

কবিত্ব সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। দশম স্কন্ধে নব্বইটি (৯০) অধ্যায়। প্রথম চল্লিশ অধ্যায় শ্রীকৃষ্ণের গোকুল ও বৃন্দাবন লীলা। পরবর্তী দশ অধ্যায় মথুরা লীলা। অবশিষ্ট চল্লিশ অধ্যায় দ্বারকা ও কুরুক্ষেত্র লীলা। বাংলার বহু কাব্য এবং প্রায় সমগ্র বৈষ্ণব ও ভক্তি সাহিত্য দশম স্কন্ধের বিষয়বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত বা উহার দ্বারা প্রভাবিত। ভারতের প্রায় সর্বত্র, বিশেষতঃ বাংলার ভক্তির ধারা এই দশম স্কন্ধের খাতে প্রবহমানা। শ্রীরামপ্রসাদ ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রভৃতির শক্তি সাধনায়, পরমাপ্রকৃতি শ্রীমায়ের সাধনায় উহার প্রভাব লক্ষণীয়। সেখানেও ভক্তির ধারা অব্যাহত। অহৈতুকী বা শুদ্ধা ভক্তি যেখানে বিশিষ্টতা লাভ করেছে, বুঝতে হবে সেখানেই ভাগবত ধর্মের প্রভাব পড়েছে।

শ্রীভাগবত-গ্রন্থ বিশাল, উহা আয়ত্ত করা গীতা-গ্রন্থের মত সহজসাধ্য নয়। হিন্দুমাত্রেরই ঘরে গীতা পাওয়া যায়, প্রকরণ ধরে উহার আলোচনা করাও সহজ। ভাগবত তদ্রূপ নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে দশটি তত্ত্ব বা বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে তার উল্লেখ আছে,—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥ ভাঃ ২।১০।১

—শ্রীভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানু কথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়, এই দশটি তত্ত্বের আলোচনা আছে।

(১) সর্গ—অর্থাৎ উপাদান সৃষ্টি বা তত্ত্বসৃষ্টি। পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম), পঞ্চ তন্মাত্রা (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ), পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, কর্ণ ও জিহ্বা), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), মন, অহঙ্কার ও মহৎ। মূল প্রকৃতির সঙ্গে এই সমগ্র তত্ত্বের (সাংখ্যদর্শনের চতুর্বিংশতি তত্ত্বের) আবির্ভাবের নাম সর্গ।

(২) বিসর্গ—ব্রহ্মা হতে চরাচর জীব সমূহের দেহ সংগঠনের নাম বিসর্গ।

(৩) স্থান—সৃষ্ট জীবগণের নিজ নিজ মর্যাদা (ধর্ম) পালন দ্বারা যে উৎকর্ষ তার নাম স্থিতি বা স্থান।

(৪) পোষণ—নিজ নিজ মর্যাদায় অবস্থিত ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ, ইহাই পোষণ।

(৫) উতি—সকাম কর্মের দ্বারা বাসনা জন্মে, এই বাসনার দ্বারা পুনঃপুনঃ ত্রিলোকীতে জীবের গতাগতি ঘটে, ইহার নাম উতি।

(৬) মন্বন্তর—ভগবানের অনুগৃহীত মন্বান্তরাধিপতি সাধুগণের ধর্মই মন্বন্তর।

(৭) ঈশানুকথা—ভগবান শ্রীহরির অবতার ও চরিত্র এবং তাঁর অনুবর্তী মহাপুরুষগণের যে সৎকথা তার নাম ঈশানুকথা। ঐ কথা নানা আখ্যান মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে।

(৮) নিরোধ—ভগবান শ্রীহরি যোগনিদ্রা অবলম্বন করলে জীবের আত্মার উপাধির সঙ্গে যে লয়, তার নাম নিরোধ।

(৯) মুক্তি—অন্যথারূপ অর্থাৎ অবিদ্যা কর্তৃক আরোপিত কর্তৃত্বাদি অভিনিবেশ পরিত্যাগ পূর্বক স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি।

(১০) আশ্রয়—এই আশ্রয়তত্ত্বই শ্রীভগবান। তৎসম্বন্ধে বলা হয়েছে,—

"দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহলক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মনঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥

—এই আশ্রয়তত্ত্বের বিশুদ্ধি অর্থাৎ প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্টরূপে বোঝাবার জন্য মহাত্মাগণ কোন কোন স্থলে শ্রুতির দ্বারা, কোন স্থানে সাক্ষাৎ কিম্বা তাৎপর্য দ্বারা অপর নয়টির লক্ষণ কীর্তন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা সমস্তই সেই দশমতত্ত্ব বা আশ্রয়তত্ত্বের সঙ্গে মানবের যথার্থ পরিচয় করাবার জন্য। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থকার বলেছেন,—

আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।
এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ॥

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্বাশ্রম।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে কয়॥

সকল সম্প্রদায়-স্বীকৃত ভাগবতের আচার্য শ্রীধর স্বামিপাদ। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁকে অত্যন্ত মর্য্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি ভাগবতের টীকায় লিখেছেন—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রব বিগ্রহং।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরংধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥

—শ্রীকৃষ্ণনামক দশম বস্তুই দশম স্কন্ধের লক্ষ্য, তিনি আশ্রিত বর্গের আশ্রয়-বিগ্রহরূপী পরমধাম ও জগতের নিবাসস্থান স্বরূপ।

মুক্তির পরবর্তী সংবাদ এই আশ্রয়তত্ত্ব। ভক্তগণের আরাধ্য, প্রাণের সম্পদ। অনন্ত বিশ্বের চরম আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ। এই ঘরে আপনি বাস করেন, ঘর আপনার আশ্রয়, এই ঘর মাটিকে অর্থাৎ পৃথিবীকে আশ্রয় করে স্থিত আছে, পৃথিবী আছে সৌরজগতের কেন্দ্রস্থ সূর্যকে আশ্রয়কে করে, সূর্য বৃহত্তর সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রের অপর সূর্যকে আশ্রয় করে নিজ কক্ষে পরিভ্রমণ করছে। এইভাবে আশ্রয়ের আশ্রয়, চরমতম বা মূল আশ্রয় যদি খোঁজ করা যায়, তবে সর্বাশ্রয়রূপে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়। তিনিই আমাদের পরমাশ্রয়, একমাত্র আশ্রয়, সকল সময়ের আশ্রয় জেনে আশ্রয় নিতে হবে, তাঁর শরণাগত হতে হবে। তবেই আমাদের রক্ষা, আমাদের মঙ্গল।

নবম স্কন্ধে শ্রীশুকদেব যদু বংশের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে শেষ দুই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের লীলা সূত্ররূপে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করে নীরব হলেন। কৃষ্ণলীলা সবিস্তারে শ্রবণে ইচ্ছুক রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নীরবতায় উদ্বিগ্ন হলেন! তিনি শুকদেবকে বল্লেন, আপনি চন্দ্র ও সূর্যবংশের নরপতিগণের বিস্ময়কর চরিত্র কথা সম্যকরূপে বলেছেন। পরম ধর্মশীল যদুর বংশাবলীও বিস্তৃতভাবে বলেছেন। এখন যদুবংশে অংশ বলরাম সহ অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক জন্ম-কর্মের কথা সবিস্তারে বলুন। নতুন কিছু

শোনার আগে যেন হিসাব দিচ্ছেন কি শুনেছেন, যাতে বক্তার মনে হয় শ্রোতা অখণ্ড মনোযোগে শুনেছে এবং তিনি আরও বলার জন্য উৎসাহিত হন। যিনি সর্বভূতে আছেন, তিনি কি করে একটি মানবরূপ পরিগ্রহ করলেন? তিনি অবতার হয়েও কি করে অসীম, পূর্ণ থাকেন? শ্রুতি বলেছেন,—"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"—পূর্ণ হতে পূর্ণ গেলে পূর্ণই থাকে। অনন্তের তত্ত্ব, তার হিসাব-নিকাশ, বিচার-বিবেচনা সবই আলাদা, আমাদের সাধারণ জ্ঞানগম্যের অতীত।

শ্রীশুকদেব কৃষ্ণকথা আরম্ভ করছেন না দেখে পরীক্ষিৎ ভাবলেন, শ্রোতাদের অমনোযোগিতা বক্তার নিরুৎসাহের কারণ। সকলদিকে একবার দৃক্পাত করে পরীক্ষিৎ বল্লেন,—এখানে মুক্ত, মুমুক্ষু ও বদ্ধ তিন প্রকারের লোক আছেন। সনকাদি মুক্তপুরুষ যাদের বিষয়তৃষ্ণা একেবারে নেই, তারা পরমানন্দে ভরপুর হয়ে শুনছেন, সমস্ত সত্তা দিয়ে ভাগবতীয় কথা আস্বাদন করছেন! এই কথা তাঁদের জীবাতু। সাধক যারা, মুমুক্ষু যাঁরা, যাঁরা জানেন নিজেদের বদ্ধাবস্থা, তাঁরা মুক্তির ইচ্ছায়, ভবরোগের ঔষধ জেনে আকুল আগ্রহে শুনছেন কৃষ্ণকথা। বদ্ধ যারা, তাদের মুক্তির জন্য কোন ভাবনা জাগে নি, জানে না নিজেরা বদ্ধ এই মায়াময় সংসারে, তারাও শুনছে অত্যন্ত আগ্রহে কারণ আপনার শ্রীমুখের ভাগবতীয় কথা শ্রবণ-ইন্দ্রিয় ও মনের অত্যন্ত মুগ্ধকর। উত্তমশ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা একমাত্র তারাই শুনতে আগ্রহী নয়, যারা আত্মঘাতী ও পশুঘাতী নিষ্ঠুর-হৃদয় ব্যাধ। দুর্লভ মনুষ্য জীবন লাভ করে হরিকথারূপ ভেলার সাহায্যে ভবসমুদ্র পার হয় না যারা, তারাই আত্মঘাতী।

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনাপশুঘ্নাৎ॥

—আত্মঘাতী ও পশুঘাতী ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি বিষয়বাসনাশূন্য মুক্তগণ কর্তৃক কীর্তিত, ভবরোগের ঔষধস্বরূপ এবং কর্ণ ও মনের

আনন্দদায়ক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন হতে বিরত হতে পারেন? (ভাঃ ১০/১/৪)

এই আত্মঘাতী ও পশুঘাতী হয়তো শুনছে না আপনার কথা। এরা লোক গণনায় ধর্তব্য নয়। এদের জন্য কৃষ্ণ-কথা বন্ধ করবেন না। এরা চতুর্থ শ্রেণী, এদের ইহলোকে বা পরলোকে প্রাপ্য কিছু নেই। যার এখানে (ইহলোকে) আছে, সেখানে (পরলোক) নেই—সে রাজপুত্র; যার এখানে নেই সেখানে আছে—সে ঋষিবালক। যার এখানেও আছে সেখানেও আছে—তিনি ভক্ত।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমি বহু প্রকার সম্বন্ধে যুক্ত। আমার পিতামহ অর্জুনের তিনি প্রিয় সখা ও বন্ধু এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে অত্যন্ত প্রীতি হেতু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রথের সারথ্য করেছেন। পিতামহী বসুদেব কন্যা সুভদ্রার তিনি ভাই। আমার পিতামহ পাণ্ডবগণ যাঁকে কর্ণধার রূপে লাভ করে দেবজয়ী ভীষ্মাদিরূপ তিমিঙ্গিলপূর্ণ কৌরব সৈন্যসাগর গোষ্পদের ন্যায় অনায়াসে পার হয়েছিলেন, যিনি শরণাগতা আমার মাতার কুক্ষিমধ্যে প্রবেশ করে আমাকে অশ্বত্থমার ব্রহ্মাস্ত্র হ'তে রক্ষা করেছিলেন, সেই আমার বংশের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের কথা সংক্ষেপ করবেন না, সবিস্তারে বলুন।

শ্রীভগবানের দুটি স্বরূপ—একটি পুরুষোত্তম বা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অপরটি যম, মৃত্যু বা মহাকালরূপ। অর্জুনকে এই মহাকাল স্বরূপও দেখিয়েছিলেন বিশ্বরূপদর্শন কালে। অর্জুন ভয়ার্ত হয়ে জানতে চান, কে আপনি? ভগবান বল্লেন, "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ"—লোকক্ষয়কারী ভীষণ কাল আমি, এই লোকসকলকে সংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। ভক্তগণের নিকট তিনি আসেন অমৃতস্বরূপে। আর বহির্মুখ জগতের লোক, শ্রীভগবানে বিমুখ বা শত্রুভাবাপন্ন যারা, যেমন কংস, রাবণ, শিশুপালাদির নিকট আসেন মৃত্যুরূপে, মহাকালরূপে। যারা ভোগাসক্ত, ঈশ্বর মানে না, গর্বে অন্ধ, নিজেকে ভাবে সর্বেসর্বা, তারাও তাঁর দেখা পাবে কালস্বরূপ মৃত্যুর সময়ে। যাঁরা অন্তর্মুখী, শ্রীভগবানে

অনুরক্ত, তাঁদের নিকট আসেন লীলাবিগ্রহধারী হয়ে, অমৃত বিতরণ করেন তাঁদের। শ্রীকৃষ্ণ জন্মালেন কংসের আলয়ে, কিন্তু কংস সেদিন জানলো না, জানলো মৃত্যুর সময়ে যেদিন সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে এসে দর্শন দিলেন। তবে তিনি "হতারিগতিদায়ক", শত্রুকেও কৃপা করেন, উত্তম গতি দান করেন। জন্মাবার পর চলে গেলেন ব্রজে, তাঁর প্রতি একান্ত অনুরক্ত যাঁরা, তাঁদের নিকট। যোগমায়ার আশ্রয়ে মনুষ্যবিগ্রহধারী, পরমকৃপালু সেই গূঢ় কপট মানুষের কথা বিস্তার করে বলুন।

আপনি বলেছেন,—সংকর্ষণ বলরাম মাতা রোহিণীর পুত্র, আবার তিনি দেবকীর গর্ভজাত, ইহা কিরূপে সম্ভব? শ্রীকৃষ্ণ জন্মের পর কেন ব্রজে গমন করেছিলেন, জ্ঞাতিগণের সঙ্গে কোথায় অবস্থান করেছিলেন, কি কারণে মাতুল কংসকে বধ করেন, কতকাল দ্বারকায় বাস করেছিলেন, কতগুলি পরিণীতা স্ত্রী তাঁর ছিল, ইত্যাদি জিজ্ঞাসিত ও অজিজ্ঞাসিত সবই বিশদভাবে বর্ণনা করুন।

আপনি সর্বজ্ঞ, শ্রীভগবানের কথা বলার যোগ্যতা আপনার অসীম। এখানে সকল শ্রোতা আপনার প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল। সময়ে শ্রোতা থাকলেও সুবক্তা পাওয়া যায় না, অথবা সুবক্তা থাকলেও আগ্রহী শ্রোতার অভাব থাকে। এখানে কিন্তু উভয়ের, সুবক্তা ও আগ্রহী শ্রোতার একত্র সমাবেশ। সুতরাং আপনি কৃষ্ণকথায় বিরত হবেন না। আর যদি মনে করেন, গত কয়েকাদন কোন খাদ্য-পানীয় গ্রহণ না করায় আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর, সেজন্য ধর্মকথা শ্রবণে অক্ষম, তাহলে বলি—

নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্॥

—আপনার মুখপদ্মনিঃসৃত হরিকথামৃত নিরন্তর পান করায় অতি দুঃসহ ক্ষুধা-তৃষ্ণা আমাকে বিন্দুমাত্র পীড়া দিচ্ছে না, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকথা শোনান। আমার আয়ুষ্কাল অতি সামান্য। নীতিশাস্ত্র বলেন,—ধর্ম আচরণ কালে মনে করতে হবে যম (মৃত্যু) এসে

চুলের মুঠি ধরেছে, একথা আমার ক্ষেত্রে সর্বৈর সত্য। সুতরাং কৃষ্ণকথা বলতে বিরত হবেন না।

শ্রীসূতমুনি নৈমিষারণ্যের ঋষিগণকে সম্বোধন করে বল্লেন, রাজা পরীক্ষিতের কৃষ্ণকথা শ্রবণে প্রবল আগ্রহ দেখে ভাগবত-শিরোমণি আমার গুরু শ্রীশুকদেব কলিকলুষনাশন শ্রীকৃষ্ণকথা বলতে শুরু করলেন। শ্রীগোবিন্দের কথামৃত শ্রবণে কলির কল্মষ, সর্ববিধ পাপের বীজ যা স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণরূপে বর্তমান সবই নাশপ্রাপ্ত হয়। স্থূল পাপ যা সকলে জানতে পারে, সূক্ষ্ম যা নিজে জানে অন্যে জানে না, কারণরূপে যে পাপ থাকে তা নিজেও জানে না। মনের অনেক তলায় থাকে, মনে হয় নেই, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে উহা প্রকাশ হয়ে সাধককে পথভ্রষ্ট করে। সুস্থ দেহ অনেক রোগ এড়াতে সক্ষম হয়, অসুস্থ দেহ যেমন তা পারে না, সেইরূপ আত্মিক সম্পদে যদি কেহ বলীয়ান হয়, তবে পাপ বীজ দূর করতে সমর্থ হয়। আমাদের সকলকে আত্মিক সম্পদে সম্পন্ন করতে হবে, সেজন্য আত্মার খাদ্য দিতে হবে। চিৎবস্তু আত্মার খাদ্য। শ্রীগোবিন্দ চিন্ময় বিগ্রহ, তিনি ও তাঁর কথা অভিন্ন, তাঁর কথা জড় নয়, মরণধর্মী নয়, তাহা অমৃত (তব কথা অমৃতম্)। ভাগবত শাস্ত্রের কথা, গোবিন্দের কথা নিরন্তর শুনতে হবে। কলির জীবের জন্য ভাগবত সূর্য উদিত হয়েছেন, সেই আলো হৃদয়ে সদা জ্বেলে রাখুন, অজ্ঞান-তমঃপাপ আসতে পারবে না।

কৃষ্ণকথায় রাজার গাঢ় অনুরাগ দেখে শ্রীশুকদেব তাঁকে অভিনন্দিত ও রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করে বল্লেন;—আপনার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মেছে (সম্যগ্ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম), কারণ কৃষ্ণকথায় আপনার সুদৃঢ় ও নির্মল প্রীতি জন্মেছে। অস্থির মতি যার, সে সাধনপথে চলবার অযোগ্য। কৃষ্ণ কথা যে শুনতে চায়, সে ধন্য, ঈশ্বর তাঁর হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন (সদ্যো হৃদ্যবরুদ্ধতেঽত্র)। বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা স্নানকারীর উর্দ্ধতন ও অধস্তন তিন পুরুষকে পবিত্র করেন, সেইরূপ কৃষ্ণকথা—বক্তা, প্রশ্নকর্তা ও শ্রোতাকে পবিত্র

করেন, উদ্ধার করেন। গঙ্গা স্নানকারীর নিকটে আসেন না, কিন্তু হরিকথা আপনার গৃহেই হতে পারে, হরিভক্তের আগমনে, উহা গঙ্গা হতেও কল্যাণায়।

পরীক্ষিৎ বহুভাবে কৃষ্ণকথা বলার প্রার্থনা জানিয়েছেন। কৃষ্ণকথা জাগতিক কথা বা বৈষয়িক কথার মত নয়। কৃষ্ণকথা বলতে বল্লেই বলা যায় না। 'বৃষ্টি হও' বল্লে বৃষ্টি হয় না, আকাশে মেঘের উদয় হওয়া চাই। হৃদয়াকাশে কৃষ্ণকৃপারূপ মেঘ যদি উদয় হয়, তবেই কৃষ্ণ-কথা বলা যেতে পারে। কোনও যুদ্ধের সময় 'যুদ্ধের কথার' উদয় হয়, সবার মুখে মুখে যুদ্ধ কথা, সবাই যুদ্ধের কথা শুনতে ও বলতে ভালবাসে। লোক যুদ্ধের কথায় সবাই মেতে ওঠে। শ্রীশুকদেব ও তাঁর শিষ্য সূতমুনির কৃপায় কৃষ্ণকথার উদয় হয়েছিল। সকলেই কৃষ্ণ-কথা শোনার জন্য ঝুঁকে পড়েছিল। কৃষ্ণের কৃপা ছাড়া কৃষ্ণকথার উদয় সম্ভবে না।

কৃষ্ণকথা শোনার একান্ত আগ্রহ কৃষ্ণ-কৃপা ছাড়া হয় না। শৌর্য বীর্যে যিনি বড়, তিনি রাজা; জ্ঞান-তপস্যায় যিনি বড়, তিনি ঋষি বা মহর্ষি; এই দু'য়ে যিনি বড়, তিনি রাজর্ষি, যেমন রাজর্ষি জনক। সবচেয়ে সুন্দর শাসন ব্যবস্থা (Administration) কিসে হবে, সে সম্বন্ধে গ্রীক-দার্শনিক প্লেটো (plato) বলেছেন, যদি Philosopher-king হয় অর্থাৎ রাজর্ষি হয়। রাজর্ষিগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি হচ্ছেন 'রাজর্ষিসত্তম'। কৃষ্ণকথায় যাঁর রতি সেই রাজাকে রাজর্ষি বল্লে কম বলা হয়। তাই পরীক্ষিৎকে শ্রীশুকদেব বলেছেন রাজর্ষিসত্তম।

শ্রীভাগবতের মাধুর্য পরমভক্তের মুখনিঃসৃত বলে, শ্রীশুকদেব বলেছেন বলে (শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্)। শ্রীভগবানের মুখোক্ত গীতা এত মধুর নয়। যদিও ভাগবতের ভিত্তি গীতা। যেখানে তত্ত্বের প্রসঙ্গ, যেমন আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব প্রভৃতি, সেখানে ভগবানই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বক্তা। কিন্তু সেখানে ভগবানের সৌন্দর্য-মাধুর্য-লীলার প্রসঙ্গ, সেখানে পরমভক্তই শ্রেষ্ঠ বক্তা। ভক্তই আস্বাদন করেন

ভগবানের সৌন্দর্য-মাধুর্যাদি, সুতরাং তিনিই ঠিক জানেন বা বলতে পারেন ভগবান কত সুন্দর, কত মধুর। উপরন্তু, নিজ মুখে নিজের রূপ-গুণের কথা বলাটা অসুন্দর, রস-শাস্ত্র মতে দোষ দুষ্ট। সেজন্য ভগবানের রূপ-গুণের সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা ভক্ত, ভগবান নন। ভগবানের সৌন্দর্য-মাধুর্য ভক্তই আস্বাদন করেন, তিনিই তা ভাল জানেন। সেজন্য, গীতায় ভগবান যা বলেন নি বা বলতে পারেন নি, ভাগবতে পরমভক্তের মুখে তা প্রকাশিত হয়ে মাধুর্যময় হয়েছে। ভগবান নিজের বেণুগীত নিজে মুগ্ধ হয়ে শোনেন, কিন্তু ঐ বেণুগীত যখন ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রবণ করেন, তখন তাঁরা সবই ভুলে যান, নিজেদের দেহ-গেহ, এমনকি পতিসেবা, সন্তানকে দুধ খাওয়ানো, দেহের প্রসাধন সবই ফেলে উন্মত্তের ন্যায় ছুটে যান বেণুগীত লক্ষ্য করে। তাঁদের মত তীব্র আকুলতা বা বেণু-মাধুর্যের আস্বাদন ভগবানের হয় না। ঐ মাধুর্যের আস্বাদক ও বক্তা ভক্তই। ব্রহ্মভূত শুকদেব শ্রীকৃষ্ণলীলায় আকৃষ্টচিত্ত হয়ে ভাগবত শাস্ত্রকথা কেবল আয়ত্ত করেননি, ঐ মাধুর্যে ডুবে ভাগবতময় হয়ে গেছেন, তাই তিনি শ্রেষ্ঠতম বক্তা।

শ্রীশুকদেব বলেছেন, রাজার কৃষ্ণকথায় প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মেছে, তাঁর বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে স্থির হয়েছে। অব্যবস্থিত চিত্ত যাদের, বুদ্ধি যাদের নিশ্চয়াত্মিকা নয়, জীবনের লক্ষ্য তাদের স্থির নয়, তাদের পরিণতি নাবিক-বিহীন নৌকার মত। জীবনাদর্শ যদি স্থির হয়, তখন কাজ একটাই, অন্য সবকিছু ত্যাগ করে ঐ আদর্শের যা অনুকূল, তাই করা। ভাগবত ধর্ম ও শ্রীভগবানকে ভালবাসাই যদি জীবনের লক্ষ্য বলে দৃঢ় নিশ্চয় হয়, তবেই যথার্থ কল্যাণ। শ্রীকৃষ্ণ-কথা ছাড়া অপর কিছু ভাল লাগবে না। শ্রীকৃষ্ণ-কথা শোনা বন্ধ হলে রাজা পরীক্ষিতের ন্যায় চিত্তে উদ্বেগ জাগবে। আমাদের নিষ্ঠা নেই, কৃষ্ণ কথা কিছুক্ষণ শোনার পর মনে হয় কখন শেষ হবে, তারপর বিষয় ব্যাপার জাগতিক কথায় মত্ত হই। ঠাকুর পরমহংসদেব পানা-পুকুরের জলের সঙ্গে তুলনা করেছেন আমাদের অবস্থার। হাত

নিয়ে কচুরি-পানা সরালেন, পুকুরের জল দেখা গেল, সঙ্গে সঙ্গে পানা এসে আবার জল ঢেকে দিল। ঈশ্বরের কথা শুনে ক্ষণকালের জন্য বিষয় ভাবনা গেল, তারপর বিষয় ভাবনা পুনরায় আচ্ছন্ন করে ফেলল আমাদের। বুদ্ধি স্থির হলে ভগবৎ বিষয়ে মনপ্রাণ লেগে থাকবে, ছাড়তে চাইবে না। ভক্ত প্রহ্লাদ প্রার্থনা করেছিলেন, ভোগাসক্তের ভোগের প্রতি যেমন তীব্র লালসা, ঐরূপ ভালবাসা যেন ঈশ্বরে হয়। আজ পরীক্ষিতের মধ্যে জেগেছে সেই তীব্র অনুরাগ। যার যে বিষয়ে অনুরাগ, সেই বিষয়ের কথা শুনতেই চায়, অন্য কিছু ভাল লাগে না।

খুব প্রিয়ত্বের অনুভূতি হচ্ছে রতি। কৃষ্ণকথায় রতি হয়েছে অর্থাৎ সমস্ত সত্তাটা ঐ কথামৃতে ন্যস্ত হয়েছে, জড়িয়ে গেছে। চিত্তের বহুমুখী বৃত্তি আর নেই, সব একমুখী হয়েছে। তাই পরীক্ষিৎ সহ সকল শ্রোতার ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিদ্রা কোন কিছুর অনুভূতি নেই। কৃষ্ণকথায় একান্ত রতি বলে একভাবে একাসনে বসে আছেন দিবারাত্র কয়েকদিন।

কথা বলতে বলতে শুকদেবের কথা যেন হারিয়ে গিছল। মেঘ যদি না থাকে বর্ষণ হতে পারে না। রাজা পরীক্ষিতের কৃষ্ণকথায় তীব্র লালসা রূপ বাতাস কৃষ্ণকথায় নিয়ে এল। শ্রীশুকদেব আবার কথা শুরু করলেন। কোন আসরে যারা শ্রোতা থাকেন, তাদের চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক হংস শ্রোতা—যাঁদের শ্রবণের লালসা এত যে বক্তার মধ্যে উদ্দীপনা আনয়ন করে। শুক শ্রোতা—যাঁরা শ্রবণ করে, পুনরায় কীর্তন করতে পারেন। ভেক শ্রোতা—যারা শ্রবণ করে মাত্র, কিছুই গ্রহণ করে না। তারা শুনে কিছু আনন্দ পায় না। সর্পশ্রোতা—যারা বক্তার বক্তব্যের ভুল-ত্রুটি কেবল খোঁজ করে, নিন্দে করার জন্য, নিন্দে করাই তাদের স্বভাব। এখানে রাজা পরীক্ষিতের সভায় প্রথম দুই শ্রেণীর শ্রোতাই হয়তো কেবল আছেন।

শ্রীশুকদেব কৃষ্ণকথার মূর্তবিগ্রহ। তিনি ভাগবতের মাধুর্য যা

পেয়েছেন, নিজ সত্তায় পূর্ণরূপে তা গ্রহণ করেছেন। নিজ অনুভূতির আনন্দই ব্যক্ত হচ্ছে তাঁর কথার মধ্যে। কৃষ্ণকথা যেন দিব্য মাধুর্য প্রকট কয়ে শ্রীশুকদেবে মূর্তিলাভ করেছে। তাঁর কৃপা আমাদের অধন্য জীবনে প্রতিফলিত হয়ে কৃষ্ণকথার উদ্দীপনা সঞ্চার করুক।

(৬)

ভূমির্দৃপ্ত নৃপব্যাজদৈর্ত্যা নীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥ ভাঃ ১০/১/১৭

—অহঙ্কারী রাজার ভপধারী দৈত্যদের অসংখ্য অসুরপ্রকৃতির সেনাদের ভারে (উৎপীড়নে) আক্রান্তা পৃথিবী লোকপিতামহ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন।

দ্বাপর যুগের শেষপর্ব। মথুরা মণ্ডলে রাজত্ব করছেন অমিত বলশালী ভোজবংশীয় রাজা কংস। অন্যান্য স্থানে কালযবন, নরকাসুর, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি অহঙ্কারী, অসুরপ্রকৃতির উৎপীড়ক রাজাদের উদ্ভব ঘটেছে। এদের 'নৃপব্যাজ' বলে উল্লেখ করেছেন শ্রীশুকদেব। 'নৃপ' অর্থাৎ যিনি নরগণকে পালন করেন, রাজা। 'নৃপব্যাজ' হচ্ছে তারা, যারা নামে রাজা, নরগণকে পালন করার পরিবর্তে উৎপীড়ন করেন। এই সকল উৎপীড়ক রাজাদের অসংখ্য অসুরপ্রকৃতির সৈন্যদের প্রবল অত্যাচারে সর্বত্র ত্রাস, সন্তাপ ও দুঃখের গুরুভার নেমে এসেছে মানুষের জীবনে। অত্যাচার, অবিচার, নৃশংসতা এমনই ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে যে, পৃথিবী যাঁর এক নাম সর্বংসহা, সব কিছুই সহ্য করেন, তাঁর পক্ষে দুঃসহ হয়েছে। শীর্ণ শরীর, অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে তিনি গাভীর রূপ ধারণ করে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নিকটে এসে আপন দুঃখ জানালেন। সৃষ্টি-কর্তার সামর্থ্য কোথায় তাঁর সৃষ্টিকে দুঃখ হতে রক্ষা করার ? সব শুনে, তিনি দেবতাগণের সঙ্গে পরামর্শ করে, দেবাদিদেব মহাদেবকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরোদশায়ী ভগবান নারায়ণের নিকট গমন করলেন। পৃথিবীও আছেন সঙ্গে।

ক্ষীর সমুদ্র নারায়ণের থাকার স্থান। সেই ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ গুণাবতার বিষ্ণু, ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী। পালনকর্তা আত্মান্তর্যামী তিনি, জীবের সবচেয়ে নিকটের জন, ইনি তৃতীয় পুরুষ। দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদকশায়ী, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, বহু মূর্তি হয়ে সেই সকল ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। গর্ভোদকশায়ী হতে গুণাবতার প্রকট হয়েছেন এবং জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মার উৎপত্তি। প্রথম পুরুষ কারণাব্ধিশায়ী, সকল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী, সব জগতের স্বামী, সর্বকারণের কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ।

ক্ষীরোদশায়ী ভগবান আমাদের অন্তরে আছেন। তিনি আমাদের গুরু, আচার্য (আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ)। অন্তরে থেকে তিনি সতত নির্দেশ দেন, বাণী পাঠান, আমরা শুনি না। তাই বাইরের গুরুর প্রয়োজন। ব্রহ্মাদি দেবগণ ঋক্ বেদের পুরুষসূক্ত উচ্চারণ করে ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের স্তব করলেন অত্যন্ত প্রশান্ত ও সমাহিত চিত্তে। কিছুক্ষণ পরে আকাশে একটি শব্দ শোনা গেল। ব্রহ্মা ধ্যানযোগে তার মর্ম অবগত হয়ে দেবগণকে বল্লেন, আমার নিকট পরমপুরুষের বাণীর মর্ম শোন এবং তদনুসারে কার্যে ব্রতী হও। পরমপুরুষ জানালেন, পৃথিবীর দুঃখজনিত সন্তাপ তিনি পূর্বেই জেনেছেন। তিনি স্বয়ং আসছেন বসুদেবের গৃহে। তিনি পৃথিবীর ভার হরণের জন্য যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে লীলা করবেন। সহস্রবদন স্বয়ংপ্রকাশ ভগবান অনন্তদেব শ্রীহরির প্রিয়কার্য করার জন্য অগ্রে অবতীর্ণ হবেন। হে দেবগণ! তোমরা সকলে মথুরা মণ্ডলে জন্ম নিয়ে তাঁর কার্যের সহায়তা কর। দেবরমণীগণ তাঁর প্রীতি সম্পাদনের জন্য আবির্ভূত হোন। অতঃপর ব্রহ্মাদি দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করলেন। পূর্ণ ভগবান যখন আসেন, তখন অন্যান্য অবতারগণ তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে আসেন। অবতারের যুগানুযায়ী নিদিষ্ট কাজ করার জন্য।

পূর্ণ ভগবান অবতার যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥ (চৈঃ চঃ)

পূর্ণ ভগবান সহসা আসেন না, আসেন ব্রহ্মার একদিনে একবার। তা ছাড়া আসেন, যদি বিশেষ প্রয়োজন ঘটে। ভূভারহরণ কাজ অংশের দ্বারা সম্পন্ন হয়, সেজন্য স্বয়ং আসবেন কেন? বিশেষ হেতু আছে, অন্তরঙ্গ কিছু প্রয়োজন আছে, যা চিন্তা-ভাবনা-যুক্তিতে পাওয়া যায় না। পূর্ণানন্দময় তিনি, আসেন নিজ-আনন্দ আস্বাদন তরে।

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সেই লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥ (চৈঃ চঃ)

সংকর্ষণ স্বয়ং ভগবানের কার্যকরী শক্তি, এবার আগেই আসবেন। রাম অবতারে ভাই লক্ষণ হয়ে এসেছিলেন। লীলার শেষকালে লক্ষণ ভাবলেন, জ্যেষ্ঠ না হয়ে আসার জন্য রামচন্দ্র অনেক কষ্ট পেলেন, যেমন চোদ্দ বছর বনবাস, সীতা হরণ, শক্তিশেল গ্রহণ, রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ ইত্যাদি। আমি বড় হয়ে এলে, স্বয়ং ভগবান ভাই হয়ে আসতেন, আমি কখনই তাঁকে বনে আনতাম না। তাই স্থির করলেন ভবিষ্যতে ছোট হয়ে আসবেন না (ভক্তি ক্ষেদাদচ্যুতাগ্রজঃ)। শ্রীহরির প্রিয় কার্য করার জন্য বড় হয়ে আসবেন (হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া)। বড় হলে স্বাধীনতা থাকবে, সেবা করার সুবিধা। জ্যেষ্ঠের মধ্যে বাৎসল্য থাকবে, বয়সের বেশী পার্থক্য না থাকায় সখ্য থাকে, তাছাড়া আছে দাস্যরস। মা যশোদা ছাড়া সব রসের ভক্তের মধ্যেই দাস্য আছে। তিন রসে সেবা করে সুখদানে সমর্থ হবেন দাদা হয়ে জন্মিলে।

আর আসবেন বিষ্ণুমায়া, যোগমায়াশক্তি। তিনি লীলাশক্তি স্বয়ং ভগবানের লীলার ব্যবস্থাকারিণী। যোগমায়া ও মায়া একই শক্তির দুই প্রকাশ। যোগমায়া ও মায়া উভয়েই আবরণ করেন, ঢাকেন। যোগমায়া ভগবানের ভগবত্ব ঢাকেন। আবার ভক্তদের ভুলান, ভগবান বলে জানতে দেন না। অথচ ভক্তদের ভগবানের প্রতি উন্মুখ করেন, সেজন্য যোগমায়ার এক নাম উন্মুখমোহিনী। ভক্ত ও ভগবান উভয়কে ভুলিয়ে ভগবানের মানবলীলায় মাধুর্যদান করেন, উভয়ের প্রেম-প্রীতির লীলা সম্ভব হয়। মায়ার এক নাম

বিমুখমোহিনী। ভগবানের প্রতি বিমুখ করে সংসারে ডুবিয়ে অশেষ দুঃখ দেন। যোগমায়া ভক্ত ও ভগবান উভয়কে পরমানন্দ সাগরে ডুবান ভগবত্তা ভুলিয়ে।

আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দুহাঁর রূপ গুণে দুহাঁর নিত্য হরে মন॥

রামচন্দ্র অবতারে যোগমায়া অমূর্ত থেকে ক্রিয়াপরায়ণা। ভগবানের মর্তলীলা সবই যোগমায়ার আশ্রয়ে। যোগমায়া ভগবানকে ঢাকলেও সম্পূর্ণ ঢাকেন না, লীলার মাধুর্যের জন্য যেটুকু প্রয়োজন। রামচন্দ্র সীতাকে হারিয়ে বনে বনে খুঁজছেন, আকুল হয়ে কাঁদছেন। ভগবান শঙ্কর ও শঙ্করী আকাশ পথে যেতে তা দেখতে পেলেন। শঙ্কর আকাশ থেকেই রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। শঙ্করী জিজ্ঞাসা করলেন, দশরথের পুত্রকে প্রণাম করলেন কেন? শঙ্কর বল্লেন, উনি পূর্ণ ব্রহ্ম। শঙ্করী বল্লেন, পূর্ণ ব্রহ্ম হলে স্ত্রী হারিয়ে অমন করে কাঁদবেন কেন? শঙ্কর বল্লেন, ভগবানের লীলা তাঁর ইচ্ছাধীন। শঙ্করী তা বিশ্বাস করলেন না, বল্লেন— আমি পরীক্ষা কবব। সীতার রূপ ধরে যে পথে রামচন্দ্র আসছেন সেখানে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভাবলেন, যদি রামচন্দ্র ব্রহ্ম হন, তবে তাঁর মায়া ভেদ করতে পারবেন, মানুষ হলে সীতা বলে ভুল করবেন। রামচন্দ্র যদিও সীতাকে হারিয়ে উন্মাদপ্রায়, তথাপি শঙ্করীকে দেখেই চিনতে ভুল হল না, জিজ্ঞাসা করলেন— আপনি একা কেন, শঙ্কর কোথায়। যোগমায়ায় আবরিত ভগবানকে চেনা সহজ নয়, তাঁর কৃপা সাপেক্ষ। তাঁর লীলা যোগমায়ার ব্যবস্থাপনায়, নির্দেশে। যেটুকু ঢাকলে বা যতটুকু ভোলালে লীলার সৌন্দর্য-মাধুর্য সম্পূর্ণ প্রকটিত হয়, যোগমায়া তাই করেন। যোগমায়ার অধীনে লীলা। যোগমায়া তাঁর নিজস্ব শক্তি, গীতায় 'আত্মমায়া' বলে উল্লেখ করেছেন। সেজন্য যোগমায়ার অধীনতায় শ্রীভগবানের স্বাধীনতায় বা স্বরাটত্বের কোন হানি হয় না। স্বয়ং পূর্ণ স্বরূপে তিনি বিরাজমান আছেন ও থাকেন।

(৭)

অতঃপর স্থূল জগতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন শ্রীশুকদেব। যদু বংশের কথা, এই বংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। রাজা শূরসেন যদু বংশে জন্মগ্রহণ করে, মথুরায় রাজধানী স্থাপন করে রাজত্ব করেন। যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদু পরম ধার্মিক ও কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। শ্বশুরের অভিশাপে যযাতি যৌবনে জরাগ্রস্ত হন। পুত্রদের অনুরোধ করেন তার জরা-গ্রহণে, যাতে তিনি পুনরায় যৌবন ফিরে পান। যদু পিতার জরা-গ্রহণে সম্মত হলেন না। কারণ জরা নিলে কৃষ্ণ-সেবার বিঘ্ন হবে। পিতার অভিশাপ, তিনি জ্যেষ্ঠ হয়েও রাজা হতে পারবেন না, তিনি তাই মেনে নেন। শ্রীভগবান বিষ্ণুতে গাঢ় ভক্তির জন্য প্রহ্লাদও পিতার আজ্ঞা পালন করেন নি। জীবনের প্রধান লক্ষ্য ভগবদ্ ভজন। সেজন্য পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন দোষণীয় নয়।

যদুবংশের শূরসেনের বংশে উগ্রসেন। উগ্রসেনের পুত্র কংস। শূরবংশের বসুদেব দেবকের কনিষ্ঠ কন্যা দেবকীকে বিবাহ করে স্বগৃহে যাত্রা করেছেন। রাজপথে বিচিত্র শোভাযাত্রা চলেছে পথ আলো করে। শত শত সুবর্ণময় রথে পরিবৃত অত্যন্ত সুসজ্জিত বিশাল সুবর্ণময় রথে নববিবাহিত বসুদেব-দেবকী চলেছেন। কংস ভগ্নী দেবকীর প্রতি প্রীতিবশতঃ নিজেই রথ চালাচ্ছেন অশ্বের বল্গা ধারণ করে। কন্যাবৎসল দেবক সুবর্ণমালা শোভিত চারিশত হস্তী, পঞ্চদশ সহস্র অশ্ব, অষ্টাদশ শত রথ ও নানা অলঙ্কারে শোভিত দুইশত সুকুমারী দাসী যৌতুক-স্বরূপ প্রদান করেছেন। তারাও শোভাযাত্রার অঙ্গ। গমনকালে শঙ্খ, তূর্য্য, মৃদঙ্গ ও দুন্দুভির মঙ্গলধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। এই বাদ্য-বাজনা, আনন্দ কোলাহলের মধ্য হতে একটি অশরীরী বাণী কংসের কর্ণগোচর হল। উহা এই—"রে মূর্খ! এত আনন্দ করে যাকে নিয়ে যাচ্ছিস, তাঁর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোর বধসাধন করবে।"

শ্রবণ মাত্র কংস যা করতে উদ্যত হল, তা মানুষের চিন্তার অতীত। প্রকাশ্য রাজপথে আনন্দপূর্ণ শোভাযাত্রার মধ্যে প্রিয়

ভগ্নী দেবকীকে বধ করার মানসে এক হস্তে চুলের মুঠি ধরল এবং অপর হস্তে খড়্গ উত্তোলন করল। কাজের দ্বারাই মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। কংসের স্বরূপটি নিপুণ চিত্রকরের মত একটি মাত্র শ্লোকে প্রকাশ করেছেন শুকদেব। পাপাত্মা, খল-প্রকৃতি, ভোজ-বংশের কলঙ্ক সে। অশরীরী বাণীর উৎস, সত্যতা, অষ্টমগর্ভ বহু দূরবর্তী, সে সব কিছুই ভাবল না। ভোগসর্বস্বতা, নিষ্ঠুরতা ও অস্থির-চিত্ততার প্রতিমূর্তি সে।

কংসের পাশে বসুদেবের চিত্রটি ঠিক যেন বিপরীত। ক্ষত্রিয় সন্তান বসুদেব, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শত্রুনিধন তাঁর অজানা নয়। এ ঘোর সংকটে তিনি যা করলেন, তাও মানুষের ভাবনার অতীত। স্থৈর্য ও প্রশান্তির প্রতিমূর্ত্তি তিনি, নাহলে শ্রীভগবান এই ক্ষেত্রে আসবেন কেন? নিন্দিত কর্মরত নির্লজ্জ কংসকে শান্ত কণ্ঠে বল্লেন, —আপনি ভোজবংশের গৌরব, বীরগণ আপনার গুণাবলীর প্রশংসা করেন। কাউকে হত্যা করা অন্যায়, যদি তিনি স্ত্রীলোক হন, সেই স্ত্রীলোক যদি নিজের প্রিয় ভগ্নী হন, যদি তাঁর বিবাহ উৎসবের দিন তাঁকে হত্যা করা হয় প্রকাশ্য রাজপথের উপর, তার থেকে গুরুতর অন্যায় কি হতে পারে? আপনার মত গৌরবান্বিত বংশের সন্তানের এই জঘন্য কর্ম সম্ভব না।

বসুদেব কংসকে প্রশংসা করে যে কথা বল্লেন, তার উদ্দেশ্য কংসকে তোষামোদ করা নয়। খুব নিন্দিত বা গর্হিত কাজে প্রবৃত্ত ব্যক্তি বংশের মর্যাদার কথা মনে করে ঐ কার্য থেকে বিরত হতে পারে। দোষগুণ সকলের মধ্যেই আছে। খুব খারাপ কাজে কাউকে জড়িত দেখলে, তার মধ্যে যে কিছু ভাল গুণ আছে, তা আমাদেরই মনেই আসে না। মহৎ যারা, তারা গুণের দিকেই নজর করেন। তাঁদের অকপট বাক্যে অন্যায় কাজে উদ্যত ব্যক্তির চিত্তও ফিরে যেতে পারে। দোষী ব্যক্তির মধ্যে গুণ দর্শন সহজ নয়, উহা তার মহত্বের পরিচায়ক। বসুদেবের চরিত্রের মহত্ব সকলের, কংসের নিকটও সুবিদিত।

কংসের চিত্তবৃত্তি ও নিন্দনীয় কর্মের পিছনে যে যুক্তি, তা বসুদেব ভালই জানেন। কংসের যুক্তি, এই সংসারে জন্মেছি ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের জন্য। ভোগের বাধক বা বিঘ্নকারী তা সে যেই হোক, তাকে ক্ষমা করব না, তাকে অচিরেই বিনাশ করে ভোগের পথ নিষ্কণ্টক করব।

তাঁর কথায় ভগ্নী-বধের সংকল্প থেকে কংস বিরত হল না দেখে বসুদেব পুনরায় বল্লেন,—আপনি বাঁচতে চান, সেজন্য এই গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু বীর মৃত্যুকে ভয় করে না। দেহের বিনাশ সকলেরই অবধারিত, ধ্রুব সত্য। যা অবশ্যম্ভাবী, তার ভয়ে ভীত হওয়া বীরের কাজ নয়। আজ হোক বা শতবর্ষ পরে হোক মৃত্যু আপনার হবেই, কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। দেহধারীর জন্মের সাথেই মৃত্যু জন্মেছে। সুতরাং মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে প্রিয় ভগ্নীর বিনাশ সাধন আপনার পক্ষে শ্লাঘনীয় নয়।

বাঁচার ইচ্ছা সকলের মধ্যেই আছে। অমরত্ব লাভের ইচ্ছা প্রত্যেকের সত্তার স্বাভাবিক বৃত্তি। আপনি যে বাঁচতে চান, তা কিছুমাত্র দোষের নয়। কিন্তু বাঁচার জন্য যে উপায় স্থির করেছেন, তা যথার্থ পথ নয়, ঐ পথে বাঁচতে পারবেন না। অমরত্ব লাভের পথ আলাদা। তার সন্ধান পেলে, তাতে স্থির হলে, অমরত্ব লাভ অবশ্যই হবে। বেদ বলেছেন,—সকলের মধ্যে একটা অন্তর-ইচ্ছা আছে অমৃতত্বের জন্য। "অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়"—অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও। অমৃতের ঐশ্বর্য যিনি পেয়েছেন, তিনি জানেন, উহা হতে অধিক কিছু নেই (যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং অর্থাৎ যা লাভ করলে অন্য কোন লাভ অধিক মনে হয় না—গীতা), উহা আমাদের জীবনের সকল অভাবের মূলচ্ছেদ করতে সমর্থ। উপনিষদ বলেছেন—"আত্মানং বিদ্ধি", আত্মাকে জানুন, তবেই সুখ-দুঃখময় সংসারের পারে চলে যাবেন। আত্মা আমাদের মৃত্যুহীন। যিনি

আত্মাকে জেনেছেন, আত্মতত্বে স্থিত হয়েছেন, তিনিই অমৃতত্ব লাভ করেন। জন্ম-মৃত্যুর পারে চলে যান তিনি। তা না হওয়া পর্যন্ত বারবার জন্মাতে হবে ও মরতে হবে। বাঁচার আর কোন পথ নেই—"নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

অমৃতত্ব লাভ না হওয়া পর্যন্ত কর্মফলের চক্র হতে অব্যাহতি নেই। জীব দেহান্তর প্রাপ্ত হয় আপন কর্মানুসারে। কর্মই নিয়ন্ত্রণ করে পরবর্তী জন্ম। সারা জীবনের কর্মানুসারে যে ভাবনা প্রবল হয়ে দেখা দেয় মৃত্যুকালে, তদনুযায়ী জীব জন্ম গ্রহণ করে। "করম বিপাকে গতায়তি পুনঃ পুনঃ"—বিদ্যাপতি।

মানুষ মনোরথের দ্বারা চালিত হয়ে পূর্বদৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়ে আবিষ্ট হয়ে তদ্‌ভাবে ভাবিত হয়ে পূর্বদেহ বিস্মৃত হয় ও দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। অবিবেকী জীব সেই সেই দেহে "আমি" ও "আমার" অভিমান বশতঃ মনের সহিত জন্ম নেয় এবং দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি হেতু মোহগ্রস্ত হয়ে সংসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে। দেহধারী জীব নিজের মঙ্গল অভিলাষী হলে, কারও প্রতি দ্রোহ আচরণ করবেন না। কারণ ঐ কর্মের ফল তাকে অবশ্যই পেতে হবে।

মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে, তখন তা সে সত্য বলেই মনে করে। যখন জাগ্রত হয়, তখনই সে বুঝতে পারে স্বপ্ন কিছুমাত্র সত্য নয়। যতক্ষণ অজ্ঞানতা থাকে, আত্মতত্বের উপলব্ধি না ঘটে, ততক্ষণ এই দেহ ও দেহ-ইন্দ্রিয়ের বোধ সত্য বলে মনে হয়। দেহ-ইন্দ্রিয়ের সুখের জন্য মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে, না করে এমন অন্যায় ও জঘন্য কাজ নেই। দেহাত্মবাদীকে বুঝান যায় না দেহ নশ্বর, দেহ কিছু নয় এবং আত্মাই সত্য, আত্মাই সব। আত্মা চলে গেলে দেহ নষ্ট হয়ে পচে পচে যায়। আত্মা নিত্য, শাশ্বত, একই স্বরূপে বিদ্যমান থাকে। দেহ ও আত্মা দুই পৃথক বস্তু, তাদের বিষয়ে জানবার উপায়ও পৃথক। জড়বাদীর মত হচ্ছে, আত্মা বলে কিছু নেই, দেহই সব। দেহ একটি যন্ত্র বিশেষ। মানুষের মধ্যে খুব সুন্দর ও উন্নত শ্বাস যন্ত্র, পরিপাক যন্ত্র আছে। যন্ত্র বিকল হলে মেরামত করা যায়,

পুনরায় সচল করা যায়। কিন্তু উহা ঠিক নয়। দেহ কেটে গেলে বা হাড় ভেঙ্গে গেলে, তা আপনা হতে জুড়ে যায়, নিজেকে নিজে মেরামত করে। এই ক্ষমতা কোন যন্ত্রের নেই। দেহ হতে যখন আত্মা চলে যায়, অর্থাৎ জীবের মৃত্যু ঘটে, তখন সেই যন্ত্র আর কিছুতে চালু করা যায় না। বিজ্ঞান আজ আত্মাকে অস্বীকার করে না। তবে স্বীকার করে না, কারণ স্বীকার করলে তা পরীক্ষাগারে প্রমাণের দায় আছে, সেটা বিজ্ঞানের আয়ত্তের বাইরে।

আত্মতত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সকল শাস্ত্র। সাধনার দ্বারাই উহার উপলব্ধি সম্ভব। হাজার হাজার সাধকের জীবনে উহা অনুভূত সত্য। অবিবেকী ব্যক্তি 'আত্মা' সম্বন্ধে অচেতন, দেহের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই দেহ 'আমি' বলি কি করে, কোন যুক্তিতে? আমার পাঁচ বছরের দেহ পঁচিশ বছরে নেই, পঁচিশ বছরের দেহ পঞ্চাশ বছরে নেই, পঞ্চাশ বছরের দেহ আশী বছরে থাকে না। দেহের মধ্যে যিনি সকল সময় অপরিবর্তনীয় থাকেন, তিনি যথার্থ "আমি" পদবাচ্য, তিনিই আত্মা। স্থির জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব খুব পরিষ্কার, দেখে সত্যই চন্দ্র বলে মনে হয়। যদি জলে চন্দ্রকে ধরতে যান, তবে নাড়া লেগে জল চঞ্চল হবে, চন্দ্র যাবে হারিয়ে, ধরা যাবে না। আত্মা আছে বলে দেহ সত্য মনে হচ্ছে। কিন্তু আত্মাকে যদি দেহে ধরতে যান, তাহলে আত্মাকে হারাবেন। চাঁদ জলে নেই, অমৃতত্ব দেহে নেই, দেহের সুখ ভোগে নেই। আত্মা স্বতন্ত্র। আত্মার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, আত্মাকে জানতে হবে, পেতে হবে নিজ সত্তার উপলব্ধির মধ্যে। অমৃতত্ব লাভের এই একমাত্র উপায়।

কর্মাধীন কর্মফল। অন্যের প্রতি দ্রোহ আচরণ করে অব্যাহতি নেই, নিজ জীবনে তা ফিরে আসবে। সংসারে খারাপ কাজ করেও ভাল আছে দেখা যায়, সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে, তা সঞ্চিত সুকৃতি বা ভাল কর্মের ফল। কর্মের ভোগ তিন প্রকারের—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রীয়মান। পূর্বকৃত কর্মের জন্য ভোগ সঞ্চিত আছে, উহা

সঞ্চিত। বর্তমানে যা ভোগ হচ্ছে তা প্রারব্ধ। বর্তমান কর্মে সৃষ্ট হচ্ছে যে ফলভোগ ভবিষ্যতের জন্য, তা ক্রীয়মান। চিন্তাও কর্ম, অপরের অমঙ্গল চিন্তার জন্যও ফলভোগ করতে হবে। এড়িয়ে যাবার উপায় নেই বল্লেই হয়। একটি মাত্র পথ আছে, অহঙ্কার ও কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হয়ে যদি কর্ম করা যায়, শ্রীভগবানে যদি পূর্ণ শরণাগতি হয়, তাহলে সঞ্চিত কর্মফল চলে যায়, প্রারব্ধও ক্ষীণ হয়।

বসুদেব কংসের মানবিক বোধ উদ্বোধিত করার জন্য এই প্রকার অবতারণা করলেন, কর্মফলের ভীতি প্রদর্শন করলেন। শেষে বল্লেন,— দেবকী আপনার কনিষ্ঠা ভগিনী, নিতান্ত বালিকা। তাঁর দিকে চেয়ে দেখুন, আপনার ভয়ে বিহ্বলা, কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অচেতন প্রায়। আপনি এই কল্যাণীকে বধ করবেন না। এই কাজে কিছুমাত্র পৌরুষ নেই। বংশের দয়াধর্ম আপনার মধ্যেও আছে। এই জঘন্য কর্ম কারও কাছে বলবার মত নয়। ইহা অত্যন্ত লজ্জাকর, নিন্দনীয় এবং আপনার যশের হানিকর।

কংস এতই ভোগাসক্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ যে বসুদেবের এ সকল কথাতেও ভগ্নীবধের সংকল্প ত্যাগ করতে পারল না। কংসের মনোগত অভিপ্রায় বুঝে, বসুদেব উপস্থিত দেবকীর মৃত্যু নিবারণের উপায় স্থির করলেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তির যে পর্যন্ত বুদ্ধি ও বল থাকে তিনি তা প্রয়োগ করে মৃত্যু নিবারণের চেষ্টা করবেন। তাতে যদি, মৃত্যু নিবারণ করা না যায়, তবে কোন অপরাধ সেই ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না। বসুদেব স্থির করলেন, মৃত্যুরূপী কংসকে পুত্র প্রদানের অঙ্গীকার করে দেবকীকে রক্ষা করবেন (প্রদায় মৃত্যবে পুত্রান্)। ভাবলেন,—যদি দেবকীর গর্ভে পুত্র হয় এবং কংস তখনও জীবিত থাকে, তখন যা ঘটবার ঘটবে। কংসের আগেই মৃত্যু হবে না তা কে বলতে পারে? দেবকীর কোন পুত্রসন্তান নাও হতে পারে। পরমেশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করতে কেই বা সমর্থ হয়? এমনও দেখা যায়, অগ্নিতে জলন্ত গৃহ নিকটবর্তী গৃহ না পুড়িয়ে

দূরবর্তী গৃহকে দগ্ধ করে। দেহীর দেহের সংযোগ ও বিয়োগ দৈবাধীন। মনে এইরূপ বিচার করে সদাপ্রসন্ন বসুদেব অন্তরে ব্যথিত হয়েও কংসের প্রশংসা করে বল্লেন,—হে সৌম্য! দৈববাণী যা শুনেছেন, তাতে এই দেবকী হতে নিশ্চয় আপনার কোন ভয়ের বা বিপদের সম্ভাবনা নেই। দেবকীর যে পুত্রগণ হতে আপনার ভয় উপস্থিত হয়েছে, সেই পুত্রদের আমি আপনার হস্তে প্রদান করব, আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

শুদ্ধ জ্ঞান ও সত্যের মূর্তি বসুদেব। কংস নিজে নির্দয়, নির্লজ্জ, নৃশংস ও মিথ্যাশ্রয়ী হলেও সে একান্তভাবে বিশ্বাস করে বসুদেব যা বলেছেন, তার অন্যথা হবে না। বসুদেবের বাক্যে আশ্বস্ত হয়ে সে তখন ভগ্নীবধ হতে নিবৃত্ত হল এবং খুব খুসী হল, ভগ্নীর প্রতি ভালবাসার কারণে। বসুদেব প্রীত হয়ে কংসের প্রশংসা করতঃ দেবকী সহ নিজগৃহে গমন করলেন।

শ্রীশুকদেব বর্ণনা করেছেন, যথাকালে সর্বদেবময়ী দেবকী দেবী প্রতি বৎসর একটি করে ছয়টি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। বসুদেব কংসকে পুত্রপ্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বসুদেবের এক নাম "আনক-দুন্দুভি", তাঁর জন্মকালে দেবগণ দুন্দুভি বাজিয়ে অভিনন্দিত করেন। কারণ তাঁকে অবলম্বন করেই স্বয়ং ভগবান এই ধরাধামে অবতীর্ণ হবেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য বসুদেব অন্তরে অত্যন্ত বেদনা নিয়ে সদ্যোজাত কীর্তিমান নামক পুত্রকে কংসের হস্তে অর্পণ করলেন। শুকদেব বলেছেন, সত্যসন্ধ ও জ্ঞানী যাঁরা, তাঁদের দুঃসহ বেদনা কিছু নেই। তাঁরা সত্যের জন্য সকল দুঃখই বরণ করে নেন। অপরপক্ষে নীচ কদর্য ব্যক্তির কোন দুষ্কর্মই অকরণীয় নেই।

কংস বসুদেবের সত্যনিষ্ঠায় খুসী হয়ে বল্লেন, এই পুত্রে প্রয়োজন নেই, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান আমার চাই। বসুদেব পুত্রকে নিয়ে এলেন। কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় মিথ্যাচারী কংসের বাক্যে কোন আস্থা স্থাপন করলেন না। এই সময় একদিন নারদ এলেন কংসের নিকটে এবং তাকে জানিয়ে গেলেন—নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসীগণ,

বসুদেব প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয়গণ, দেবকী প্রভৃতি যত্নকুল রমণীগণ, তাঁদের জ্ঞাতি-বন্ধু-সুহৃদ সকলেই দেবতা, জন্মান্তরে কংস মহাসুর কালনেমি ছিল এবং বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হয়েছিল। শ্রীবিষ্ণু শীঘ্রই পৃথিবীর ভারস্বরূপ দৈত্যগণকে বধের উদ্যোগ করছেন। শ্রীনারদ ঠাকুরের উদ্দেশ্য, কংসের অত্যাচার ভয়ানক প্রবল হোক, তাতে শ্রীভগবানের ধরায় আবির্ভাব ত্বরান্বিত হবে।

কংস যাদবগণকে দেবতা মনে করে এবং নিজ প্রাণনাশের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে বসুদেব-দেবকীকে কারাগারে বদ্ধ করলেন। তাঁদের সন্তান হওয়া মাত্র বধ করতে লাগলেন। পিতা উগ্রসেন তার কাজে আপত্তি করলে পিতাকেও বন্দী করলেন। যজ্ঞ দেবতাদের পুষ্ট করে, দেবতাদের জব্দ করার জন্য যজ্ঞ নিষিদ্ধ হল। যজ্ঞের জন্য প্রয়োজন ব্রাহ্মণ ও গব্য ঘৃত, এজন্য ব্রাহ্মণ, গাভী এবং বিষ্ণুভক্তদের নির্বিচারে নিধন করতে লাগলেন।

কংস শ্বশুর মগধরাজ জরাসন্ধের সহায়তা লাভ করে এবং প্রলম্ব, চানূর, বক, মুষ্টিক, অরিষ্ট, দ্বিবিধ, পূতনা প্রভৃতি পরাক্রান্ত অসুরগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে চারদিকে ভয়ঙ্কর অত্যাচার-উৎপীড়ন শুরু করলেন। যাদবগণ প্রাণভয়ে কুরু, পাঞ্চাল, কেকয়, বিদর্ভ, কোশল প্রভৃতি দেশে আশ্রয় নিলেন। স্বয়ং ভগবান আসবেন বসুদেবের ঘরে, এজন্য দুই-চারজন, যেমন অক্রুর, থেকে গেলেন মথুরায়। কংসের অনুগত হয়ে তার সেবা করতে লাগলেন ; স্থান ত্যাগ করে গেলে যদি শ্রীভগবানের দর্শনলাভ না ঘটে। কংসের পৈশাচিক অত্যাচার-নিপীড়নের তারা নীরব সাক্ষী হয়ে রইলেন।

(৮)

দেবকীর প্রথম ছ'টি পুত্র সন্তানকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে আছড়ে বধ করল কংস। সপ্তম গর্ভে আসছেন অনন্তদেব। ভগবানের আবির্ভাবের আগে অনন্তের ছায়াপাত প্রয়োজন। তাঁকে ছেড়ে ভগবান আসতে পারেন না। অনন্তের বিকাশ হৃদয়ে হলে, তাঁর

বোধ জাগলেই, ভগবানের বোধ জাগে। অনন্তই ভগবানের ধাম, যেখানে তিনি নিয়ত অবস্থান করেন। সেই অনন্তের মূর্তবিগ্রহ সংকর্ষণ।

যোগমায়া শ্রীভগবানের লীলাশক্তি। লীলার ব্যবস্থাপনা তাঁর হাতে। ভগবানের সকল ইচ্ছার রূপদান করেন তিনি। শ্রীভগবান যোগমায়াকে আদেশ করলেন, দেবকীর গর্ভ হতে অনন্তদেবকে বসুদেবের অপরা স্ত্রী রোহিনী-গর্ভে নিয়ে যেতে। দেবকীর অষ্টম গর্ভে আমি আসছি। তুমি (যোগমায়া) নন্দালয়ে যশোদার গর্ভে জন্ম লও। জগতে তোমার বহু নামে পরিচিতি হবে, যেমন দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, চণ্ডিকা, মাধবী, মায়া ইত্যাদি। বৃন্দাবনে তুমিই কাত্যায়নী নামে খ্যাত হবে। নানাস্থানে তোমার মহিমা প্রকাশক পীঠস্থান স্থাপিত হবে।

বসুদেব ও নন্দ দুই ভাই। ক্ষত্রিয় স্ত্রীর গর্ভে বসুদেব এবং বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভে জন্মেছেন নন্দ। বিপদের সম্ভাবনা বুঝে বসুদেব স্ত্রী রোহিনীকে নন্দালয়ে রেখেছেন। গর্ভ আকর্ষণ করার জন্য রোহিনীদেবীর পুত্র সংকর্ষণ নামে খ্যাত হবেন। সকলের সুখবর্দ্ধন করবেন, এজন্য নাম হবে রাম এবং অত্যন্ত বলবত্তা হেতু বলভদ্র নামে পরিচিত হবেন।

যোগমায়া "ওম্" উচ্চারণ করে ভগবানের আদেশ পালনের স্বীকৃতি জানালেন এবং কার্য সম্পাদনে ব্রতী হলেন। কংস ও পুরবাসীগণ দেবকীর সপ্তম গর্ভ নষ্ট হল বলে জানলেন।

সর্বদেবময়ী দেবকী দেবীর অষ্টম গর্ভের সূচনা। বিশ্বাত্মা ও ভক্তগণের অভয়দাতা শ্রীভগবান (ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানাং অভয়ঙ্কর) পূর্ণস্বরূপে বসুদেবের অন্তরে আবির্ভূত হলেন। কারাগারে আবদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর জীবনের পরম শুভ ও আনন্দ ক্ষণ। কারাগারে উভয়ে আছেন সতত ভগবদ্ চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে। দুঃখ, দুর্ভাবনা সেখানে প্রবেশের পথ পায় না। যিনি সর্বভূতে আছেন, বিশ্বের সকল কিছুর মধ্যেই আছেন, তিনি তো বসুদেবের অন্তরেও আছেন।

তবে এখন কে প্রবেশ করলেন বসুদেবের অন্তরে? পরমরমণীয় শ্রীবিগ্রহধারী ভগবদ্ স্বরূপ যাঁর, তিনি প্রবেশ করেছেন। শ্রীভগবান তাঁর লীলাধামে অবস্থান করেন, ভক্তভেদে তাঁর তিন প্রকারের প্রকাশ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

অর্থাৎ— জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥

ভক্তের আরাধ্য বস্তু লীলাধাম বৈকুণ্ঠে, গোলোকে থাকেন। তিনি ব্রহ্ম স্বরূপে আছেন সর্বত্র, পরমাত্মারূপে আছেন সর্বজীবের অন্তরে, তিনি এখন ভগবদ্-স্বরূপে এসেছেন বসুদেবের হৃদয়ে। দীর্ঘকাল আছেন কংসের কারাগারে ভগবদ্ ধ্যানে মগ্ন বসুদেব-দেবকী। কি অপরাধ করেছেন যে কারাগারে আছেন? স্বয়ং ভগবান তাঁদের অবলম্বন করে এই ধরাধামে আসবেন, এই অপরাধ। যথার্থ ভক্তের নিকট কারাগারও পবিত্র স্থান। শ্রীঅরবিন্দ কারাগারেই দর্শন করেছিলেন—"বাসুদেব সর্বং"। সেই অনুভব তাঁর পরবর্তী জীবন অধ্যাত্মভাবমণ্ডিত করেছিল।

শ্রীভগবানের আবির্ভাবে বসুদেবের দেহের রূপান্তর ঘটল। তিনি তখন সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, প্রাণিগণের দূরধিগম্য ও অপরাজেয় হলেন (দুরাসদোঽতিদুর্দ্ধর্ষঃ), বসুদেব দেবকীকে মন্ত্র-দীক্ষা দিলেন (বৈধদীক্ষয়া অর্পিতম্—শ্রীধর স্বামী)। পূর্বদিকে যেমন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, সেইরূপ দেবকীর অন্তরে পূর্ণানন্দময় ভগবান উদিত হলেন। দেবকী সর্বজগতের পরমমঙ্গল পূর্ণ ভগবান আধার স্বরূপা হয়েও কারাগারে রুদ্ধ হওয়ায় সর্বজনের আনন্দদাত্রী স্বরূপে শোভা পেলেন না। শ্রীধর স্বামী বলেছেন,—শ্রীভগবানের গর্ভস্থ হওয়া, জীবের জন্মের ন্যায়, ধাতু সম্বন্ধ নেই (জীবানামিব ন ধাতুসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানী জ্ঞান বিতরণে পরান্মুখ হলে 'জ্ঞানখল' বলে আখ্যাত হয়। ঘটে ঢাকা অগ্নিশিখা ও জ্ঞানখলের অন্তরে ক্রন্দনরতা সরস্বতীর ন্যায়,

দেবকীর দিব্য ভাববতী কান্তি সর্বনয়নের আনন্দপ্রদ রূপে প্রকাশ পেল না।

ঐ দিব্য কান্তি কংস প্রত্যহ দেখে। কিন্তু আনন্দের পরিবর্তে তার অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে। কারণ বিষ্ণু-বিদ্বেষী সে। কংস ভাবে, দেবকীর এমন সুন্দর রূপ তো ইতিপূর্বে দেখিনি। তাঁর অঙ্গ প্রভায় কারাগার কক্ষটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দেবকীর বদনে অপূর্ব আনন্দ উপচে পড়ছে। নিশ্চয় এখন আমার প্রাণহর হরি দেবকীর গর্ভে এসেছেন। এখনই সব চেয়ে উত্তম সময় দেবকীকে হত্যার। এই কথা মনে হতেই তাঁর অন্তরে দেখা দেয় এক বিপরীত ভাবনা। জেগে উঠে উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন। ক্ষেত্র বিশেষে মানুষ অনেক অপ্রিয় কার্যের অনুষ্ঠান করে। কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহার ঠিক নয়। দেবকী স্ত্রীলোক, গর্ভবতী আমার ভগ্নী শত্রু নয়। তাঁর বধ-কার্য অত্যন্ত হীন। তাতে আমার যশ ও সম্পদ নষ্ট হবে, পরমায়ু হ্রাস প্রাপ্ত হবে। যে হীনকর্মের দ্বারা জীবন নির্বাহ করে সে মৃতই, ইহলোকে কেন, সর্বত্রই সে নিন্দনীয়। জীবনান্তে সে নিশ্চয়ই পাপীর ভোগ্য অন্ধতম নরক যন্ত্রণা ভোগ করে (দেহে মৃতে তং মনুজাঃশপন্তি গন্তা তমোহন্ধং তনুমানিনো ধ্রুবম্)। এইরূপ চিন্তা করে কংস নিজেই ভগ্নী বধ হতে বিরত হল।

এখন প্রতিক্ষণে কংসের একটাই ভাবনা, এই বুঝি তার প্রাণহারি হরি জন্মাল, এই বুঝি তাকে বধ করতে আসছে। উপবেশন, শয়ন, উত্থান, ভোজন সর্ব অবস্থায় শ্রীহরির চিন্তা করতে করতে সর্ব জগৎ হরিময় দেখতে লাগল (চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যং তন্ময়ং জগৎ)। মহাভক্তেরা সাধনার অন্তিমে বিশ্ব হরিময় দর্শন করেন। ভয়, ভক্তি, বিদ্বেষ, ভালবাসা যে প্রকারেই হোক শ্রীকৃষ্ণে মন নিবিষ্ট হলে চিত্ত হরিময় হয়। তাঁরা উত্তম গতি প্রাপ্ত হন। বাড়ীতে ঢুকতে দুটি প্রবেশ দ্বার থাকতে পারে, একটা সদর দরজা, অপরটি ময়লা পরিষ্কারের জন্য মেথরের যাতায়াতের দরজা। শত্রুভাবে ভগবানকে ভাবনা দ্বিতীয় দরজা স্বরূপ। ভগবানকে সর্বত্র দর্শন করলেও

কংসের প্রাণে বিন্দুমাত্র আনন্দ নেই, শান্তি নেই। সদাই ভয়ার্ত সে, কখন তার প্রাণঘাতী হরি এসে উপস্থিত হবেন। অপরপক্ষে প্রেম-ভক্তিভাবযুক্ত হলে শ্রীহরির মাধুর্যের অনুভবে ভক্ত সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় পরমানন্দের অধিকারী হয়। "কৃষ্ণ মাধুর্য অমৃতের সিন্ধু"—তাতে সে নিরন্তর অবগাহন করে। ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় গঙ্গা স্নান করলেই পুণ্য, সেইরূপ যে ভাব নিয়ে যান না কেন সচ্চিদানন্দ বস্তুর নিকট, তাতেই কল্যাণ।

অতঃপর সর্বপুরুষার্থপ্রদ শ্রীহরি দেবকীর গর্ভস্থ জেনে ব্রহ্মা-শিব, নারদাদি মুনিগণ ও দেবগণ কংসের কারাগারে উপস্থিত হয়ে গর্ভ-বন্দনা করলেন। পূর্বে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের স্তুতিতে তিনি এই ধরায় বসুদেবের গৃহে আসবেন জানিয়েছিলেন। কবে আসবেন জানান নি। সত্যস্বরূপ তিনি, তাই এসেছেন দেবকী মাতার হৃদয়ে। বিশ্বময় যিনি, তাঁকে স্তব-স্তুতি করা যায় না, বৈকুণ্ঠেও যাবার সৌভাগ্য হয় না সকল সময়। তাই আজ এসেছেন কংসের কারাগারে সকলের অলক্ষ্যে। দেবকীর গর্ভস্থ শ্রীভগবানকে মধুর স্তব করে বলছেন—"পরম সত্যস্বরূপ আপনি। সত্যের আশ্রয় গ্রহণই আপনাকে প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। আপনি সর্বকালে, সৃষ্টির পূর্বে, সৃষ্টি চলা-কালে ও প্রলয়ের পরেও সত্য, পঞ্চভূতের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে সত্য আপনি, আপনি সত্য, প্রিয়বাক্য ও সমদর্শনের প্রবর্তক। আমরা সত্য স্বরূপ আপনার শরণ নিলাম।

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥

(ভাঃ ১০/২/২৬)

সকল সময় যাহা একই প্রকার থাকে, তাহাই সত্য। যিনি সকল সময় আছেন ও থাকবেন, তিনিই সত্য। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন—আমরা পরম সত্যকেই ধ্যান করি! দ্বিতীয় শ্লোক গ্রন্থের বিষয়বস্তু নির্দেশ করতে বলেছেন—"বেদ্যং বাস্তবমত্র" বস্তু—অর্থাৎ বাস্তব বস্তুর কথাই বলা

হবে। কাল্পনিক বা অসত্য বস্তু নয়। মানুষ যা বাস্তব বলে ভাবে বা জানে তা প্রকৃত বাস্তব নয়। একদিন আসবে যেদিন আমরা থাকব না, এই দৃশ্য জগৎ থাকবে না, সৌরজগৎ থাকবে না। যা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে থাকে তাই বাস্তব। গীতায় ভগবান বলেছেন,—নাসতো বিদ্যতে ভাব নাভাবো বিদ্যতে সতো অর্থাৎ অসৎ বস্তুর বিদ্যমানতা নেই, সৎ বস্তুর কোন সময়ই অভাব হয় না। স্বয়ং ভগবানই একমাত্র বাস্তব বস্তু। বাস্তব বস্তুকে জানলেই কল্যাণ, তাপত্রয় দূর হয়ে যায়। সংসারে অবাস্তব বস্তু নিয়ে থাকার জন্য যত দুঃখ ও অশান্তি। হে ঈশ্বর! একমাত্র তোমারই সব সত্য, তোমার জন্ম-কর্ম-লীলা। পরমসত্যের কণা জীবের মধ্যে আছে। জীব ও ঈশ্বরের পার্থক্যের কথা শাস্ত্র অনেকভাবে বলেছেন—যেমন এক বিন্দু জল ও অগাধ জল, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও বৃহৎ অগ্নি। অগ্নি স্ফুলিঙ্গ হাওয়ায় নিভে যায়, বৃহৎ অগ্নি হাওয়ায় বেড়ে যায় ক্ষীরোদ সাগরের তীরে ব্রহ্মা শুনে এসেছিলেন তিনি আসবেন, সেই বাক্য আজ সত্য হতে চলেছে।

সত্যরক্ষা, শরণাগত পালন শ্রীভগবানের বিশেষ এক ব্রত। এই ব্রত হতে তিনি কখনও বিচ্যুত হন না, তাই তাঁর এক নাম অচ্যুত। রাম-রাবণের যুদ্ধের প্রাক্কালে লক্ষ্মণ সৈন্য স্থাপন করেছেন সুগ্রীবকে নিয়ে। এমন সময় দেখা গেল এক জ্যোতির্ময় দেহ আসছে তাঁদের দিকে। উপস্থিত হতে জানা গেল, তিনি লঙ্কেশ্বর রাবণের ভাই বিভীষণ। রামচন্দ্রের শরণ নিতে এসেছেন। রামচন্দ্র এ বিষয়ে সকলের কি মত জানতে চাইলেন। সকলে বল্লেন, রাজনীতির বিবেচনায় যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে শত্রু পক্ষের কাউকে স্থান দেওয়া ঠিক হবে না। হনুমান বল্লেন,—রাজনীতি বুঝি না, রাবণের পক্ষ ছেড়ে রামের পক্ষে যোগ দিতে চায়, প্রস্তাবটা ভাল। সব শুনে রামচন্দ্র বল্লেন, আমার একটা ব্রত আছে, তোমরা সহায় হলে তা রক্ষা হতে পারে। তা হচ্ছে—"সকৃদপি প্রপন্নঃ" একবার মাত্র আশ্রয় লইয়া—যে আমার শরণ নেয়, তাকে চিরকাল অভয় দান করি, তাকে ত্যাগ

করি না, আশ্রয় দি—এই আমার ব্রত। রামচন্দ্র তখন সুগ্রীবাদি প্রধান যারা তাদের বল্লেন, এক্ষেত্রে তোমরা কি বল? তখন সকলে বল্লেন, প্রভু! আপনার ব্রতই রক্ষা হোক।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলেছেন—

কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার
ভব বন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥

এই ব্রত তিনি সকল সময় রক্ষা করেন। না করলেও তাঁকে কৈফিয়ৎ তলব করার কেউ নেই। তিনি সকলের প্রভু। এই বিশ্ব-প্রকৃতি তাঁর অধীন। চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা যথা নিয়মে উদয়াস্ত যায়। তাতে কিছু স্বাতন্ত্র্য নেই। ভগবান সকলের প্রভু, স্বাধীন। তবু তিনি সত্যাশ্রয়ী, সত্যের অধীন।

অনেকে ভাবে সত্য পথে চলব, সত্য আচরণ করব, ঈশ্বরকে ডাকার প্রয়োজনটা কি? আলোর জ্যোতিটা চাই, আলোর প্রয়োজন কি, একথা যেমন অর্থহীন, সদা সত্যময় ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে সত্য রক্ষাও সেইরূপ। যা কিছু সত্য, তা ঈশ্বর স্বরূপে বিধৃত। প্রকৃতি-পুরুষ-কাল যে সত্য, তা সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ততার হেতু। জগতের সবই মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হবে, কেবল চিন্ময় ভগবদ্ ধামের ধ্বংস নেই। মণি ও তার জ্যোতি যেমন অচ্ছেদ্য, ঈশ্বর তাঁর ধাম ছাড়া হন না। মূল যে সবিতা তাঁর জ্যোতি বরণীয় ভর্গ তাঁর সঙ্গে যুক্ত। আমাদের সত্তা যা নিত্য, সত্য তাঁকেই চায়। যা আজ আছে কাল থাকবে না, তা আমাদের কাম্য নয়। চন্দ্রের নিজস্ব আলো নেই, সূর্যের আলোর প্রতিফলনে আলোকিত, সেইরূপ জগতের স্বাধীন কোন অস্তিত্ব নেই, চিৎস্বরূপ ঈশ্বরের প্রতিফলনে সত্তাময় (সর্বং খল্লিদং ব্রহ্ম)। গায়ত্রী মন্ত্রে অনন্ত বিশ্বের মূল কারণ প্রসবিত্রী সূর্যের ধ্যান করা হয়। জগতের সকল সত্য সেই ঈশ্বরে পর্যবসিত।

ঋতম্ ও সত্যম্ ঈশ্বরের দুই চক্ষু। তাঁর মধ্যে অনৃতম্ বা মিথ্যা কিছু নেই। ঋতম্ অর্থ ছন্দ বা Order। বিশ্বের সর্বত্র একটা

ছন্দ বা শৃঙ্খলা আছে। জগৎটা ছন্দে চলে, মতলবে চলে না। বিশ্বের মাঝে বিশ্বেশ্বরের একটা ছন্দ আছে। বেদের এক নাম 'ছন্দ' (ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি—গীতা)। বিশ্বনিয়ন্তার চক্ষের সামনে তাই সব ছন্দে চলে। সেই ছন্দে না চললেই দুঃখ তাপ ভোগ করতে হবে। এই শৃঙ্খলাই ঋতম্। এই দুই তাঁর চক্ষু। সত্যস্বরূপ ও ছন্দময় তোমার আমরা শরণ নিলাম। তাঁর আশ্রয়ে আছি সেই বোধ হারিয়ে দুঃখ কষ্ট পাই। ছেলে মার কোলে থেকেও 'দুঃস্বপ্ন দেখে' মা বলে কেঁদে ওঠে। স্বপ্ন ভাঙতে সে জানল মায়ের কোলেই আছি। আমাদেরও বোধ জাগবে, তখন বুঝতে পারব তাঁর আশ্রয়ে আছি, তাঁকে পেয়ে আছি। বৈষ্ণব আচার্যের ভাষায় 'প্রাপ্তির প্রাপ্তি'।

সিংহী এসেছিল ভেড়ার পালে শিকার করতে। সে বাচ্চা প্রসব করে। ঐ সিংহ-শিশু জন্ম হতে ভেড়ার দলে আছে, ঘাস খায়, ভেড়ার মত ডাকে। একদিন একটা বড় সিংহ এসে ওকে দেখে বল্ল, তুই সিংহ, ভেড়া না। আমার মত ডাক। সে না পারে ডাকতে, না পারে বড় সিংহের কথা বিশ্বাস করতে। তখন সেই বড় সিংহ ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাতকূয়ার জলে দেখাল দুজনার চেহারা একরূপ, ভেড়া হতে পৃথক। সিংহ সে ছিলই ; বোধটা হারিয়ে ফেলেছিল। মূলে সে যা ছিল এখনও তাই, পূর্বে জানতো না তার স্বরূপ, এখন জানল, প্রাপ্তির প্রাপ্তি ইহাই। শ্রীভগবানের আশ্রয়ে আছি, তাঁর নিত্য দাস জীব, তার সঙ্গে যুক্তই আছি—তাঁকে জানলেই এ সত্যের জ্ঞান হবে।

ব্রহ্মাদি দেবগণ গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করে আর বল্লেন, এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আদি বৃক্ষস্বরূপ, প্রকৃতি ইহার একমাত্র আশ্রয়। বৃক্ষের যে অংশ কাটলে বৃক্ষের ক্ষতি হয় না, যা মূল হতে পৃথক তা নশ্বর, তার ধ্বংস আছে। যা মূল, যা কাটা যায় না, অচ্ছেদ্য, তাই আত্মা। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে সংসারকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই বৃক্ষের মূল উর্দ্ধে, যেহেতু পুরুষোত্তম বা পরমাত্মা হতে এর উৎপত্তি ও বিস্তার। এই সংসার বৃক্ষও অব্যয়, অনাদিকাল

হতে আছে। বেদসকল ইহার পত্র। পত্র বৃক্ষকে যেমন আচ্ছাদন করে রক্ষা করে, বেদসকল ধর্মাধর্ম প্রতিপালন দ্বারা ছায়ার ন্যায় সর্বজীবের রক্ষক ও আশ্রয়। তাকে যিনি জানেন, তিনি বেদবিৎ, জ্ঞানী।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ গীতাঃ ১৫/১

কালে এই বৃক্ষ নাশপ্রাপ্ত হবে। এই সুন্দর বৈচিত্র্যময় সংসার থাকবে না। এর মধ্যেই আছেন যিনি নিত্য-অপরিবর্তনীয়-ধ্বংসরহিত, তিনিই পরমপুরুষ। একমাত্র তিনি, তাঁকে ভিত্তি করে মিথ্যা দাঁড়িয়ে আছে। শঙ্করাচার্য বলেছেন—'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'। এর তুলনা করা হয়েছে—রজ্জুতে সর্পভ্রমের সঙ্গে। রজ্জু (দড়ি) পড়ে আছে রাস্তায়, আলো-আঁধারে তাকে সাপ বলে মনে হচ্ছে। রজ্জু রয়েছে তা দেখছি না, যা নেই 'সাপ' তাই দেখছি, কল্পনায় সাপ দেখছি। ব্রহ্মই আছেন, দেখছি না তাঁকে। যা অসৎ, মিথ্যা, তাকে দেখছি, তা এই জগৎ। তাঁকে জানলে, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলেই তবে আমাদের মূল্য। বিযুক্ত হলে আমরা কিছু না, যেমন মাথার চুল মাথায় থাকলেই মূল্য, কেটে ফেললে কিছুই নয়। মূলকারণ যিনি, তাঁকে জানলে এই ধ্বংসশীল, মরণশীল জগৎ হতে পরিত্রাণ পায় জীব (ত্বমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি)। তাঁর থেকে সৃষ্টি, তাঁতেই স্থিতি এবং তাঁতেই লয়প্রাপ্ত হবে সব। পুতুল তৈরী হল মাটি দিয়ে, ভেঙ্গে গেলে পুনরায় মাটি। হার বলয় ইত্যাদি সোনার গহনা করলেও সুবর্ণ, ভাঙ্গলেও সুবর্ণ। মধ্যে যে নাম-রূপ নিয়েছিল, তা নষ্ট হল। হে পরম ঈশ্বর! তুমিই আছ, আমরা তোমাতেই আছি। অনেকগুলি ঘট জল ভরা, ঘটগুলি জলের মধ্যে রাখা হল, ঘটের ভিতরেও জল বাইরেও জল। ঘট ভাঙ্গলে ঘটের জল ও বাইরের জল এক হয়ে গেল। বিশ্বময় তুমি, সকলে তোমার মধ্যে আছে, আবার তুমি সকলের মধ্যে আছ। এই দর্শন যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানীর দর্শন। গীতা বলেছেন,—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ৫/১৮

বিদ্যাবিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গাভী, হস্তী ও কুক্কুরে যিনি সমদর্শী, তিনি আত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত।

যিনি সমদর্শী, সকলকে সমান দেখেন, তিনি হিংসা-বিদ্বেষ রহিত হন।

আপনি নিখিল বিশ্বের মূল কারণ, আপনি আত্মার আত্মা, বিশ্বাত্মা। জীবের মত কর্মফল ভোগের জন্য আপনার জন্ম নয়। বিশ্বের সকলের কল্যাণের জন্য আপনার আবির্ভাব। আমাদের দেহ ত্রিগুণাত্মক, আপনি ত্রিগুণাতীত, বিশুদ্ধ সত্ত্বের ঘনীভূত মূর্তি। রজ-তম আত্মানন্দকে রঞ্জিত করে, দেহ-ইন্দ্রিয় সুখের অভিমুখী করে এবং প্রকৃত সুখ যে আত্মার বস্তু উহা আবরণ করে, জানতে দেয় না।

হে পদ্মপলাশলোচন! সাধকেরা আপনাতে চিত্ত সমাহিত করে আপনার আনন্দঘন স্বরূপে স্থিত হন। আপনার পাদপদ্ম আশ্রয় করে এই দুঃখ-যাতনাময় দুস্তর ভবসাগর তাঁরা অনায়াসে পার হয়ে যান। ভব অর্থাৎ যা নিয়ত পরিবর্তনশীল, যেমন স্বাস্থ্য-শ্রী-যৌবন আজ আছে কাল থাকবে না, ধন-মান-যশ-প্রতিপত্তি আজ আছে কাল থাকে না, আজ জীবন আছে কাল মৃত্যু এসে গ্রাস করবে। এই ভব হতেই সংসারে যত দুঃখ। এই ভবসাগর পারের সন্ধান মহতেরা দিয়ে থাকেন। তাঁদের কৃপাই ভবপারের সম্বল।

মহৎ কৃপা বিনা কোন কার্য সিদ্ধ নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয়॥ (চৈঃ চঃ)

সজ্জনেরা সংসারী জীবের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ, জগতে সকলেই আপনজন (বসুধৈব কুটুম্বকম্) তাঁদের। যে নৌকায় তাঁরা পার হন, সে নৌকা সংসারী জীবের জন্য রেখে যান। হে ভগবান! অসীম করুণাময় আপনি, সর্বজীবের সুহৃদ। মুক্ত যাঁরা তাঁরাই দিয়েছেন মুক্তিলাভের পথের সন্ধান। না হলে অনাদি কাল হতে

বহির্মুখ যে সংসারী জীব আপনার সন্ধান পেত না কোনকালে। জীবের কল্যাণের জন্য ভগবান নিজে আসেন এবং ভক্তদের পাঠান।

শাস্ত্র গুরু আত্মা রূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান ॥ (চৈঃ চঃ)

মুক্ত হয়েও বদ্ধ জীবের মত সংসারে আসেন তাঁরা জীবের পরিত্রাণের জন্য। মুক্তপুরুষের বাক্য, আপ্ত বাক্য বা বিদ্বৎ অনুভূতি সংসারে পরম মূল্যবান সম্পদ। যারা খল, তাদের প্রতিও তোমার করুণাদৃষ্টি প্রসারিত। তোমায় যারা চায় না, অথচ নিজেদের মুক্তাভিমানী বলে ভাবে, তাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধ নয়। কঠোর তপস্যা করেও তাদের পতন ঘটে তোমার শ্রীচরণ আশ্রয় না করায়। পুরাণে দেখা যায়, আসুরিক ভাবাপন্ন অনেকে দৈব কৃপা লাভ করেও অহঙ্কারী ও ক্ষমতাভিমানী হয়ে কল্যাণ পথ হতে ভ্রষ্ট হয়েছে। তোমার প্রতি ভক্তিহীনতাই তাদের পতনের কারণ। খুব সুকৃতি বলেই মানব দেহ লাভ হয়, কারণ এই দেহই কেবল ভগবদ্ ভজনোপযোগী।

হে প্রভো! বিশুদ্ধ সত্ত্বময় তোমার যে রূপ, যে রূপে তুমি ধরায় এস, মানবের ধরা-ছোয়ার মধ্যে উহা তোমার অশেষ করুণার প্রকাশ। যাঁরা তোমার সেই রূপের কৃপা পেয়েছে, ধন্য তাঁদের জীবন। তাঁরা মহাপাপী হলেও তোমার করুণা তাঁদের মহত্ত্ব দান করে।

"জগাই মাধাই পাপী ছিল নামের গুণে তরে গেল
তারা হল পতিত পাবন" —শ্রীনরোত্তম ঠাকুর।

সকল জীবের তুমি মঙ্গলকামী বন্ধু। শত্রু তোমার কেউ নয়। যারা তোমার প্রতি অসূয়াপূর্ণ, বিদ্বেষভাব পোষণ করে, তোমায় বিনাশ করতে প্রয়াসী হয়, তাদেরও তুমি মুক্তিপদ দান কর। সর্বভূতের বন্ধু তুমি, যে তা জেনেছে সে শান্তিলাভ করে, কল্যাণপূর্ণ হয় তার জীবন, নির্ভয়ে চলে যায় সকল বিপদের উপর পা দিয়ে।

"সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি" —গীতাঃ ৫/২৯

(৯)

ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্বদেবময়ী দেবকী দেবীর গর্ভস্থ শ্রীভগবানের মহিমা সূচক মধুর স্তবে সম্বর্দ্ধনা জানাচ্ছেন। হে ভগবান! এই মায়াময় সংসার দুস্তরনীয়, জন্মমরণরূপ সংসার প্রবাহে সকলেই পতিত হয়ে অশেষ দুঃখ ভোগ করছে। তোমার মায়া অতিক্রম করা সুকঠিন ব্যাপার। গীতায় নিজমুখে ভগবান বলেছেন—"মম মায়া দুরত্যয়া" একথা অতীব সত্য। তবে তোমার নাম বহুল প্রচারিত, কৃপা করে বহু নাম প্রকাশ করেছ ("কৃপাতে করিলা বহু নামের প্রচার"—চৈঃ চঃ)। কারণ যার যে নামে রুচি তিনি সেই নাম আশ্রয় করতে পারেন। সংসার সাগরে উহাই ভেলা। তোমার রূপ অতুলনীয়। যে ঐ রূপ দেখেছে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় মন তোমাতে আবিষ্ট হয়, সর্বচিত্ত তোমাতে সমাহিত হয়ে যায়। জগৎ সংসার তাঁর কাছে তুচ্ছ, অর্থহীন হয়ে যায়। রূপদর্শনের জন্য চোখের একটা লালসা আছে, জগতের কারও রূপ দেখে প্রাণ ভরে না, লালসা মেটে না। কিন্তু যে তোমার রূপ একবার দেখেছে, তার সর্বচিত্ত তুমি আকর্ষণ কর। তার রূপ দেখার ইচ্ছা চিরতরে মিটে যায়। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁর পরিকর শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বল্লেন,—

কৃষ্ণের মধুর রূপ, শুন সনাতন।
যার এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
সর্বচিত্ত করে আকর্ষণ।—চৈঃ চঃ

দেবগণ বললেন, তোমার নাম-রূপের শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ ছাড়া তোমাতে চিত্ত সমাহিত করতে শ্রেষ্ঠ উপায় কিছু নেই, বিশেষ করে এই কলির জীবের পক্ষে। তোমার নাম-রূপ পরম মঙ্গলকর।

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্ নামানি রূপানি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যস্তচ্চরণারবিন্দয়োরাবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে॥ ভাঃ ১০/২/৭৭

—হে ঈশ্বর, যিনি আপনার মঙ্গলময় নাম-রূপ শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করেন এবং অন্যকে শ্রবণ করান, আপনার চরণকমলে

সমাহিত চিত্ত হয়ে তিনি জন্মমরণরূপ সংসার প্রবাহে আর পতিত হন না।

সকলের আশ্রয় তুমি, সজ্জনের আনন্দদায়ী। তোমার ভক্তের কোন বিপদ নেই, বিনাশ নেই (ন মে ভক্তাঃ প্রণশ্যন্তি)। সকল বাধা-বিপদ অতিক্রম করে চলে যান তাঁরা। জগতের গুরুতর দুঃখ তাঁদের স্পর্শ করে না, বা অভিভূত করে না (ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে)। ঠাকুর পরমহংসদেব বলেছেন, নৌকা জলের উপর দিয়ে চলে, জল নৌকার ভিতরে ঢুকলে বিপদ, নৌকা ডুবে যাবে। ভক্তগণ সংসারের উপর দিয়ে চলে যান, সংসার তাঁদের ভিতর প্রবেশ করে না।

জগতে স্বয়ং ভগবানের আগমন সর্ব ধর্মমতে স্বীকৃতি পায় নি। যেমন ইসলাম ধর্ম বলেন, ঈশ্বর আসেন না, তাঁর প্রতিনিধি বা দূত পাঠান। খৃষ্টান ধর্মমতে ঈশ্বর আসেন না, তাঁর পুত্রকে প্রেরণ করেন। ভগবান যাঁদের পাঠান, তাঁদের নিকট হতে জানা যায় ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব। সংসারে যারা ডুবে আছে, তারা সংসারের অতীত কিছু আছে ভাবতে পারে না। ধর্ম তাদের কাছে অবাস্তব কল্পনা মাত্র। সংসার সংগ্রামে যারা পরাজিত, জীবন যাদের দুঃখ হতাশায় ভারাক্রান্ত, তারাই কেবল ধর্ম, ধর্ম করে। ধর্মরূপ অহিফেন (opium) খেয়ে দুঃখ ভোলার চেষ্টা করে। জগতে বাঁচতে গেলে ধর্মের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষ কেবল বাঁচার জন্য বাঁচে না। সঙ্গীত, ধর্ম, শিল্পকলা না হলেও বাঁচা যায়, পশুরা যেমন বাঁচে। কিন্তু মানুষ পশু নয়। শিক্ষা সভ্যতা, ধর্ম, সংস্কৃতি, সঙ্গীত শিল্পকলা মানুষের চাই। এসব তাকে আনন্দ দেয়। এগুলি না হলে কেবল জীবনধারণের কোন অর্থ নেই তার কাছে। আনন্দের জন্যই মানুষের সব কিছু প্রয়াস। যদি আনন্দ না থাকত, তাহলে কেইবা প্রাণধারণ করতে চাইত? উপনিষদ বলেছেন,—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

—"সেই সর্বব্যাপী আনন্দ হইতেই এই সমস্ত প্রাণী জন্মিতেছে, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের দ্বারাই এই সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের মধ্যেই ইহারা গমন করে, প্রবেশ করে"।

— রবীন্দ্রনাথ (ধর্ম)।

আনন্দের সন্ধানই মানুষকে ধর্মের দ্বারদেশে এনেছে। ধর্ম যাঁদের জীবনে মূর্ত, সংসারের অভাব অভিযোগ, বিপদ, আপদ, দুঃখ কষ্টের মধ্যে তাঁরা পরমানন্দে আছেন, আমরা দেখেছি। আনন্দময় ভগবানকে বাদ দিয়ে যথার্থ আনন্দ, স্থায়ী আনন্দ কোথায় ? ধর্ম সংস্কৃতি সভ্যতার বিকাশ তাঁর থেকেই ঘটেছে। যে সমাজ তাঁর থেকে বিচ্যুত, তাদের হিংসা বিদ্বেষ হানাহানি পশুত্বকেও হার মানায়। তাঁর স্পর্শ থাকলেই জীবন সুন্দর ও আনন্দময়। আমাদের সকল কর্মের সার্থকতা তাঁর সেবাতেই। ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য পালন দ্বারা, যোগী সমাধিতে যোগযুক্ত হয়ে, ভক্ত তাঁর প্রকট বিগ্রহের অর্চনায় তাঁর সেবাতেই রত। তিনি জগতে আসেন তাই জানা যায় তিনি কত সুন্দর, মধুর ও প্রেমময়।

বেদ অপৌরুষেয় গ্রন্থ, ইহার রচয়িতা কেউ নয়। সত্য কেউ তৈরী করে না, সত্য প্রকাশিত হয়। ঋষিগণ বেদের দ্রষ্টা, স্রষ্টা নয়। আপ্তবাক্য, মহতের জীবনের অনুভূতি হতে তাঁর বিষয় জানাবার সৌভাগ্য ঘটেছে মানুষের। বেদময় তিনি, বেদের বাণী তাঁর কথাই বলে (বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে)। ঈশ্বরের খবর দেয় বেদ, বেদের বাণী সত্য করে তোলেন ভগবান এসে। বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে জানা যায় না। বুদ্ধির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। চোখের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কেবল আলোর তরঙ্গ গ্রহণ করে, শব্দ তরঙ্গ গ্রহণ করতে পারে না। চিনি মিষ্ট তা জিহ্বা ছাড়া অন্য ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা নেই জানবার। মানুষ বুদ্ধির যতই বড়াই করুক, বুদ্ধির ক্ষমতা নেই আত্মতত্ত্ব অনুভবের। মানুষ ক্রমশঃ প্রকৃতির সঙ্গে যোগ হারাচ্ছে,

ফলে প্রাকৃতিক বিষয়ের অনুভব হারিয়ে ফেলছে। বুদ্ধি উহা অনেকটা পূরণ করেছে। বুদ্ধি শাস্ত্রের বিষয়কে সুন্দর করে সাজিয়ে ধরতে পারে, কিন্তু মূল তত্ত্বের কোন সংবাদ দিতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম জেম্‌সের মন্তব্যটি অতি সুন্দর,—বিজ্ঞানে ঈশ্বর সত্তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, সেজন্য ঈশ্বর নেই বলতে পারি না। ঈশ্বর বিশ্বাস মানুষকে যা দিয়েছে, বিজ্ঞান তা দিতে পারে নি। কঠিন রোগাক্রান্ত পুত্রের মাতা চার্চে গিয়ে প্রার্থনা জানিয়ে যে মানসিক শান্তি পান, তা বিজ্ঞান দিতে পারছে না। সুতরাং ঈশ্বর নেই বলা বা মায়ের ঐ বিশ্বাসে আঘাত হানার অধিকার বৈজ্ঞানিকের নাই।

দেবগণ স্তুতি করে বলেছেন,– হে বিধাতঃ! তোমার শুদ্ধসত্ত্বময় এই শ্রীবিগ্রহ যদি প্রকট না করতে (সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেৎ), তবে অজ্ঞান ও অজ্ঞানজনিত ভেদ নিবারক অপরোক্ষ জ্ঞান হোত না (বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপ—মার্জনম্ ! মানুষ সসীম, ক্ষুদ্র। তোমার বিষয় ভাবনা করা তার পক্ষে অসম্ভব। তোমার শ্রীবিগ্রহ বা মূর্তি ছাড়া তোমার ভাবনা করা যায় না। মূর্তি ছাড়া যে কোন ভাবনাই অসম্ভব (without image thought impossible)। 'দয়া' কি বস্তু বোঝাতে, অন্ধ-গরীবকে পয়সা দেওয়া হচ্ছে, এরূপ চিত্রের অবতারণা করা হয়। তুমি রূপ ধারণ করে এই ধরায় এস, তাই তোমার ধ্যান-পূজা-উপাসনা সম্ভব হয়েছে। বিশ্বময় যিনি, নিরাকার যিনি, তাঁকে কল্পনায় আনা যায় না।

শাস্ত্র ভগবানের সাকার ও নিরাকার দুই প্রকার স্বরূপের কথা উল্লেখ করেছেন। যখন তুমি মানুষী তনু ধারণ করে এস, তখন তোমার কৃপা ছাড়া কেহই তোমায় জানতে পারে না, বুঝতে পারে না। সাধারণ মানুষ বোধে অবজ্ঞা করে। ভগবান গীতায় বলেছেন,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৯/১১

—মনুষ্য দেহধারী আমি সর্বভূতের মহেশ্বর, আমার পরম তত্ত্ব না জেনে অধিবেকী ব্যক্তিগণ আমাকে অবজ্ঞা করে।

শ্রীভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে ভগবানের মানুষী তনু ধারণ করে ব্রজললনাগণের সঙ্গে প্রেমমধুর লীলার কারণ উল্লেখ প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বলেছেন—

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ ১০/৩৩/৩৭

—জীবগণকে অনুগ্রহ করার নিমিত্তই ভগবান ঐরূপ লীলাসকল করেছেন, যা শ্রবণ করে মনুষ্য দেহধারী যে কেহ ভগবৎ পরায়ণ হতে পারে।

বাইবেলেও (Bible) আছে, –"God made man after His own image"—অর্থাৎ ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন নিজ মূর্তির অনুরূপভাবে। তবে মানুষ ও ঈশ্বরে ব্যবধান বিরাট। মানুষের দেহের বিকার আছে, ভগবানের দেহ বিকারহীন। মানুষের দেহ জড়, ঈশ্বরের দেহ চিন্ময়। মানুষের দেহ কর্মফল 'ভোগের জন্য' ঈশ্বরের কর্ম দিব্য (জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং—গীতা) ও আনন্দ আস্বাদনের জন্য। জীব মায়ার অধীন, ঈশ্বর আত্মমায়ার (যোগমায়ার অধীন এবং মায়ার অধীশ্বর। জীব মায়ার অধীনতা বশে দুঃখ ভোগ করে অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ—চৈঃ চঃ) ঈশ্বর যোগমায়ার অধীনতা বশে লীলাবিস্তার করতঃ আনন্দ আস্বাদন করেন। উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও আছে, পার্থক্যও অনেক। পৃথিবীর সঙ্গে কমলালেবুর সাদৃশ্য আছে, কিন্তু কোটি কোটি কমলালেবু একত্র করলেও পৃথিবী হবে না। মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও কোটি কোটি মানুষ একীভূত করলেও ভগবান হবে না।

ভগবান যেমন সত্য, তাঁর শ্রীবিগ্রহও অনুরূপ সত্য। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অদ্বৈত প্রভুর বংশের সন্তান। প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্ম অঙ্গীকার করে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেছেন, ঈশ্বরের মূর্তি তখন মানতেন না। পরবর্তীকালে ঈশ্বরের মূর্তি বিশ্বাস করতেন

ও তা প্রচার করতেন। একজন প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি আগে মূর্তি মানতেন না এখন উল্টা কথা বলছেন কেন? তিনি বল্লেন, যিনি সর্বভূতে আছেন, তাঁর মূর্তি চিন্তা-ভাবনা-বুদ্ধির অগোচর। আগে জানতাম না, তাই বলেছি মূর্তি নেই। এখন শ্যামসুন্দর কৃপা করে দর্শন দিয়েছেন, এখন কি বলব মূর্তি নেই?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে প্রথম পরিচয় কালে স্বামী বিবেকানন্দ প্রশ্ন করেন,—আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন? ঠাকুর উত্তর দেন,—হাঁ, দেখেছি, এই যেমন তোকে দেখছি সেইরকম, তোর সঙ্গে যেমন কথা বলছি, সেইরকম কথা বলি। ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহের মহিমা তাঁর ভক্তরাই কেবল অনুভব করতে পারেন।

তাড়াসের (বাংলাদেশের পাবনা জেলায়) রাজা বনমালী রায়। বিলাতি শিক্ষায় শিক্ষিত। গৃহে পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত "জামাই বিনোদ" নামে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ আছেন। রাজকীয় আড়ম্বরে বিগ্রহের সেবা-পূজা হয়। রাজা শ্রীবিগ্রহে বিশ্বাস করেন না তেমন, কিন্তু সেবা-পূজা যেমন চলতো, তাতে বাধা দেন নি বা পরিবর্তন করেন নি। ঠাকুরের ভোগের সঙ্গে সোনার গড়-গড়ায় তামুক দেওয়া হোত সেবার একটি অঙ্গ হিসাবে। একবার প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরকে নিয়ে এসেছেন রাজবাড়ীতে। দ্বিপ্রহরে জামাই বিনোদের ভোগ দেওয়া হয়েছে, সঙ্গে তামুক দেওয়া হয়েছে। মন্দির কক্ষের দরজা বন্ধ করে পূজারী বাইরে এসেছে। প্রভু জগদ্বন্ধু ও বনমালী রায় মন্দিরের বারান্দায় বসে আছেন। রাজার শ্রীবিগ্রহে বিশ্বাস নেই বুঝে প্রভু বল্লেন, বিনোদজী এখন তামাকু সেবা করছেন, কান পেতে শুনুন। রাজা কিছু শুনতে পাচ্ছেন না। তখন প্রভু জগদ্বন্ধু তাকে স্পর্শ করতেই মন্দিরের মধ্য হতে গড়গড়ার শব্দ আসছে শুনতে পেলেন। অপূর্ব এক তামাকুর দিব্য গন্ধ নাকে আসতে লাগল। তারপর রাজা প্রভুর অকৃত্রিম ভক্ত হয়ে ওঠেন এবং তার জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। ঠাকুরের বিগ্রহ যে জীবন্ত এই বিশ্বাস তাঁর মনে দৃঢ়মূল হয়। ভক্তের

ভক্তি মিশ্রিত বস্তু ভগবান সর্বদা গ্রহণ করেন। অভক্তের বহুমূল্যবান বস্তু স্পর্শ করেন না।

রামানুচার্যের বহু শিষ্য ছিল। তাঁর বেদান্তের ব্যাখ্যা শ্রবণে আকৃষ্ট হয়ে একজন শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। শিষ্য বেদান্তে বিশ্বাসী, ঈশ্বরের মূর্তিতে তার আস্থা ছিল না কিছু। গুরু বিগ্রহের সেবা-পূজা করতেন তা খুব ভাল চক্ষে নিতে পারত না। তার ধারণা মূর্তি-পূজা নিম্ন অধিকারীর জন্য। রামানুজ তার মনোভাব বুঝেও কিছু বলতেন না। একদিন আশ্রমে আগুন নেই, শিষ্যটিকে বল্লেন একটু আগুন নিয়ে আসতে। শিষ্য জ্বলন্ত উনুন হতে কিছু কাঠ নিয়ে এলেন। গুরু বল্লেন, পোড়াকাঠ আনতে বলি নি, আগুন চাই। শিষ্য বুঝে উঠে পারছে না, কাঠ ছাড়া কি করে আগুন আনবে। রামনুজ তখন তাঁকে বল্লেন, সামান্য আগুন আনতে একটা অবলম্বন দরকার হচ্ছে। আর বিশ্বেশ্বর যিনি, তাঁকে পাওয়া যাবে বিনা অবলম্বনে? এই বিগ্রহই সেই অবলম্বন, ভক্তিযুক্ত চিত্তে সেবা-পূজা করলে তিনি এঁর মধ্যেই হবেন আবির্ভূত। তখন এই বিগ্রহই অর্চাবতার।

হে সর্বদুঃখহারী ভগবন্! সর্বেশ্বর তুমি, আমাদের পরম সৌভাগ্যবশতঃ এই পৃথিবীতে তোমার অবতরণ। তোমার শুভ আবির্ভাবের সুচনাতেই (ঈশিতুঃ তব জন্মনা) জগতের দুঃখ দূর হয়েছে। ঈশ্ ধাতু হতে ঈশ্বর। ইচ্ছাতেই তোমার কর্ম সম্পাদন। কেবল ইচ্ছাতে আমাদের কোন কাজ সম্পন্ন হয় না, কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে তা হয়। তুমি ইচ্ছা করেছ জগতের দুঃখ দূর করব, তাতেই দুঃখ চলে গেছে। তবে তোমার এ ধারায় আগমনের আর প্রয়োজন কি? সত্যস্বরূপ তোমার সত্য রক্ষা ও তোমার অনুগৃহীত পৃথিবী ও স্বর্গ (তব অনুকম্পিতাং গাং দ্যাং চ) তোমার মঙ্গলময় অতি রমণীয় ধ্বজ বজ্রাদি সমন্বিত চরণ চিহ্নের দ্বারা অঙ্কিত হবে (সুশোভনৈঃ ত্বৎপদকৈ অঙ্কিতাং) তা দেখব, এই সৌভাগ্যদান করতে লক্ষ্মীদেবী তোমার বক্ষস্থিতা হয়েও সতত ঐ চরণ সেবার বাঞ্ছা করেন। পৃথিবীর বক্ষে তোমার ধ্বজ ব্রজ্র অঙ্কুশ চিহ্ন দেখব। ঐ ধ্বজ অর্থাৎ পতাকা যে আশ্রয় করে

তার সর্বত্র জয় হয়। বজ্র সদাই উদ্যত হয়ে ভক্তগণের বিপদ নাশ করে। অঙ্কুশ অর্থাৎ হস্তি তাড়নের দণ্ড, ভক্ত যদি বিপথে যায় তাকে অঙ্কুশ দ্বারা স্বপথে নিয়ে আসে। প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর প্রার্থনা করেছেন—

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখিয়া ধূলায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে বক্ষ পাতিব তাহায়॥

পরম এই সৌভাগ্য দান ও লীলা মাধুর্য আস্বাদনের সৌভাগ্য দিতে তোমার আগমন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে তুমি অর্জুনকে জানিয়েছিলে, তোমার শত্রুগণকে আমি পূর্বেই নিহত করেছি, তুমি এখন নিমিত্ত মাত্র হও। "ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্" গীতা ঃ ১১/৩৩। ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে স্তবে বলেছেন, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে যখন কৌরব সৈন্যদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে, তখনই মনে হল তাদের আয়ু হরণ করলে।

পরিবর্তনশীল জগতের মধ্যে চললেও তুমি স্বরূপতঃ অপরিবর্তণীয়, নিত্য, সনাতন। নিত্য কৈশোরে তোমার স্থিতি। তবে বাৎসল্যময়ী মায়ের কাছে তুমি শিশু ও বালক রূপ পরিগ্রহ কর, এই রূপ তোমার স্বাভাবিক নয়। জলের স্বাভাবিক প্রকৃতি শীতলতা, যখন উহাতে তাপ প্রবেশ করে তখন গরম বোধ হয়, আবার শৈত্যের প্রভাবে খুব ঠাণ্ডা বোধ হয়। যখন যে রসের ভক্তের সান্নিধ্যে তোমার স্থিতি, তখন তদনুরূপ তোমার প্রকাশ, বাৎসল্য রসের নিকট বালক, মধুর রসের নিকট কিশোর। শ্রীজয়দেব 'গীত গোবিন্দ' গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে বর্ণনা করেছেন, 'মেঘমেদুর অম্বরে ইত্যাদি' অর্থাৎ নন্দ মহারাজ কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে গোষ্ঠে এসেছেন, এমন সময় ঝড় আসছে দেখে চিন্তিত হলেন। গরুর পাল একত্র করে নিয়ে ফিরতে হবে, এখন গোপালকে কার কাছে দেবেন বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য। তখন শ্রীরাধাকে যেতে দেখে তাঁর কোলে দিলেন। তার পরেই শ্রীরাধাদি ব্রজ কিশোরীগণের সঙ্গে প্রেম মাধুর্যের লীলা।

জগতের কল্যাণের নিমিত্ত তোমার আগমন। তোমার অংশ অবতারেও ঐ কার্য হতে পারে। স্বয়ং আগমনের কারণ কি?

জন্মরহিত তোমার (অভবস্য তে) জন্মের কারণ (ভবস্য কারণং) আত্মবিনোদন, নিজের আনন্দ আস্বাদন ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না (বিনোদনং বিনা ন তর্কয়ামহে)। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ স্বয়ং ভগবানের এই আত্মবিনোদন "অন্তরঙ্গ প্রয়োজন" বলে উল্লেখ করেছেন। যখন ধরায় এসে নিজের আনন্দে লীলা প্রকট কর, তখন জগৎজীবকে অশেষ করুণা করে থাক। তোমার জীবকল্যাণ ও আনন্দ আস্বাদন পৃথক কিছু নয়। জমিদারের পুত্র হয়েছে, অন্নপ্রাশন উৎসব। গরীব দুঃখী-কাঙ্গাল সকলের অবারিত দ্বার। যত ইচ্ছা উত্তম খাবার পেট ভরে খাচ্ছে, নিয়ে যাচ্ছে এবং টাকা পয়সা বস্ত্রাদি দানসামগ্রী পাচ্ছে। জমিদার করছেন নিজের আনন্দে, আর গরীব দুঃখীরা ভাবছে কত দয়া তার। সেইরূপ ভগবান নিজের আনন্দে যখন নিজ পরিকরগণের সঙ্গে প্রেমের লীলা করেন, তখন দেবদুর্লভ রাগমার্গের ভক্তি জীব পেয়ে ধন্য হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বর্ণনা করেছেন—

রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হয় ইচ্ছার উদগম॥
প্রেমরস নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে বিতরণ॥

জীবকে প্রেমভক্তি-দানই শ্রীভগবানের করুণার চরম প্রকাশ। পাখী নিজের আনন্দে গান করে, যে শোনে সে আনন্দ পায়। ফুল ফোটে নিজের স্বভাবে, যে কাছে যায় সে গন্ধে মুগ্ধ হয়।

শ্রীগৌরসুন্দর তাঁর যুগের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। যৌবন বয়সে পরম বাৎসল্যময়ী মা এবং পরমা সুন্দরী যুবতী স্ত্রী পরিত্যাগ করে, সব কিছু বিসর্জন দিয়ে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলে নেচেছেন, কেঁদেছেন নিজের মাধুর্য আস্বাদনে বিভোর হয়ে।

প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর গাঢ় অন্ধকারময় জানলাবিহীন এক মাটির ঘরে ছিলেন ষোল বছর আট মাস। ঘরে আলো জ্বালা হোত না। ঐ সময়ে ঘর ছেড়ে কোথাও বার হন নি তিনি। মাত্র কয়েক

মিনিটের জন্য দিনে একবার দরজা খুলতেন, তখন ভক্তেরা কিছু খাবার দিতেন। তারও যে প্রয়োজন তা মনে হোত না। একবার ১২ দিন দরজা খোলেন নি, কিছু খান নি, আপনার অনুভবের আনন্দে ডুবে ছিলেন। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল (Aristotle) তাঁর Ethics গ্রন্থে প্রশ্ন তুলেছেন.—সবচেয়ে নীতিজ্ঞ কে, শ্রেষ্ঠ কে? উত্তর দিয়েছেন. God-like (ঈশ্বরের ন্যায়) যিনি। ঈশ্বর কি করেন? বলেছেন.—তিনি Self-contemplation-এ (আত্মধ্যানে), নিজের স্বরূপে নিজে ডুবে থাকেন।

শ্রীগৌরহরি, প্রভু জগদ্বন্ধুহরি গভীর নীরবতার মধ্যে আত্মার আনন্দে ডুবে থাকতেন। বন্ধু হরি যখন ঘরে বন্ধ ছিলেন তখন সেখানে (শ্রীঅঙ্গনে, ফরিদপুর) সকল সময় গভীর নীরবতা বিরাজ করত, পশুপাখী ডাকত না। তাঁরা এই সময় অত্যন্ত নিকটের জনকেও চিনতে পারতেন না। কি গাঢ় তন্ময়তা! চিত্তের গভীরে যে নীরব ভূমি আছে, সেখানে পৌঁছালে তাঁকে ধরা যায়।

শ্রীভগবানের মধ্যে যে আনন্দময়ী বা হ্লাদিনী শক্তি আছে, শ্রীরাধা ও গোপীগণ তাঁরই প্রকাশ-মূর্তি। আপন শক্তিকে পৃথক করে আনন্দ আস্বাদন করেছেন। ইহাই তাঁর লীলা।

ব্রহ্মাদি দেবগণ আরও বল্লেন—পূর্বে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, হংস, রামচন্দ্র, পরশুরাম, বামদেব প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হয়ে ত্রিভুবন রক্ষা করে আমাদের অশেষ কল্যাণ করেছ। সেইরূপ এক্ষণে পৃথিবীর ভার লাঘব কর, দুর্জনদের নাশ করে সজ্জনদের রক্ষা কর। গীতায় বলেছ—তুমি যুগে যুগে এস (সম্ভবামি যুগে যুগে), তা মিথ্যা নয় কখনই। আবার গীতার বিভূতি যোগে বলেছ, যেখানে যা কিছু মহৎ, যা কিছু বিরাট তা তোমার প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণরূপে তোমার পূর্ণ প্রকাশ। আর্যঋষির দৃষ্টিতে "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং"। শৌর্য-পরাক্রমে বড় রাবণ, কংস প্রভৃতি; ব্রহ্মশক্তিতে সাধনায় বড় ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মিকী; বীর্যবত্তা-তপস্যায় বড় ভীষ্ম, জনক, যুধিষ্ঠির। ভক্তিতে বড় নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অম্বরীশ। পূর্বে মহৎ যাঁরা তাঁদের চরিত্রই

ছিল সকলের আদর্শ, তাঁদের নিয়েই গ্রন্থ লেখা হোত। ফলে ব্যক্তি, সমাজের কল্যাণ সাধিত হোত। মহৎ চরিত্রের ভাবনাই উন্নতি ঘটাত, সকলকে বড় করে তুলতো।

আর একটি চরিত্র সকলকে সর্ববিষয়ে অতিক্রম করে। সকলের পরাক্রম, মহত্ত্ব, বিরাটত্ব যাঁর নিকট ম্লান, তপস্বীরা যাঁর তপস্যা করে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন, রাজর্ষিরা যাঁর গুণে মুগ্ধ, ভক্তেরা যাঁর শ্রীচরণারবিন্দ অর্চনা করে ধন্য হয়েছেন, তিনি আর কেউ না তুমি ছাড়া, বলতে বা শুনতে গেলে তোমার কথাই বলতে হয়—'কৃষ্ণ কথাই কথা, আর সব বৃথা ব্যথা'। হে যদুকুল শ্রেষ্ঠ! আমরা তোমায় স্তব করে ধন্য, আমরা তোমায় প্রণাম করি।

অতঃপর ব্রহ্মাদি দেবগণ মাতা দেবকীকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, যিনি বহুবার অংশাবতারে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের অশেষ কল্যাণ করেছেন, সেই পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান আপনার গর্ভে এসেছেন। কংস আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন। তার থেকে আপনাদের কোন বিপদ বা ভয়ের কারণ নেই। কংস যদুবংশীয়গণকে প্রভূত নিপীড়ন করেছে। আপনার এই পুত্র তাঁদের রক্ষক হবেন। সুতরাং আপনারা সর্বপ্রকারে নির্ভয় হোন।

দেবতাগণ এই প্রকারে অপ্রাকৃত পরমপুরুষের স্তব ও প্রণাম করতঃ ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে অগ্রবর্তী করে সুরলোকে প্রস্থান করলেন।

(১০)

"অথ সর্বগুণোপেত কালঃ পরমশোভনঃ"—ভাঃ ১০/৩/১

বিশ্বপ্রকৃতির যিনি পরমপ্রভু, পরমেশ্বর তাঁর শুভাগমন ঘটছে। প্রকৃতির ভাগ্যে এমন সুদিন কদাচিৎ উপস্থিত হয়। তাই প্রকৃতিদেবী মেতে উঠছেন পরমপ্রভুর সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করতে। ভগবানের আবির্ভাবকাল সর্বগুণের আধার স্বরূপ হয়েছে। কোন বিশেষ একটি কাল অন্যান্য কালের গুণ বহন করে না। যেমন গ্রীষ্মের গুণ শীতের গুণ বর্ষায় নেই, শরতের গুণ হেমন্তে নেই। সকালের গুণ সন্ধ্যায়

থাকে না, রাতের গুণ দিনে যায় হারিয়ে। কেন ফুল সকালে ফোটে সন্ধ্যায় ম্লান হয়ে যায়? আবার সন্ধ্যায় যে ফুল ফোটে, সকালে সে যায় শুকিয়ে। সত্য-ত্রেতা যুগের গুণ দ্বাপর কলিতে নেই। সত্য-ত্রেতায় ধ্যান-যজ্ঞ যে ফল দিত, কলিযুগে তা দেয় না। যুগে যুগে-ঋতুতে ঋতুতে, দিনে রাতে এই যে বিভিন্নতা, গুণের বিচিত্রতা তা কখনই দূর হবার নয়। কিন্তু আজ শ্রীভগবানের শুভ আগমন জেনে সর্ব যুগের, সকল ঋতুর, সকল কালের যা কিছু গুণ যা কিছু সম্পদ তার একত্র সমাবেশ দেখা যাচ্ছে। বিশ্বপ্রপঞ্চের নিয়ন্তা যিনি, সর্বময় প্রভু যিনি, তিনি আসছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে প্রকৃতি দেবী, সকল সম্পদ যা তার ভাণ্ডারে ছিল, আছে ও ভবিষ্যতে থাকতে পারে, সবই যেন আজ উপস্থিত করেছেন।

আকাশের গ্রহ নক্ষত্র তারকারাজি প্রশান্তভাব ধারণ করেছে (শান্তর্ক্ষগ্রহতারকম্)। ভাদ্র মাসের শুভ অষ্টমী তিথি। দিনটি সকল কল্যাণগুণ-সমন্বিত, অথচ পরম রমণীয়। চাঁদের সঙ্গে রোহিনী নক্ষত্রের মিলন সহসা ঘটে না, আজ ঘটেছে তাঁর আবির্ভাব উপলক্ষে, ইহা অত্যন্ত কৌশল করে বলেছেন (অজনজন্মর্ক্ষম)। শ্রীকৃষ্ণের পরমশুভ জন্মজয়ন্তী। ক্ষিতি সাজিয়েছেন আপনাকে, পুর-গ্রাম-মাঠ সবই মঙ্গলময় রূপ পরিগ্রহ করেছে। সজ্জন ব্যক্তিরা অজানা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আপন আপন গৃহঘর-দুয়ার সজ্জিত করেছেন, পূর্ণ কুম্ভ ও কদলী বৃক্ষ স্থাপন করেছেন। উৎসবের আনন্দে অন্তর ভরে গেছে, কেন এই আনন্দ জানেন না।

ভাদ্র মাস, নদীর জল সচরাচর ঘোলা, অপরিষ্কার থাকে। নদীর জল আজ স্বচ্ছ, নির্মল ও প্রসন্ন (নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা)। হ্রদ-সরোবরগুলি প্রস্ফুটিত পদ্মে ভরে গেছে, জল আর দেখা যাচ্ছে না (হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ)। কাননে, বনে সকলকালের সকল ঋতুর অপর্যাপ্ত ফুল ফুটে উঠেছে। ফুলের ভারে গাছগুলি নত হয়ে পড়েছে, চারিদিক সুগন্ধে আমোদিত। ফুল গাছগুলির যেন ইচ্ছা জীবনে যত ফুল ফোটাবার, সব ফুটিয়ে বিশ্বেশ্বরের সম্বর্দ্ধনা করে

চলে যাই। পক্ষিকুলের কুজনে ও ভ্রমরের গুঞ্জনে বনরাজি মুখরিত। দিক্‌সকল প্রসন্নভাব ধারণ করেছে। সুখস্পর্শ ও সুগন্ধিযুক্ত বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হচ্ছে।

অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণগণের গৃহে যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নি একেবারে নিভে যায় না। যজ্ঞকালে মন্ত্রের উচ্চারণের সঙ্গে উহা জ্বলে ওঠে। আজ সেই প্রশান্ত হোমাগ্নি আপনা হতে প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে (অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত) যজ্ঞেশ্বরগণেরও ঈশ্বর যিনি, তাঁকে স্বাগত জানাতে। আকাশে প্রশান্ত গ্রহ, উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি শোভা পাচ্ছে।

সাধুগণ ও দেবগণের অন্তর আজ সুপ্রসন্ন। আনন্দের কারণ সাধুরা সকলে হয়তো জানেন না। দেবগণ জেনেছেন, স্বর্গে দুন্দুভি-সকল বেজে উঠেছে। গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ শ্রীভগবানের গুণকীর্তনে মত্ত হয়েছেন, সিদ্ধচারণগণ স্তবস্তুতি করছেন এবং বিদ্যাধরীরা ও অপ্সরাগণ আনন্দে নৃত্য করছে পরমপুরুষের শুভাগমনের আনন্দে। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রে মুনিগণ ও দেবগণ আনন্দোৎফুল্ল অন্তরে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন (মুমচুর্মুনয়ো দেবাঃ সুমনাংসি মুদান্বিতাঃ)। মেঘসমূহ আজ প্রভূত উল্লাস ও গর্বভরে মৃদুমন্দ গর্জন করতে করতে চলেছে সমুদ্রের অভিমুখে। মেঘের গর্বের কারণ আজ যিনি আসছেন তাঁর গায়ের রং-এর কথা বলতে গেলে মেঘের কথা বলতে হবে, তিনি যে মেঘের বরণ ঠাকুর। মেঘ সমুদ্রের কাছে ঋণী, সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে মেঘ হয়। সমুদ্রের কন্যা লক্ষ্মী, আজ যিনি আসছেন তিনি লক্ষ্মীপতি, সমুদ্রের জামাতা। সমুদ্র হয়তো এই শুভ খবর এখনও পায় নি, তাই মেঘ উল্লাসভরে চলেছে খবর দিতে। বিশ্বপ্রকৃতির সকলই যখন আনন্দপূর্ণ তখন নিরানন্দ কি কেউ নেই? আছে, সাধু-দেবতা-বিষ্ণু-বিদ্বেষী যারা, আসুরিক প্রকৃতি যাদের, তারাই কেবল নিরানন্দ। এক অজানা আশংকা ও অকারণ ভীতি তাদের চিত্ত অধিকার করেছে।

অষ্টমী তিথির মধ্যরাত্রি, চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। জন্ম-মৃত্যু

রোগ শোক, বৃদ্ধি পরিণামের অতীত যিনি, সেই পরমপুরুষের জন্মকাল উপস্থিত। পূর্বাকাশে যেমন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, ভগবান শ্রীহরি সেইরূপ মূর্তিমতী দেবীপ্রতিমা দেবকীদেবীকে আশ্রয় করিয়া পূর্ণস্বরূপে আবির্ভূত হলেন।

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥

সকলের প্রাণের ঠাকুর যিনি, তিনি বসুদেব-দেবকীর নয়ন সম্মুখে। অবাক বিস্ময়ে দেখছেন তাঁরা সেই পরম অদ্ভুত বালককে। বালক মূর্তি অথচ চতুর্ভূজ, চারি হস্তে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, গদা-চক্র উদ্যত করে রয়েছেন (চতুর্ভূজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্), নয়ন দুটি পদ্মসদৃশ (অম্বুজেক্ষণং) সুন্দর, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন (শ্রীবৎসলক্ষ্মং), গলদেশে অতি রমণীয় কৌস্তুভমণি (গলশোভিতকৌস্তুভং), পরিধানে পীতবসন (পীতাম্বরং), নব ঘন মেঘের ন্যায় বর্ণসৌন্দর্য (সান্দ্রপয়োদ-সৌভগং), মহামূল্যবান বৈদূর্যমণিময় কিরীট ও কুণ্ডলের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত কেশরাশি (মহার্হবৈদূর্যকিরীটকুণ্ডলত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রঃ কুন্তলম্) এবং অতি উজ্জ্বল চন্দ্রহার, কেয়ূর ও কঙ্কণাদি অলঙ্কারে পরিশোভিত (উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভিবিরোচমানং) দেবকী হতে আবির্ভূত সেই অদ্ভুত বালককে বসুদেব দেখলেন। শুদ্ধসত্ত্ব-গুণের মূর্তি বসুদেব। সাক্ষাৎ শ্রীহরি এসেছেন পুত্র হয়ে। বসুদেবের জন্মকালে দেবগণ স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়েছিলেন, তাই এক নাম আনকদুন্দুভি, আজ ভগবানের জন্মদাতা বলে ঐ নাম সার্থক হল।

শ্রীভগবান এসেছেন পুত্র হয়ে, তাই অন্তর বাৎসল্য স্নেহে আপ্লুত। এসেছেন নারায়ণ মূর্তিতে, তাই জেগেছে পরম বিস্ময়। আনন্দের আতিশয্যে মন চাইছে কাঙ্গাল-গরীব-ব্রাহ্মণদের সব উজাড় করে দান করতে। কারাগারে বন্দী বলে তা পারলেন না, তাই মনে মনে ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে দশ সহস্র গাভী দান করলেন। ঐ বালকের অঙ্গপ্রভায় সূতিকাগৃত আলোকিত হয়ে উঠল, (সূতিকাগৃহং বিরোচয়ন্তম্) এবং তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে ঐ আলোক চারিদিকে

ছড়িয়ে পড়ে নি। শুদ্ধমতি বসুদেব তাঁর স্বরূপ প্রকাশক মূর্তি দর্শনে নির্ভয় হলেন (গতভীঃ) এবং তাঁকে পরমপুরুষ বলে অবগত হয়ে (পরং পুরুষং অবধার্য্য) নতমস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করলেন।

বসুদেব বল্লেন, আমি জেনেছি—আপনি সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত পুরুষোত্তম (সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ), কৃপা করে আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছেন (বিদিতোঽসি ভবান্)। ভগবৎ-স্বরূপ নিয়েই এসেছেন। যোগমায়ার আবরণে ভগবত্তা ঢেকে এলে চেনা যেত না। আপনিই প্রকৃত পুরুষ, আর সকলেই প্রকৃতির অন্তর্গত। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর লিখেছেন,—"ইহলোকে বা পরলোকে শ্রীকৃষ্ণ বই অন্য কেহই পুরুষ নাই। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব ও সর্বদেবগণ ও সর্বমুনিঋষিগণ বা অন্য যাহাদিগকে পুরুষ আকারে দেখা যায়, তাহারা সকলেই প্রকৃতি বা স্ত্রীজাতি। ইহা দিব্য জ্ঞান হইলেই জানিতে পারা যায়।"

—আপনি স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দময় ও সর্বজ্ঞ, সকলের বুদ্ধির মূলে আপনি (কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ববুদ্ধিদৃক্)! অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার আপনি। আপনাকে যাঁরা লাভ করে তাঁদের, আনন্দের কথা কি বলব, যাঁরা আপনার স্মরণ, ধ্যান ও নামাশ্রয় করেন, তাঁদের জীবনের সকল দুঃখ দূরে যায়, আনন্দে পূর্ণ হয় তাঁদের সত্তাটি। সকলের বুদ্ধির পরিচালনা আপনিই করেন। মানুষ অহঙ্কারে বিমূঢ় হয়ে তা জানতে পারে না এবং নিজেকেই কর্তা মনে করে (অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে—গীতা)। আপনার স্বরূপ অবগত হলে ঐ ভ্রম আর থাকে না। আমাদের বুদ্ধির যে চালক তিনি, তা গায়ত্রী মন্ত্রে প্রকাশিত হয়েছেন (ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ)।

—এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব আপনি নিজ মায়াশক্তির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন (স্বপ্রকৃত্যা সৃষ্ট্বা)। আবার অন্তর্যামীরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হয়েও পূর্বে যেমন সর্বকারণের কারণ, সর্বশক্তি ও সর্বাত্মা ছিলেন, সেইরূপই থাকেন, এজন্য প্রবিষ্টের মত মনে হয় (প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে)। আপনি বিশ্বের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ। কুম্ভকার মাটির

কলসী তৈয়ার করে, সেই হেতু সে উহার নিমিত্ত কারণ। কিন্তু মাটি সংগ্রহ করে বাইরে থেকে। ভগবান যে বিশ্ব সৃষ্টি করেন, সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু তাঁর নিজের মধ্যেই রয়েছে, বাইরে থেকে আনতে হয় না, তাই তিনি উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ উভয়ই। কুম্ভকার কলসীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। ভগবান এই জগৎ সৃষ্টি করে তার মধ্যে প্রবেশ করেন (তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ)। তাঁর কৃপা ব্যতিরেকে বুদ্ধি দ্বারা জানা যায় না কিভাবে তিনি অণু-পরমাণুতে প্রবেশ করেন।

— আপনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে অবস্থিত হয়েও ইন্দ্রিয়াতীত (গ্রাহ্যৈঃ গুণৈঃ সন্ অপি অনাবৃতত্বাৎ)। আপনি অনন্তস্বরূপ, এজন্য রূপাদির জ্ঞান দ্বারা যার স্বরূপ অনুমেয়, সেই ইন্দ্রিয়স্বরূপের বিষয়ীভূত হন না। স্থির জলে চন্দ্র প্রতিবিম্বিত হয়, মনে হয় প্রকৃত চন্দ্রই উহা, ঐ জলে চন্দ্রকে ধরতে গেলে চন্দ্র হারিয়ে যায়, তাকে পাওয়া যায় না। সেইরূপ ইন্দ্রিয় বস্তুতে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায় না। আপনি অসীম, সব কিছুই আপনার মধ্যে, সেজন্য আপনার বাহির নেই। পূর্ণত্ব হেতু আপনার অন্তরও নেই। আপনি সৃষ্টির মধ্যে যেমন আছেন, সৃষ্টির অতীত হয়ে পূর্ণরূপেও আছেন। যে ব্যক্তি পদার্থাদিকে আত্মা হতে পৃথক সৎবস্তু মনে করে, সে বেদকে অগ্রাহ্য করে বলে অজ্ঞ। সর্ব-কালের যা কিছু সত্য, তা বেদে আছে। জীব অন্ন অর্থাৎ খাদ্য ছাড়া বাঁচতে পারে না, এই সত্য কি বেদে আছে? বেদ বলবেন, হাঁ আছে, "অন্নং ব্রহ্ম"। সুতরাং বেদকে অস্বীকার করলে সত্যকে অস্বীকার করা হয়। সেই ব্যক্তির অভিমত অর্থশূন্য বাক্য ছাড়া আর কিছুই নয়। পদার্থ সকলই নশ্বর ও বিনাশশীল, এবং যথার্থ সত্তা না থাকায় সৎবস্তুর মধ্যে গণ্য হয় না।

—ত্রিগুণাতীত হয়েও সৃষ্টি ও পালনের জন্য আপনি স্বীয় মায়া-শক্তিকে আশ্রয় করেন। সৃষ্টির জন্য রজগুণান্বিত রক্তবর্ণ ব্রহ্মা, পালনের জন্য শুক্লবর্ণ সত্ত্বগুণান্বিত বিষ্ণু এবং সংহারের জন্য কৃষ্ণবর্ণ তমোগুণান্বিত রুদ্র রূপ ধারণ করেন। নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা

আপনি। সর্ব ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব আপনার। মূঢ় ব্যক্তিগণ আপনার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে নিজেকে কর্তা মনে করে ও আপনাকে অগ্রাহ্য করে দুরতিক্রম্য সংসার-দুঃখ ভোগ করে। সকলই আপনার মধ্যে এবং আপনি সকলের মধ্যে—এই দর্শনই যথার্থ দর্শন। গীতায় ভগবান বলেছেন—"যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি", সেই যথার্থ দর্শকের বিনাশ নেই।

—জগৎ রক্ষার জন্য আপনার অবতার (অস্য লোকস্য বিবীক্ষয়ুঃ)। সেই উদ্দেশ্যেই আপনি আমার গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। রাজরূপধারী অসংখ্য অসুরপতিগণ (রাজন্যসংজ্ঞাসুরকোটিযুথপৈঃ) কর্তৃক পরিচালিত সৈন্যসমূহকে সংহার করে আপনি ধরার ভার লাঘব করবেন। এইভাবে ভগবৎতত্ত্বের অনুভূতিপূর্ণ মধুর স্তব করলেন শুদ্ধজ্ঞানের মূর্তি বসুদেব। তখন তাঁর অন্তরে উদয় হল বাৎসল্য স্নেহ নারায়ণরূপী পুত্রের জন্য। তত্ত্বের অনুভূতি তখন অন্তর থেকে সরে গেছে। ভাবছেন তিনি, কি করে রক্ষা করবেন পুত্ররূপী ভগবানকে। তাই বলছেন, আমাদের ঘরে তোমার জন্ম হবে জেনে খলস্বভাব কংস তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। এখুনি রক্ষীগণের মুখে তোমার জন্মের কথা জানতে পাবে কংস, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উপস্থিত হবে তোমায় বধ করার জন্য। এই বলে নীরব হলেন বসুদেব। অন্তরে তাঁর ভাবনা হচ্ছে, কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ আমি তখন কি করব?

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে বল্লেন,—বসুদেব নীরব হলে মাতা দেবকী দেবী পরমপুরুষ-লক্ষণাক্রান্ত পুত্রকে দর্শন করে যারপরনাই বিস্মিত হলেন এবং সুমধুর স্তব করলেন। দেবকী মাতা বলছেন,—বেদসমূহ আপনার যে স্বরূপকে সর্বকারণের কারণ, অব্যক্ত, নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, সত্তামাত্র ও অনাবৃত জ্যোতি-স্বরূপ ব্রহ্ম বলে ঘোষণা করে থাকেন, সেই ব্রহ্মই আপনি। আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রদীপ স্বরূপ আপনি (অধ্যাত্মদীপঃ)। আপনিই সাক্ষাৎ বিষ্ণু। জ্ঞানীগণের নিকট পরমব্রহ্ম, যোগিগণের

নিকট পরমাত্মা এবং ভক্তগণের ভগবান আপনিই বিশ্বপ্রকৃতির একমাত্র আশ্রয়। প্রলয়কালে পঞ্চমহাভূত তৎকারণ পঞ্চতন্মাত্রে লয়প্রাপ্ত হয়। তন্মাত্র অহঙ্কারতত্ত্বে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হয়। আপনি প্রকৃতির আশ্রয়, এজন্য আপনিই কেবল বর্তমান থাকেন। প্রকৃতি অব্যক্ত অবস্থা হতে পুনরায় আপনা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। আপনি প্রকৃতির প্রবর্তক বন্ধু (অব্যক্তবন্ধো)। বেদ বলেন, কাল আপনারই একটি শক্তি। যে কাল নিমেষ হতে আরম্ভ করে বৎসর পর্যন্ত গণিত এবং পুনঃ পুনঃ বৎসরের আবর্তনে দ্বিপরার্দ্ধরূপ বৃহৎ কালে প্রসারিত, উহা মূলতঃ বিশ্বের পরিবর্তনকারী আপনার একটি শক্তি। কালের শক্তিতেই বিশ্বের পরিণাম ও পরিবর্তন ঘটে। সংসারের সব কিছুই কাল গ্রাস করে। বিশ্বে কিছুই যে স্থায়ী হয় না, তা আপনার এই শক্তি, কালের জন্য। আপনি সকলের ঈশ্বর, সবকিছুর নিয়ন্তা এবং মঙ্গলকারী। আমরা আপনার শরণ নিলাম। মরণশীল জীব সদাই মৃত্যুরূপ কালসর্প ভয়ে ভীত হয়ে নানাস্থানে আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করে, কিন্তু কোথাও অভয় স্থান পায় না। যদি কখনও কোন জীব আপনার পাদপদ্মের আশ্রয় পায়, তবে সেই জীব ভয়শূন্য হয়ে স্বস্তিতে বিশ্রামলাভ করতে পারে। মৃত্যু আপনার ভয়ে ভীত।

—আপনি অনুগত জনের পরমাশ্রয়, বন্ধু ও ত্রাণকারী। আপনার শরণাগত আমাদের ভয় দূর করুন। আপনার এই ঐশ্বরীক রূপ ভক্তগণের ধ্যানের বস্তু। উহা ভোগী জীবের গোচরীভূত করবেন না। দেবকীমাতার অন্তরে ভগবানরূপী পুত্রের তরে বাৎসল্য স্নেহের উদয় হল। কংস হতে পুত্রকে রক্ষার জন্য ভাবিত হয়ে বলছেন,—তোমার ঐ জ্যোতির্ময় ঐশ্বরীক রূপ সংবরণ কর। দুরাত্মা কংস এখুনি এসে পড়বে। তখন কোথায় লুকাব তোমাকে? বাৎসল্যের মধ্যে আবার ভগবানের ঐশ্বর্যের বোধ উঁকি মারছে, একবার পুত্র-স্নেহ, একবার ঐশ্বর্য জ্ঞানের দোলায় দোদুল্যমান মাতা দেবকীর অন্তর। ঐশ্বর্যজ্ঞানে বলছেন, আপনি জগতের রক্ষাকর্তা, আপনি

পরমপুরুষ, প্রলয়কালে নিখিল বিশ্বকে নিজ দেহে স্থান দেন। আবার পুত্রকে রক্ষার্থ বলছেন, আমার কংস হতে ভীতি দূর করুন। আমি নারী, অস্থির চিত্ত আমার। কংসের কারণে তোমার জন্য আমি খুবই ভয়ার্ত হয়েছি। ঐশ্বর্যজ্ঞানে বলছেন, আপনি জগদাশ্রয় হয়েও আমার গর্ভে জন্মেছেন, এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। আবার পুত্রস্নেহের উদ্দীপনায় বলছেন, কংস হতে তোমাকে কি করে রক্ষা করব, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী তোমার ঐ অলৌকিক উজ্জ্বলরূপ সংবরণ কর, আবৃত কর। অন্তরের তলদেশে মায়ের ভাবনা, তাহলে হয়তো পুত্রকে লুকিয়ে ফেলতে পারবেন, রক্ষীগণ ও কংসের চক্ষের আড়াল করা যাবে।

এইরূপ মধুর স্তবের পর মাতা নীরব হলেন। তখন পুত্ররূপী ভগবান নারায়ণ বল্লেন,—মাতঃ! পূর্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুমি পৃশ্নি নামে খ্যাত ছিলে, বসুদেব তখন পবিত্রচরিত্র সুতপা নামে প্রজাপতি ছিলেন। তখন সৃষ্টির বৃদ্ধির জন্য ব্রহ্মা তোমাদিগকে প্রজা সৃষ্টি অর্থাৎ সন্তানের জন্ম দিতে আদেশ করেন। তোমরা চিন্তা করলে, কেবল সন্তানের জনক-জননী হয়ে লাভ নেই। কেমন সন্তান হলে পিতামাতার সুখ হতে পারে? সন্তান হলেই পিতামাতার সুখ হয়, তা নয়। পুত্র যদি বিকলাঙ্গ হয়, বুদ্ধিহীন হয়, রুগ্ন হয়, পিতামাতার অবাধ্য হয়, যদি অসৎচরিত্র হয়, লোকসমাজে নিন্দনীয় কর্ম করে বেড়ায়, পিতামাতার প্রতি দুর্ব্যবহার করে, তবে তা পিতামাতার অশেষ দুঃখের কারণ হয়। সেরূপ পুত্র কোন পিতামাতার কাম্য হতে পারে না। আর সন্তান যদি স্বাস্থ্যবান হয়, রূপবান হয়, খুব গুণবান হয়, বিদ্যা-বুদ্ধিতে খুব উজ্জ্বল হয়, সৎচরিত্র হয়, পিতামাতার বাধ্য ও সেবা-যত্ন-পরায়ণ হয়, সকলের মুখে তার সুখ্যাতি শোনা যায়, এইরূপ সন্তান হলে পিতামাতার খুব সুখ হয়, কোন দুঃখ থাকে না। কিন্তু এরূপ গুণের সন্তানের যদি অকালমৃত্যু ঘটে, তবে তার থেকে গুরুতর দুঃখ আর কিছু নেই, পিতামাতার বক্ষে তা শেল বিদ্ধ করে, নিজে মরে পিতামাতাকে মেরে যায়। তবে তো কোন সন্তান

না হওয়াই ভাল। অথচ ব্রহ্মার আদেশ সৃষ্টির বিস্তারের জন্য সন্তানের জন্ম দিতে হবে।

এইপ্রকার ভাবনা করে তোমরা তখন স্থির করেছিলে, এক ভগবানকে যদি পুত্ররূপে পাই, তবে কোন প্রকারেই আর দুঃখ স্পর্শ করতে পারবে না, অপার সুখশান্তি লাভ হবে। তখন আমাকে পুত্ররূপে পাবার জন্য সংযতেন্দ্রিয় হয়ে তোমরা অতি কঠোর, দুশ্চর তপস্যায় ব্রতী হয়েছিলে (সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তেপাথে পরমং তপঃ)। তৎকালে তোমরা রৌদ্র-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম, শিশির-বায়ু প্রভৃতি কালের প্রকোপ সহ্য করেছিলে, প্রাণায়াম দ্বারা মনের সকল মালিন্য দূর করে (শ্বাসরোধবিনির্ধূত মনমলৌ), বৃক্ষের গলিত পত্র ও বায়ু মাত্র ভক্ষণ করে অভিলষিত বরলাভের জন্য আমার আরাধনা করেছিলে। হে নিষ্পাপে। তখন তপস্যা-শ্রদ্ধা-ভক্তির দ্বারা (তপস্যা শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা চ) মদ্‌গতচিত্ত হয়ে তোমরা দেব-পরিমাণে দ্বাদশ সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত করেছিলে। তোমাদের তপস্যায় অত্যন্ত তুষ্ট হয়ে তোমাদের কামনা পূরণার্থ অভিলষিত বর দানের জন্য (যুবয়োঃ কামদিৎসয়া) তোমাদের নিকট আবির্ভূত হলাম। আমাকে পুত্ররূপে লাভ করাই তোমাদের একমাত্র কাম্য ছিল। তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে যখন বর প্রার্থনা করতে বল্লাম, তখন আমার এই ঐশ্বরীয় রূপ দর্শন করে অত্যন্ত সম্ভ্রমবশে তোমাদের সংকোচ উপস্থিত হল। "তোমাকে পুত্ররূপে চাই", একথা মনে থাকলেও কিছুতেই তোমরা মুখ ফুটে বলতে পারলে না। বহুবার জিজ্ঞাসা ও বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করেও তোমাদের কোন উত্তর না পেয়ে আমি বল্লাম, তবে আমি চলে যাই। তখন তোমরা অতি কষ্টে সংকোচ কাটিয়ে কোনরূপে বলেছিলে—'আপনার মত একটি পুত্র সন্তান চাই' (মাদৃশো বাং বৃতঃ সুতঃ)।

তোমরা পতি-পত্নী একত্র বাস করেও কোন গ্রাম্যসুখ ভোগ কর নি (অজুষ্টগ্রাম্যবিষয়ৌ)। তোমাদের কোন সন্তান ছিল না (অনপত্যৌ) এবং পারলৌকিক সুখের চিন্তাও তোমরা ত্যাগ

করেছিলে। তোমরা আমাকে পুত্ররূপে পাবার বাসনায় মুগ্ধ হয়ে মোক্ষও প্রার্থনা করনি (অপবর্গম্ ন বব্রাথে)। তোমরা আমার পুত্রলাভের বর প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণমনোরথ হয়েছিলে। তোমাদের অভিলাষ পূরণ করব অঙ্গীকার করে আমি চলে গেলাম। পরে চিন্তা করে দেখলাম, সর্বরকম, গুণে—চরিত্র ও উদারতায় (শীলৌদার্য্যগুণৈঃ) আমার মত কেউ নেই, তাই তোমাদের সেই জন্মে পুত্র হয়ে এসে-ছিলাম, তখন পৃশ্নি-পুত্র রূপে খ্যাত হই।

পরজন্মে তুমি দেবমাতা অদিতি ও বসুদেব কশ্যপরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলে। তখন পুনরায় আমি তোমাদের পুত্র হয়ে আসি এবং খর্বাকৃতি হেতু "বামন" ও "উপেন্দ্র" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করি। ঐ দুই জন্মে আমি এই "নারায়ণ" স্বরূপে জন্মাই নি, মনুষ্যাকৃতিতেই এসেছিলাম। এখন তোমাদের তৃতীয় জন্ম। যে স্বরূপে তোমাদের বরদান করেছিলাম সেই "নারায়ণ" স্বরূপে এবার পুত্র হয়ে এসেছি। অতএব, হে সাধ্বি! আমার বরদান এতদিনে সত্য হল (সত্যং মে ব্যাহৃতং সতি)। তোমাদের পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আমার এই রূপ প্রদর্শন করলাম। তোমরা পুত্রভাবে অথবা ব্রহ্মভাবে (পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন বা) নিরন্তর আমাকে চিন্তা করে আমাতে আসক্তচিত্ত হয়ে আমার পরমগতি লাভ করবে (যাস্যেথে মদগতিং পরাম্)।

ভগবান আরও বল্লেন, যদি আমার কারণে কংস হতে তোমাদের ভীতির সঞ্চার হয়ে থাকে, তবে আমাকে গোকুলে নন্দপত্নী যশোদার কাছে রেখে এস এবং যশোদার সদ্য-জাত কন্যা, আমার শক্তিরূপিনী মহামায়াকে এখানে শীঘ্র নিয়ে এস (মন্মায়াম্ আনয় আশু ত্বং যশোদাগর্ভসম্ভবাম্)।

শ্রীভগবান এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বসুদেব-দেবকীর বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখেই প্রাকৃত মনুষ্য শিশুর রূপ ধারণ করলেন (সদ্যো বভূব প্রকৃতঃ শিশুঃ)। 'প্রাকৃত' অর্থাৎ প্রকৃতির বিকারজ, অথবা প্রকৃত, (real) দ্বিভুজ নরশিশুর রূপ ধারণ করলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত

জানিয়েছেন, "নর বপু তাঁহার স্বরূপ"। সকলেরই দুটি রূপ থাকতে পারে, একটা পোষাকী রূপ সেজেগুজে বাইরে যাবার জন্য, অপরটি অন্দর মহলের রূপ কোন সাজগোজ সেখানে থাকে না। শ্রীভগবানের একটা ঐশ্বর্যময় রূপ, বৈকুণ্ঠের রূপ। আর একটি অন্দর মহলের রূপ গোলোকের রূপ। ঐশ্বর্যময় নারায়ণ স্বরূপে সৃষ্টি-পালন-লয় করেন। মাধুর্যময় শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে প্রেমমধুর লীলা বিস্তার করে আনন্দ আস্বাদন করেন। এক্ষণে মাধুর্যময় স্বরূপ প্রকট করে গোকুল-বৃন্দাবনে চল্লেন। সেখানে অতি আপন প্রিয়জনদের সঙ্গে, যেমন বাৎসল্যময়ী মা যশোদা-রোহিনী, শ্রীদাম-সুদাম-সুবল-মধুমঙ্গল সখাদের এবং শ্রীরাধাদি ব্রজগোপীগণের সঙ্গে প্রেমমধুর লীলা বিস্তার করতঃ আনন্দ আস্বাদন করবেন।

(১১)

শ্রীভগবানের লীলাশক্তি যোগমায়া। তিনি তাঁর লীলার সহায়-কারিণী, ব্যবস্থাকারিণী এবং অঘটন-ঘটন-পটিয়সী অর্থাৎ যত অঘটন, অসম্ভব হোক তা সবই তিনি সম্ভব করে তুলতে সমর্থা। পূর্বের ব্যবস্থা মত তিনি মা যশোদার গর্ভ হতে জন্ম নিয়েছেন। শ্রীচণ্ডী গ্রন্থেও দেখতে পাওয়া যায় যশোদার গর্ভে তাঁর আবির্ভাবের কথা—"নন্দ গোপ গৃহে জাতা যশোদা গর্ভসম্ভবা"। যোগমায়ার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মথুরার পুরবাসিগণ, দ্বারপাল, নন্দ-যশোদাদি গোকুলবাসী, সকল জীবের ইন্দ্রিয়বৃত্তি অপহৃত হল। নন্দ-যশোদা সকলেই গভীর নিদ্রায় (মোহনিদ্রায়) অভিভূত হলেন। মা যশোদার সন্তান হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞান ছিল, পুত্র কি কন্যা, কি হয়েছে তা কেউ জানতে পারলেন না নন্দালয়ে।

অনন্তর শ্রীভগবান কর্তৃক আদিষ্ট বসুদেব পুত্রকে নিয়ে কারাগার কক্ষ হতে বহির্গমনের ইচ্ছা করলেন। কংসের প্রাসাদের দ্বারসমূহ বৃহৎ অর্গলের দ্বারা অবরুদ্ধ ও দুরতিক্রম্য ছিল। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অন্ধকাররাশি দূরে যায়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে

বসুদেবের গমনের উদ্যোগেই নিজ পায়ের শৃঙ্খল, কারাগার ও প্রাসাদের দ্বারসমূহ আপনা হতে খুলে গেল। বসুদেব কৃষ্ণকে নিয়ে প্রাসাদের বাইরে এলেন। কংসের অনুচর কেহ বাইরে না বেরুতে পারে, বসুদেবকে না দেখে ফেলে, এজন্য দেবতাগণ আকাশ হতে প্রবল বর্ষণ শুরু করলেন। তখন অনন্তদেব, কৃষ্ণ বসুদেব যাতে ভিজে না যান সেজন্য, ফণা বিস্তার করে ছত্র ধরার মত সঙ্গে সঙ্গে চললেন। যমুনা পার হয়ে যেতে হবে নন্দালয়ে। বসুদেব যমুনার কূলে এসে দেখলেন, প্রবল বারিবর্ষণে যমুনা বিশাল ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। একে বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রি, যমুনার কূল-কিনারা কিছু দেখা যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ ঝলকে মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিপথ আলোকিত হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের কোলে, তাঁর চরণলাভের জন্য আকাশের সব মেঘ যেন জল হয়ে হয়ে নামতে চায়। যমুনার জল ভয়ানক আবর্তে ও বেগজনিত তরঙ্গমালায় ফেনাময় হয়ে উঠেছে। বসুদেবেয় অন্তর পুত্রের জন্য শঙ্কিত, কি করে পার হবেন এই ভয়ানক আবর্ত ও তরঙ্গ সঙ্কুল যমুনা (ভয়ানকাবর্তশতাকুলা)! ত্রেতা যুগে সীতাপতি রামচন্দ্রকে পথ দিয়েছিলেন সাগর লঙ্কায় যাবার জন্য। নদীর পিত্রালয় পাহাড়, সাগর হচ্ছেন স্বামী। স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর ধর্ম রক্ষা করা, যেন এই ভাবনায় যমুনা অভিন্ন-রাম-স্বরূপ কৃষ্ণকে পথ দিলেন। বসুদেব সম্মুখে পা বাড়ালেই মাটি পান, আশেপাশে গভীর জল। শুদ্ধভক্ত বসুদেব, তিনি যে পথে যাবেন, সেই পথই নিরাপদ পথ। বসুদেব অক্লেশে যমুনা পার হয়ে গেলেন।

নন্দালয়ে উপস্থিত হয়ে বসুদেব দেখলেন, সকলেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। পুত্র কৃষ্ণকে যশোদার শয্যায় রাখলেন এবং যশোদার কন্যাকে কোলে তুলে নিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুভব, যোগমায়ার সঙ্গে একটি পুত্রও জন্মেছিল যশোদার। কারণ একটু পরেই যোগ-মায়ার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে শ্রীভাগবত তাঁকে কৃষ্ণ-অনুজা বলেছেন। পুত্রটি শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন স্বরূপ, বসুদেব কৃষ্ণকে যশোদার নিকট রাখার পর অন্য পুত্রটি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যান।

বসুদেব ফিরে এলেন কারাগার কক্ষে। কন্যাটিকে রাখলেন দেবকীর কোলে। তখন আপনা হতে দ্বার সব রুদ্ধ হয়ে গেল। বসুদেবের পদদ্বয় শৃঙ্খলিত হল। প্রহরীগণ শিশুর ক্রন্দনে জেগে উঠল এবং ছুটল কংসকে জানাতে। প্রহরীর মুখে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানের সংবাদ পেয়ে কংস বিহ্বলচিত্তে, উন্মুক্তকেশে, স্খলিতপদে কারাগারে এসে উপস্থিত হল। দেবকী কংসকে করুণ স্বরে অনুরোধ জানাল, এই শেষ সন্তান কন্যাটিকে আমায় দান কর, আমার অগ্নিতুল্য সকল পুত্রকে তুমি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছ। আমি তোমার ভগিনী ও পুত্রশোকে অতিশয় কাতরা। খলপ্রকৃতি কংস ক্রন্দনরতা দেবকীর বাহুবেষ্টনী হতে কন্যাটিকে ছিনিয়ে নিল এবং সজোরে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করল। বিষ্ণুর কনিষ্ঠা ভগিনী (বিষ্ণোঃ অনুজা সা) সেই কন্যা কংসের হাত হতে উর্দ্ধে উত্থিত হল এবং অষ্টভুজা দেবীরূপে আকাশে প্রকটিতা হলেন। সিদ্ধ চারণ-গন্ধর্ব-অপ্সরা-কিন্নরগণ বহুবিধ পূজার সামগ্রীসহ সেখানে এসে ঐ দেবীর পূজা ও স্তব করলেন। বসুদেব-দেবকী-কংস-প্রহরীরা পরম বিস্ময়ে তা দেখলেন। অতঃপর সেই দেবী কংসকে লক্ষ্য করে বল্লেন, আমাকে বধ করে তোর কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে? তোর পূর্ব শত্রু তোকে বিনাশের জন্য অন্যত্র জন্মেছে।

শ্রীদুর্গা স্বয়ং এসেছেন দেবকীর গর্ভে, তা দেখে কংসের হৃদয়ে ভয়ানক ভীতির সঞ্চার হল। তাহলে তো বসুদেব-দেবকী সাধারণ নন। তাঁদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করাটা ঠিক হয় নি। তা নিজেরেই বিপদ ডেকে আনতে পারে। আমার প্রতি তাঁদের ক্রোধ সর্বনাশ ঘটাতে পারে। যে কোন প্রকারে বসুদেব-দেবকীকে প্রসন্ন করা আশু প্রয়োজন।

কংস তৎক্ষণাৎ বসুদেব-দেবকীর বন্ধন মোচন করে দিল। নিজের অপরাধ ক্ষালনের জন্য অত্যন্ত বিনীতভাবে বল্ল, রাক্ষস যেমন স্বীয় পুত্রকে বধ করে, আমিও সেইরূপ তোমাদের সন্তান বধ করেছি। আমি অতি হীন, নীচ। দয়ামায়াহীন আমাকে সকল আত্মীয় স্বজন

পরিত্যাগ করেছে। ব্রহ্মঘাতীর ন্যায় জীবন্মৃত অবস্থা আমার। পরলোকে আমার কি দুর্গতি হবে তা ভাবলে হৃদকম্প উপস্থিত হয়। এখন দেখছি, দেবগণও মিথ্যা বলেন। দৈববাক্যে বিশ্বাস করেই আমি ভাগিনেয়গণকে বধ করেছি। জীবগণ সকলেই আপনাপন কর্মের অধীন (দৈবাধীনাস্তঃ জন্তবঃ)। তোমাদের পুত্রগণ স্বীয় কর্মফলেই আমার দ্বারা নিহত হয়েছে। তোমাদের অনুরোধ করি তোমরা সেজন্য শোক কোর না। দেহের বিনাশে দেহী আত্মার বিনাশ হয় না। দেহাত্মাভিমানী জীব অজ্ঞানতা বশেই "আমি হত হলাম", "আমি অপরের হন্তা" ইত্যাদি মনে করে। সাধুরা দীনবৎসল, তোমরা আমার গুরুতর অপরাধ সকল ক্ষমা কর। এই বলে কংস সজল চক্ষে বসুদেব-দেবকীর চরণ ধরে ক্ষমা চাইল। কংসকে সত্যই অনুতপ্ত দেখে বসুদেব-দেবকী ক্ষমা করলেন। তখন বসুদেব সহাস্য-বদনে বল্লেন,—আপনি যথার্থ কথাই বলেছেন, দেহে আমিত্ববুদ্ধি এবং 'আমি', 'তুমি' ভেদজ্ঞান দেহধারী জীবের অজ্ঞানতার ফল। এই অজ্ঞানতা বশেই তাদের শোক-মোহ, হর্ষ-বিষাদ, দ্বেষ-ক্ষোভ, লোভ, ভয় ইত্যাদি জাগে এবং গর্বান্ধ হয়ে পরস্পর পরস্পরকে হিংসা করে, আঘাত করে।

শোকহর্ষভয়োদ্বেষলোভমোহমদান্বিতাঃ।
মিথো ঘ্নন্তং ন পশ্যন্তি ভাবৈর্ভাবং পৃথকদৃশঃ॥

পবিত্রহৃদয় বসুদেব-দেবকী প্রসন্ন-বদনে এই কথা বল্লেন। কংস তখন তাঁদের অনুমতি নিয়ে নিজ গৃহে ফিরে গেল।

বসুদেব শুদ্ধজ্ঞান ও দেবকী শুদ্ধাভক্তির মূর্তি। শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তির মিলনে শ্রীভগবানের আবির্ভাব নিত্যকাল ঘটে। সকলের হৃদয়ে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধা-ভক্তির উদয়ে।

শ্রীভগবানের দুটি স্বরূপ—একটি কালস্বরূপ, অপরটি আনন্দঘন পুরুষোত্তম রূপ। তিনি সকলকে এই দুই স্বরূপের যে কোন একটিতে কৃপা করে থাকেন। যাঁরা তাঁর পরিকর, তাঁর ভক্ত, তাঁর প্রতি

সদাই উন্মুখ, তাঁদের নিকট যান পুরুষোত্তম স্বরূপে। আর যারা তাঁকে জানে না, মানে না, বিদ্বেষ করে, আঘাত করে, তাদের নিকট যান কালস্বরূপে, তাদের মৃত্যুকালে। শ্রীকৃষ্ণ জন্মালেন কংসের আলয়ে, চলে গেলেন ব্রজে যেখানে রয়েছেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয়জনেরা, যাঁরা তাঁকে ছাড়া অন্য কিছু জানেন না, তাঁকে ছাড়া অন্য কিছু চান না, তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসেন। বৃন্দাবন-লীলা সাঙ্গ করে পুনরায় আসবেন কংসের আলয়ে, তার কালস্বরূপে, সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে।

এখন গোকুলে শ্রীভগবানের বাৎসল্যময়ী জননীগণের সঙ্গে তাঁর বাৎসল্য-রসমধুর লীলানাট্য উন্মোচিত হবে, ক্রমে সখাগণের সঙ্গে সখ্যরসের এবং মধুর রসের পরিকর ব্রজাঙ্গনাগণের সঙ্গে প্রেম লীলা, যার শ্রবণে আমাদের সকল অমঙ্গল দূরে যাবে, নেমে আসবে জীবনে পরাশান্তি ও পরমানন্দ।

জয় গৌরহরি! জয় জগদ্বন্ধু হরি।

—∘—

মহানাম গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা	বন্ধুবার্ত্তা	উপনিষদ্ ভাবনা–দুই খণ্ডে
লীলাস্মরণিকা	বিশ্বধর্ম্ম	ব্রহ্মচর্য্য তত্ত্বজ্যোতিঃ
সংকীর্ত্তন-পদাবলী	গৌরসন্দর্ভ	গীতাধ্যান ১ম খণ্ড–৬ষ্ঠ খণ্ড
সংকীর্ত্তন-পদামৃত	প্রেম সম্পুট	ভাগবত–পাঁচ খণ্ডে
শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী	বন্ধু করুণাকণিকা	মহানামব্রতের ৫টী ভাষণ
১ম–১০ খণ্ড	পদ্য গীতা	বৈষ্ণব বেদান্ত (বাংলা)
উপনিষদ্ ও শ্রীকৃষ্ণ	শ্রীমূর্তি প্রকাশ	শ্রীকৃষ্ণের শেষ-উপদেশ
গৌরকথা–তিনখণ্ডে	গোপীমন্ত্র মাধুরী	ঈশ্বর নাই! ঈশ্বর আছেন!!
মহাপ্রভু জগদ্বন্ধু	আমেরিকার পথে	Lord Jagadbandhu
হরিপুরুষ শ্রীজগদ্বন্ধু	প্রেমের বাণী	মহানাব্রত ভাষণামৃত
পরশমণির পরশে	চণ্ডীচিন্তা	মানব ধর্ম (বাং ও হিন্দী)
অক্রূর সংবাদ	উদ্ধব-সন্দেশ	শিক্ষাপ্রসঙ্গে মহানামব্রতজী
উপমা মহানামব্রতস্য –দুই খণ্ডে	শিশুর বিকাশ	উদ্ধব সন্দেশ (হিন্দী)
	শ্রীশ্রীহরিকথা	প্রেম যোগ
ধবলমুখে ভারতীয় সন্ন্যাসী	গীতাধ্যান (সমগ্র)	Vaisnava Vedanta

প্রাপ্তিস্থান

মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫৯, মানিকতলা মেন রোড কলকাতা-৫৪। শ্রী শ্রী মহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর কলকাতা-৫৯। শ্রী জগদ্বন্ধু ধাম, ডাহাপাড়া, মুর্শিদাবাদ। শ্রী মহানাম মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া। মহানাম প্রচার গাড়ী, শিয়ালদহ ষ্টেশন। গৌরগোপাল মজুমদার প্রভুবন্ধুমন্দির শান্তশ্রী পল্লী, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৬৩, ফোন ঃ ৪৬৭ ২০৩১। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণি, কলকাতা-৬। সঞ্চয়ন, কুচবিহার। মহানাম অঙ্গন, আগরতলা ত্রিপুরা। সর্বোদয় বুক স্টল, হাওড়া ষ্টেশন। মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। শ্রী নির্মল চ্যাটার্জী, রামবাঁধ, বার্নপুর, বর্ধমান। শ্রী সুখেন্দু শেখর দত্ত, নেতাজী পল্লী। করিমগঞ্জ, আসাম। জয়গুরু পুস্তকালয়, ১২/১/বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ মুদ্রণ–ওয়েলনোন প্রিন্টার্স, কলকাতা-৯